কাল প্রবাহ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণিমা সিংহ
প্রথম সংস্করণ ১ এপ্রিল ১৯৫৮

প্রকাশক : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
সমতট প্রকাশনী
১৭২ রাসবিহারী এভেনিউ
ফ্ল্যাট ৩০২ কলকাতা ২৯

মুদ্রক : শ্রীগোপাল দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ কালিদাস সিংহী লেন কলকাতা
গ্রন্থনকারী : মুখার্জি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১২ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট কলকাতা ৫

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

Changing Times-এর বাংলা অনুবাদ হোক। সে চিন্তা প্রথম আসে ডঃ সুরজিৎ সিংহ ও অনুবাদক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর মাথায়। গ্রন্থকার জানতে পেরে বললেন, তা যদি কর, তাহলে কিছু পরিবর্তন—পরিবর্জন ও পরিবর্ধন—হোক। তাই হ'ল।

পাণ্ডুলিপি পড়ে যেটা আমার মনে লাগলো তা হ'ল লেখকের সহজ-সরল অকপট বলার ধরন; আরো মনে হ'ল, তৎকালীন সমাজের এই ভাঙ্গাগড়ার চিত্র ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে মূল্যবান বোধ হতে পারে। বাংলা সংস্করণের এটাই গোড়ার কথা।

সুধী পাঠকেরা সামান্য ক'টা ছাপার ভুল শুধরে নিলে সুখী হবো:

পৃঃ ১৪ লাইন ১৯—ছাপা আছে 'বড় কুম', হবে 'বড়কুম';
পৃঃ ৪৮ লাইন ৩১—আছে 'পৈতেতে', হবে 'পৈতের';
পৃঃ ৯৪ লাইন ১৪—আছে 'একটা জলের খাত শুকিয়ে গিয়ে তার', হবে 'শুকনো একটা জলের খাতের'।

(অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত)
প্রকাশক

লেখকের নিবেদন

'চেঞ্জিং টাইমস্' (Changing Times) নামে বইখানি ২৯শে জানুয়ারি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে 'এনথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশনের জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে শান্তি-নিকেতনের সর্বজনমান্য স্বর্গীয় ডঃ শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী ডি লিট মহাশয় হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থাতেও বার বার আমাকে এ-অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় ডঃ শ্রীধীরেন্দ্র দত্ত মহোদয়ও সে-অনুরোধের সমর্থনে আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠি এই পুস্তকে সংযোজিত হইল। আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় এবং অন্যান্য অসামর্থ্যের প্রতিবন্ধকতায় এই দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হই নাই। দৈবক্রমে আমার পরম স্নেহভাজন বহুগুণাধার শ্রীমান সোমেন্দ্রনাথ খাঁ ভাদুড়ী আগ্রহপরায়ণ হইয়া বইটি অনুবাদ করিতে চাহিলে আবশ্যকীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে আমার অনুমোদন লইয়া এই কাজে অগ্রসর হইতে বলি। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য চাপা পড়িয়া নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

নানা কারণে প্রকাশিত ইংরাজী সংস্করণে বহু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও দেশে এবং বিদেশের কিছু বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি বইটির উৎসাহব্যঞ্জক সমালোচনা করিয়াছেন।

এখানে শ্রীমান সোমেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শৈশব হইতেই তৎকালে দুরারোগ্য ব্যাধি 'পোলিও'তে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার চলাফেরার শক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। বর্তমানে নানাভাবে চেষ্টার ফলে যতটুকু শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলার ক্ষমতা নাই। তবু অদম্য মনোবলের অধিকারী হওয়ায় নানা বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ আগ্রহ, উৎসাহ আর সক্রিয় সাধনার ফলে তিনি কলিকাতার বহু মাননীয় মহাজনের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে এ-ধরনের গুণী ব্যক্তির ভাগ্যে পঞ্চাশ বছর বয়সেও কোন যোগ্য স্বীকৃতি জোটে নাই। সোমেন্দ্রনাথও কৈশোর বয়স পর্যন্ত সুসঙ্গের জলবায়ুর অমৃতাস্বাদনে পুষ্ট।

যাহাই হোক, কোনো ফলের আশা না রাখিয়াই নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও

তিনি অতি যত্নে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে Changing Times, বইটির অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

ইংরাজী সংস্করণের ত্রুটি আংশিক সংশোধনের জন্য যথাস্থানে "সুসঙ্গ পরগণার কিছু বিশিষ্ট পরিবার ও ব্যক্তি" উল্লেখে এক পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে। সেখানে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই অনেক যোগ্য নামের উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ বার্ধক্যজনিত নানা অক্ষমতা আর ভ্রান্তির তমসায় অনেক নাম আর মনে আসে নাই। আশাকরি যথাস্থানে আমার অক্ষমতার ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষিত হইবে। নূতন সংযোজিত পরিচ্ছেদের সহিত অনূদিত অংশের ভাষায় তারতম্য রহিয়াছে।

শ্রীমান ডঃ সুরজিৎ সিংহ এবং শ্রীমতী ডঃ পূর্ণিমা এই পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থা করায় এই কার্য্য সম্ভবপর হইল। তাঁহাদের সার্বিক কল্যাণ এই কারণে মহামায়ার চরণে প্রার্থনা করি।

শ্রীমান সোমনাথ প্রুফ প্রভৃতি আবশ্যক প্রতি কার্য্য পরম আগ্রহ ও নিষ্ঠার সংগে অকুণ্ঠ চিত্তে করিয়াছেন। তাঁর অবদানের গুরুত্ব কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করি।

*   *

কোন আদর্শের আত্মপ্রকাশ ঘটে নির্দিষ্ট এক রূপের মধ্যে। প্রায়ই প্রাণবন্ত আদর্শ-উদ্ভূত কোন সংস্কৃতি এক সবল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপন অভিব্যক্তি খুঁজে পায়। কোন সামাজিক সংস্থার সমৃদ্ধি-শক্তি প্রকাশ লাভ করে বহিরাগত সংস্কৃতির সম্ভাব্য উৎসর্গকে আত্মস্থ করে। কোন সমাজ-আদর্শবাদ যত মহৎ ও প্রেরণাদায়কই হোক না কেন উপযুক্ত প্রাণোচ্ছল সমাজ-প্রতিষ্ঠানের সহায়তা না পেলে তার অবিচল সাংস্কৃতিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়। আমি কিন্তু এসব যুক্তি উপস্থাপন করে সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য চাপা দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার অপরিহার্য করে তুলতে চাইছি না। যুগের দাবী অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে দু' রকম উপাদানকেই শক্তিবৃদ্ধির জন্যে পারস্পরিক বলিষ্ঠ সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে অঞ্চলের কথা বলব আগে তার পরিচয় ছিল সুসঙ্গ দেশ, পরে হয়েছিল মুলুক সুসঙ্গ; অবশেষে পরগণা সুসঙ্গ—যা আজ পূর্ব-পাকিস্তানে [বর্তমান পরিচয় 'বাংলা দেশ'] অবস্থিত। অরণ্য-অধ্যুষিত হিন্দু সভ্যতার এই সীমান্ত অঞ্চলে এক সামন্ত রাজ্যের মাধ্যমে কেমন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সেই আঙ্গিকের সাথেই প্রধানত আমরা সংশ্লিষ্ট থাকব। অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রাক্ পরিচয় ছাড়াও ১৯০০ সাল থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মনুষ্য-সম্পর্কিত অর্ধ শতাব্দীর আঞ্চলিক চিত্রালেখ্য দেওয়া হবে। সর্বক্ষেত্রে যেমন হয়, বর্তমানের কোন ছবি অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব; তাই এই কাহিনীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কিছু সংবাদও আমরা দেব।

মুখবন্ধ

অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে মহারাজা ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহের 'আত্মস্মৃতি' বইখানা আত্মজীবনী শ্রেণীভুক্ত করে প্রকাশ করা সম্ভব হওয়ায় আমি আনন্দিত। গুণীজনের কাছ থেকে পরিণামে এর সঙ্গত ও প্রাপ্য সমাদর না পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সার্ভেকে তিনি বই ছাপানোর অনুমতি দিয়েছিলেন।

অনুশীলনে পাণ্ডিত্য বা যন্ত্রবৎ বিষয়মুখী হবার চেষ্টা না করে গ্রন্থকার তাঁর চিন্তা আর অনিয়ন্ত্রিত অনুভূতির গতি সাবলীল রেখেছেন। শুধু দুটো ব্যাপারে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এদের মধ্যে একটার উদ্ভব তাঁর কৃষ্টি ও ঐতিহ্য থেকে; অপরটি এসেছে তাঁর সহজাত অনন্যসাধারণ শিল্পীমন থেকে।

সুতরাং, এই 'আত্মস্মৃতি'র মধ্যে পাঠক পাঠযোগ্য বৈশিষ্ট্যই যে শুধু পাবেন তাই নয়, ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা আধুনিক কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, আন্তরিক দরদ দিয়ে আঁকা তার একটা ছবিও পাবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরলোকগত অধ্যাপক ডঃ রবার্ট রেডফিল্ড মহোদয় শিকাগো থেকে ১৯৫৭ সালে ২রা অক্টোবর তারিখের পত্রে প্রস্তাব করেছিলেন যে, বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে সুসঙ্গে আমি যা দেখেছি তার স্মৃতিকথা যেন লিখি। এ কাজ শেষ করার জন্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বদান্যতায় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা তাঁর আনুকূল্যেই হয়েছিল। কোন শর্তই তিনি আরোপ করেননি এবং আমার সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেই এ-ধরনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে আমি লিখতে সম্মত হয়েছিলাম।

উদার চরিত্র অধ্যাপক মহাশয় রোগশয্যায় থেকেও শেষদিন পর্যন্ত আমার জন্যে যে সহমর্মিতা, অফুরন্ত উৎসাহ আর সক্রিয় আনুকূল্য দেখিয়েছেন সে-সম্বন্ধে আমি কোন অতিশয়োক্তি করছি না। আমার পরিসমাপ্ত রচনা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয়কে দেখাতে পারিনি এ দুঃখ আমার পক্ষে মর্মান্তিক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমার দায়িত্ব শেষ করার আগেই অধ্যাপক রেডফিল্ড মহোদয় ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেছেন।

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে কর্তব্যহানি হবে ; কারণ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ লেখার সময় তিনি বিভিন্ন গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করে তাঁর বহুমুখী মনীষার মাধ্যমে পথনির্দেশে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আত্মজীবন সংক্রান্ত অংশ সম্পাদন করার সময় আমার পুত্র সুরজিৎ নানা ভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে। তার সাহায্যের স্বীকৃতি জানিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

পূর্বাভাস

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভ্যস্ত জীবনধারা এতোই বদলে যাচ্ছে যে, মনুষ্য সমাজের সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত সম্পর্কের বিষয়ে আবার ভেবে দেখা যেতে পারে। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দুটো ছবির রূপরেখা স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। দ্রুত পরিবর্তনশীল নূতন পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় রাখতে গিয়ে স্বভাবতই সেই সময়ের স্বভাবজাত প্রীতি-বন্ধনের স্মৃতি মনকে আকর্ষণ করে। অতীতকে কোনক্রমেই বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়া যায় না। মানুষের গভীর প্রীতি ও অনুরাগের প্রাচীন স্মৃতি আমার মতো অবস্থার যে কোন লোককে আজ স্বাভাবিক কারণেই হতাশাগ্রস্ত করতে পারে। কিন্তু এই চরম দুঃখবোধ থেকে মহামায়া আমাকে রক্ষা করেছেন; আমি তার কিছু আভাস দিচ্ছি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে ১৯৫৬ সালে আমি শেষবারের মতো আমার পিতৃপুরুষদের তেরশ শতকের প্রাচীন বাসভূমি সুসঙ্গে যাই। কারণ তীর্থতুল্য পূর্বপুরুষের ভিটেতে প্রণাম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা সব মানুষের মতো আমারও আছে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বিপর্যস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা আমার জীবনকালের মধ্যে সুগম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মনে হয়েছে চারপাশের পরিবেশ যেন ঘন-ঘটায় ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে-বার দুটো ঘটনার অভিজ্ঞতায় যেন আলোর রূপালী রেখার আভাস আবার দেখেছি।

সুসঙ্গের মহারাজার সেই চিরপরিচিত প্রাসাদ রঙ্গমহল। একদিন প্রাসাদের বারান্দায় বসে আছি। বিগতকালের সাক্ষী এবং বিপদের অবলম্বন হিসাবে জীর্ণশীর্ণ এক দেহরক্ষী সেখানে অপেক্ষমান। এমন সময় একজন লোককে নজরে পড়লো। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে চাদর মুড়ি দিয়ে সে অনেকক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রক্ষীকে তাকে নিয়ে আসতে বললাম। সে মাঝ-বয়েসী এক মুসলমান—এসেছে সুসঙ্গ থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে পূবের এক গাঁ থেকে। সেই চড়া রোদে প্রায় দেড় ঘণ্টার উপর এভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কারণ তাকে জিজ্ঞেস করলাম। মনে হল সে যেন কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছে; কারণ, সময়টা তখন এতোই অস্বাভাবিক যে, সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে কোনওক্রমে শান্তিতে

বেঁচে থাকাটাই এক সমস্যা ! তাকে অভয় দিয়ে বললাম যে, সরকার বা সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছু না হলে সে খোলামনে তার কথা বলতে পারে। ভরসা পেয়ে সে চাদরের ঢাকনা খুলে এক মাসের এক শিশুকে দেখালো। তখন তার খুব জ্বর ! ব্যাপার দেখে আমি তো একেবারে থ। তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই কাঠফাটা রোদে এই শিশুটাকে নিয়ে কেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে? সে বলল, ছেলেটা পাঁচদিন হল খুব জ্বরে ভুগছে ; সারছে না। এক ফকির আমাকে বলেছেন যে, "একে গদিধর মহারাজার সিংহাসন ছুঁইয়ে আনলে ভাল হয়ে যাবে ; নয়তো একে আর কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।" তার গ্রাম্যজীবন-সুলভ অন্ধ-বিশ্বাস মনে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলেও আমাকে যেন বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করালো। যাই হোক তার ভাবে বোঝা গেল যে, প্রকৃত মহারাজাকে সে কখনও দেখেনি। তাই মহারাজার ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রেখে তাকে বললাম, মহারাজার এখন কোন সিংহাসন আর নেই। তবে উৎসবে অনুষ্ঠানে তিনি মাঝে মাঝে একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসেন। যদি এখনই একে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, তবে সে চেয়ারে তাকে বসাতে পার। সে তাতেই রাজী হল এবং তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় খুবই খুশি হল। সে চলে যাবার আগে তাকে বললাম, 'খবরটা মহারাজাকে দিতে হবে। ছেলেটা কেমন থাকে আমাকে জানিও।' সেই শিশু বাড়ি যেতে যে পথেই মরে যাবে আমার এ-আশঙ্কাই ছিল। কিন্তু দুদিন বাদেই সেই কৃতজ্ঞ লোকটি এসে জানাল যে, ডাক্তার দেখানোর আগেই রঙ্গমহল ছেড়ে পাঁচ ছ শ গজ যেতে না যেতেই রোগীর জ্বর সেরে গিয়েছিল ; তারপর থেকে সে ভালই আছে। ছেলেটা কেন এবং কেমন করেই বা সুস্থ হয়ে গেল সে-ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন গুরুত্ব দিতে চাই না। কিন্তু ভেবে অবাক হই যে, একজন মুসলমান ফকির মুসলমান গ্রামবাসীকে তাঁদের পূর্বতন মহারাজা এক হিন্দু জমিদারের কাছে সে-পরিস্থিতিতেও কেন আসতে বল্লেন ; বিশেষত মহারাজার শেষ ভূসম্পত্তিটুকুও তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিকারে চলে গিয়েছে। রাজপরিবারের পদবীপ্রাপ্ত প্রধানের প্রতি সুসঙ্গের সরল গ্রামবাসীর এই মমত্ববোধ নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। সে কথা মনে হলে আমি আজও অভিভূত হয়ে যাই।

আর একদিনের ঘটনা। আমি সেদিনও রঙ্গমহলের বারান্দায় বসে আছি। একবার বাইরে তাকাতেই বয়স্কা এক গ্রাম্য মুসলমান মহিলা আর কিশোর বয়সের এক ছেলেকে দেখতে পেলাম। মনে হল তারা অনেকক্ষণ রঙ্গমহলের চত্বরে অপেক্ষা করছে। গ্রামের মানুষ বাজারে যেতে আসতে প্রায়ই রঙ্গমহল দেখে যায়। তখন তারা তাদের মালপত্র সাধারণত দলের কোন লোকের কাছে রেখে ঘুরে ফিরে রঙ্গমহল দেখে। কিন্তু সেই মহিলা আর ছেলেটি এতক্ষণ ধরে কেন বসে আছে? রক্ষীকে খোঁজ নিতে বললাম। রক্ষী এগিয়ে গেলে বৃদ্ধা মহিলা তাদের সঙ্গে আনা একটা বাঁশের ঝুড়িতে কিছু জিনিস আর একটা ছাগ শিশুর

দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তারা আমার কাছে এলে আমি তাদের আসার কারণ জানতে চাইলাম। বৃদ্ধা বলল, "হুজুর! আমাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে ছেলের জন্ম হলে সুসঙ্গের গদিধর মহারাজাকে একটা ছাগশিশু, গাওয়া ঘি আর আতপ চাল নজর দিই। গত তিন পুরুষ আমাদের সংসারে শুধু একজন করে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। তাই বংশের ধারা বজায় আছে। আমরা বহুদূরে হৈবতনগরের দেওয়ান সাহেবের জমিদারীতে বাস করি। সুসংগ রাজবাড়িতে আসতে আমাদের দুদিন লেগেছে। দু'বছর আগে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। তিনি নিজেই নজর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'মহারাজা' তখন এখানে ছিলেন না। তাই তিনি তাঁর মানত পূরণ করতে পারেননি। কিন্তু মরবার আগে আমাদের একমাত্র ছেলের মংগলের জন্যে তিনি আমাকে বারবার এই মানতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমি ছেলেকেও সংগে এনেছি। শুনেছি মহারাজা কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছেন। তাই আর দেরি না করে তাঁর চরণে এই মানত দিতে চলে এসেছি।" তার কথায় আমি এতই বিচলিত হলাম যে, মহারাজার পরিচয় আর গোপন রাখতে পারলাম না। তাতে বৃদ্ধার সেই মর্মস্পর্শী প্রতিক্রিয়া ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর সংগে বয়ে আনা জিনিসের ঝুড়িটা মহারাজার পায়ের কাছে রেখে ছেলেকেও তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে বলল। আমি মহামায়ার কাছে মা আর ছেলের মংগল প্রার্থনা করে তাঁর চরণে নিবেদনের জন্যে তাদের সেই নজর পুরোহিতের হাতে তুলে দিলাম। যাবার আগে বৃদ্ধা বলে গেল, "এই আশা নিয়েই এতকাল বেঁচে আছি। এবার আমি শান্তিতে কবরে যেতে পারব। হুজুর, ছেলেকে আশীর্বাদ করুন, আমার স্বামীর আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাবে।"

সুসঙ্গে আমার যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আর নেই। তবু পূর্বস্মৃতি মাঝে মাঝে মনকে যখন ভারাক্রান্ত করে, তখন আমার শেষবার সুসঙ্গ যাত্রায় দেখা এই দুটো চরিত্র মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। আমার পূর্বপুরুষগণ যাঁদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের অন্তরে তাঁরা প্রীতি-মধুর এক অবিনশ্বর ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতির কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে সুসঙ্গ জীবনের স্মৃতিকথা লেখার জন্যে আমার ছেলে সুরজিৎ বার বার আমাকে স্মরণ করিয়েছে। তখন সে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কিন্তু লেখক হিসাবে আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত মনেই লিখেছি। কারণ অতীত সুসঙ্গ-স্মৃতি আমার ছেলেদের কাছে প্রায় উপকথা হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পূর্বোক্ত চরিত্র দুটোও স্মৃতিচারণে প্রেরণা দিয়েছে। উপরন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রবার্ট রেডফিল্ড মহোদয়ের প্রেরণা, প্রতিশ্রুতি ও চেষ্টায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতা এই স্মৃতিলিপির রূপায়ণে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই অধ্যাপক রেডফিল্ড মহাশয়ের কাছে

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। পরবর্তী অতীত ইতিকথা এক হিসাবে অনুরাগী সুসঙ্গবাসীদের প্রতি আমার অকিঞ্চিৎকর সকৃতজ্ঞ উপহার। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী সুদীর্ঘকাল তাঁরাই নানাভাবে আমাদের পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম।

গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা অনুসারে সমকালীন সুসঙ্গবাসীর আলেখ্য এবং ঘটনা বিন্যাস করা হয়েছে। সুসঙ্গের সাংস্কৃতিক তথ্যও সংযোজিত হয়েছে।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ

রঙ্গমহল

'পরতালা' প্রথায় হাতি ধরা

The Statesman | **100 YEARS AGO**
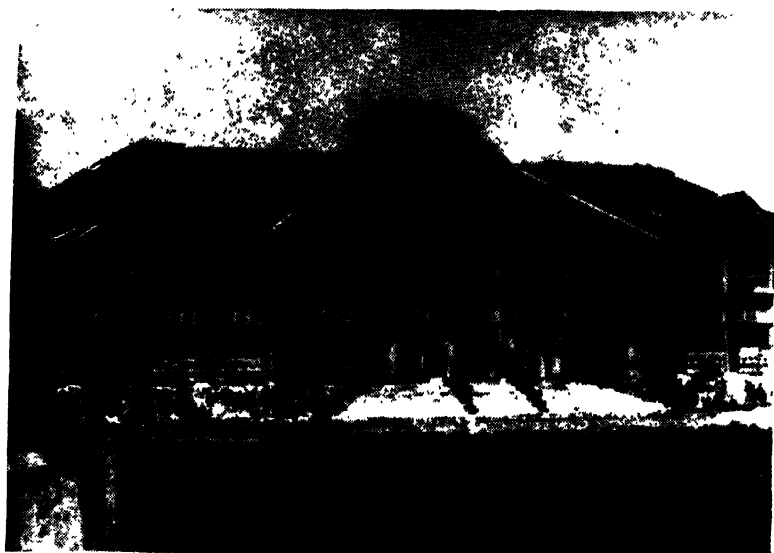
November 22, 1887.

(News Item)

CALCUTTA.

THE NATIONAL CONGRESS— At a meeting of the Bengal National League, Calcutta Branch, held on Sunday last, at the residence of the late Maharaja Komul Krishna Bahadoor, under the presidency of Maharaja Raj Krishna Sing Bahadoor of Susang, the following gentlemen were elected delegates to the forthcoming National Congress at Madras:—Mr. W. C. Boonerjee, barrister at-law, Maharaja Raj Sing, Bahadoor of Susang, Maharaja Komul Krishna Sing, Bahadoor of Susang, Kumar Neel Krishna, Kumar Benoya Krishna, Baboos Jotendra Nath Tagore, N. N. Ghose, Kali Churn Banerjee, M.A., B.L., Dr Sumboo Chandra Mookherjee, Baboos Joy Govinda Shome, M.A., B.L., Gopal Chandra Mookerjee, Motee Lal Ghose, J. Ghosal, Ram Chand Settiah, Sita Nath Roy, B.L., Satyadhan Banerjee, Vidyaratna, M.A., Bhupendra Nath Bose, M.A., B.L. Brajendra Nath Banerjee, Kanailal Khan, Josodananda Pramanick, M.A., B.L., Atul Behari Dutt, Rajendra Nath Mookerjee, Poolin Behari Sirkar, Secretary, India Club, and Ramlal Banerjee.

গারোদের বাড়ি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

ভৌগোলিক পরিচিতি

এককালে 'সুসঙ্গ দেশ', পরবর্তী যুগে 'মুলুক সুসঙ্গ' এবং অবশেষে 'সুসঙ্গ পরগণা' নামে যার প্রসিদ্ধি ছিল, তার প্রশাসনিক কেন্দ্রই হচ্ছে সুসঙ্গ। অধুনা সুসঙ্গ বাংলা দেশের (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) মৈমনসিংহ জেলায় নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত এবং মৈমনসিংহ শহর থেকে ঠিক ছত্রিশ মাইল উত্তরে ভারতের আসাম রাজ্যের গারো-পাহাড়ের (অধুনা মেঘালয়) পাদদেশ থেকে প্রায় ছ' মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সুসঙ্গ গ্রাম অথবা ছোটখাটো এই শহর ইংরেজ আমলে মৈমনসিংহ জেলার (গভর্নর বাহাদুরের) আংশিক শাসনাধীন অঞ্চল হিসেবে গণ্য ছিল। গারো পাহাড় থেকে সোমেশ্বরী নদী প্রবল বেগে বেরিয়ে এসেছে। সুদর্শন স্বচ্ছ তোয়া প্রবহমান এই নদীর দুধারেই সোনালী বালুবেলা বিছানো রয়েছে। এর পূর্ব তটভূমিতে সুসঙ্গ দুর্গাপুর। অনেক সর্পিল পথ অতিক্রম করে কংসনদ ছুঁয়ে সোমেশ্বরী শেষে এসে মিশেছে মেঘনা নদীতে। এককালে এর শাখাপ্রশাখাগুলো এর প্রবাহকে নিয়ে গিয়েছিল ব্রহ্মপুত্রে; আজ সেগুলো মজে গিয়েছে। বিরিসিরি থেকে যে কাঁচা সড়কটা কংসনদের অপর পারে জারিয়া ঝাঞ্জাইল রেল স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছে, সেটাই সুসঙ্গের নিকটতম রেল স্টেশন এবং মৈমনসিংহ শহরের সঙ্গে যোগসূত্র ঘটিয়েছে। অপর পারে জারিয়া ঝাঞ্জাইল যেতে হলে খেয়া নৌকোয় কংসনদ পাড়ি দিতে হয়। বর্ষায় প্রবল বন্যা ছাড়া, অন্য সময় এই নদীপথে সুসঙ্গ থেকে জারিয়া যেতে এবং আসতে প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা সময় লাগে।

বর্তমান সুসঙ্গ পরগণার উত্তর সীমায় গারো পাহাড়, পূর্বে শ্রীহট্ট জেলা আর পশ্চিম সীমান্ত বেষ্টন করে আছে সেরপুর পরগণা। দক্ষিণে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই। উত্তর সীমান্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছোট টিলাগুলো।

এখানকার আবহাওয়া একেবারে গ্রীষ্মমণ্ডলের মতো। বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০০ ইঞ্চির বেশী। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি যেখানে হয়, সেই চেরাপুঞ্জী সুসঙ্গ থেকে মাত্র সত্তর মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে

বায়ুমণ্ডল আর্দ্র। বেশ গরম কয়েকটা দিন বাদ দিলে মনোরম মৃদুমন্দ বাতাসের জন্যে গ্রীষ্মের প্রখরতা সাধারণত অসহ্য হয় না। শীতকালটাও মানানসই মতো ঠাণ্ডা; যদিও মাঝে মাঝে তার তীব্রতা অস্বস্তিকর মনে হয়। ১৯০৫ সালে একদিন রাত্রে তাপমাত্রা এতো নীচে নেমে গিয়েছিল যে, একটা হাতির বাচ্চা ঠাণ্ডায় জমে মারা পড়েছিল।

সারা পরগণা জুড়ে অসংখ্য যে সব নদী-উপনদী ছড়িয়ে আছে গারো পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সেগুলো ছাপিয়ে যায়। সাধারণত গ্রামবাসীরা সেসব বন্যাকে স্বাগত জানিয়ে থাকে; কারণ বন্যাবাহিত পলিমাটি জমি উর্বর করে। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতিও হয়। স্মরণীয় কালের মধ্যে অস্বাভাবিক প্লাবনের ফলে স্থানীয় ভূমিপ্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার প্রভাব গ্রামবাসীদের উপরেও পড়েছে।

গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এক সময় একান্তভাবে সুসঙ্গের অঙ্গ ছিল. তাই সেই অঞ্চলের সামান্য বিবরণ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গারো পাহাড় পার্বত্য আসামের [বর্তমানে মেঘালয়] অংগ। গারো পাহাড়ের কতগুলো প্রাকৃতিক চুণাপাথরের গুহা স্থানীয় এবং বিদেশী দর্শকদের কাছে বিস্ময়কর দৃশ্য হিসাবে গণ্য হয়ে আছে। বনবিভাগের মিঃ রাউড্রি সাহেব একবার বলেছিলেন যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক গুহাগুলোর মধ্যে 'শিজুর', 'তপাখাল' গুহা সম্ভবত দীর্ঘতম। পার্বত্য আসামে যে কোন স্থানের সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাতগুলোর সংগে এখানকার জলপ্রপাতগুলোর তুলনা করা চলে। অসংখ্য নদী, শাখানদী আর জলপ্রপাত এই পার্বত্য দেশের বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু গাছ বহু প্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয়ে আসছে। এই পাহাড়ে সেসব গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'অগুরু' আর 'চামল' বা বন কাঁঠাল গাছ। 'কোঁদা' নৌকো তৈরির কাজে প্রায়ই চামল কাঠ ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম শালগাছগুলোর জন্যে গারো পাহাড়ের 'রঙরেঙ' রিজার্ভ বিখ্যাত ছিল। ভারতের ভূতপূর্ব ইংরেজ সরকার এই বনাঞ্চলটি 'অরণ্যের মনুমেন্ট' হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বাঁশ, বেত, ফার্ন ও অর্কিড—আসামের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সব শ্রেণীর গাছপালার প্রাচুর্য এখানে দেখা যায়। গারোরা 'জুম' বা স্থান-পরিবর্তন-করা-চাষ করে; তাই ভালো জাতের গাছ সাধারণত জন্মাতে পারে না। অবশ্য সরকারের অরণ্য-সংরক্ষণ নীতি ও আইন জুম-চাষ প্রথার অনিষ্টকর দিকটা কিছু পরিমাণে রোধ করতে পেরেছিল।

পাহাড়গুলো মোটের উপর খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। এখানে কয়লা ও চুণাপাথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুসংগের রাজারা য়ুরোপীয়দের আসার অনেক আগেই অবহিত ছিলেন।

বন্য প্রাণীর মধ্যে এককালে গণ্ডার সহজেই দেখা যেত। সম্ভবত আজ তারা লুপ্ত। হাতি, মোষ, গবয়, কয়েক শ্রেণীর হরিণ, সেরাও বা বুনো ছাগল, বাঘ, গুলদার বাঘ, তিন রকম ভালুক, ক্ষুদে বরাহ এবং নানা জাতের বন্যপ্রাণী যা

আসামের অরণ্যে পাওয়া যায়, সে-সবই এখানেও বহু সংখ্যায় দেখা যায়। দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর মধ্যে 'ব্রাউন' ও 'ক্লাউডেড লেপার্ড', কালো প্যান্থার, মালয়ের ভালুক, কালো উল্লুক, বাদামী রঙের বড় বাঁদর আর গারোরা যাকে 'পশুল' বলে সেই অতিকায় গোসাপ (রক্ ক্রোকোডাইল ?) উল্লেখযোগ্য। তারা বলে, এগুলো পাথরের গর্তে বাস করে, আর ছাগল, এমন কি বাছুরও মেরে ফেলতে পারে।

নানা জাতের অসংখ্য পাখির সমারোহ এখানে দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছু পাখি বারো মাসই এ অঞ্চলে বাস করে, আবার কিছু পাখি আছে যারা যাযাবর। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিন রকম ধনেশ, হরিয়াল, কবুতর, পাহাড়ী ময়না, ভৃঙ্গরাজ, উল্লা ময়ূর, দুর্গা পাখি আর লট্‌কন। বৈচি জাতীয় ফল আর পতঙ্গভোজী বিচিত্র রঙের সুরেলা কত রকমের পাখি যে আছে!

পাহাড়ী নদী-উপনদীগুলো নানা জাতের 'মিষ্টি জলের মাছের' আস্তানা এই অঞ্চলের সবচেয়ে নামকরা মাছ হচ্ছে 'মহাশোল'। শিজুর-এর পরেই সোমেশ্বরীর উজান বরাবর গভীর ডোবা আর নদীর ঘূর্ণীজলে এদের বড় বড় দল দেখা যায়।

পাহাড় থেকে নেমে এসে নদী আর ছোট ছোট উপনদীগুলো সুসঙ্গের সমতলভূমিকে যেন জালের মতো বিছিয়ে রেখেছে। এ ছাড়াও সারা পরগণায় আছে অসংখ্য হ্রদ। এখানে সেগুলো 'বিল' আর 'হাওড়' নামে পরিচিত আসলে হাওড় হচ্ছে প্রকাণ্ড দীঘি। এগুলোর মধ্যে কতক বিল আর হাওড়ের কিছু কিছু অংশ আবার পলিমাটি পড়ে ভরাট হয়ে বনভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই সব বনে বিশেষ করে শীতকালে নানারকম পশুপাখি আশ্রয় নিতে আসে। এই জমিগুলো বন্যার জলসীমা ছাড়িয়ে ক্রমে উঁচু হতে আরম্ভ করলে প্রথমে আদিবাসীরা সেখানে জুম চাষ করতে থাকে, পরে ঠিক সেভাবেই সমতলবাসী প্রগতিশীল চাষীরা ক্রমে সেখানে নিজেদের বাসভূমি গড়ে তোলে।

চারপাশের মানুষ প্রথম দিকে এই বিলগুলো থেকেই মাছ, কচ্ছপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মিটিয়ে নিত। অনুমান করা হয় যে, জেলে বা দাস সম্প্রদায়ের লোকরাই ছিল স্থায়ী আদি সমতলবাসী। পরবর্তীকালে বৃত্তিগত দক্ষতা এবং প্রয়োজনে তারা কৈবর্ত, ঝালো, মালো ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরে এসেছে। মুসলমানরা এসেছিল প্রায় ষোড়শ শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে; তাদের কিছু আগে ও পরে নানা শ্রেণীর অন্তে-উপজাতি এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ক্রমে বিভিন্ন সময়ে এসেছে। গারোদের মধ্যে উন্নত চাষীরা বিভিন্ন সময়ে পাহাড় ছেড়ে সুবিধে মতো সমতলভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে।

মৈমনসিংহ জেলার এক ইংরেজ বিচারক ১৮৬০ সালে সুসঙ্গ সমতটের বনাঞ্চল সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন সে কথা 'কাল প্রবাহে' কোন স্থানে বলা হয়েছে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহের কিছু গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ করে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে প্রকাশ করেছিলেন। এ অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প আর বন্যার ন্যায় ভয়াবহ যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় সে-বৃত্তান্ত এই বই থেকে আমরা জানতে পারি।

যেমন আসামে তেমনি সুসঙ্গেও স্থাপত্যশিল্পের কোন স্থায়ী নিদর্শন না থাকার কারণ তার প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর পরিবেশ। উপরন্তু এই অঞ্চলের বড় বেশী আর্দ্র জলবায়ু মানুষের স্নায়ুতে যেন একরকম তন্দ্রার আবেশ জাগায়। মানুষ এখানে সহজেই অলস হয়ে পড়ে। যার যা আছে সে তাতেই সন্তুষ্ট; তাই এখানে কাজে উদ্দীপনার অভাব সহজেই চোখে পড়ে।

পরগণায় ইঁটের দালান-বাড়ি যা ছিল ১৮৯৭ সালের সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে কয়টা টিকে আছে সেগুলোও অক্ষত নেই। এ ছাড়াও কয়েকটা তো একেবারে মাটির তলায় সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে দু'দশক পর্যন্ত ঘরবাড়ি তৈরির কাজে স্থানীয় কাঠ, বাঁশ, বেত এবং চাল ছাইবার জন্য 'ছন্' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বনজ উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাই গৃহস্থেরা ছনের বদলে টিনের ব্যবহার শুরু করেন।

সুসঙ্গের হাট-বাজারগুলো 'গঞ্জ' হিসাবে খ্যাত ছিল। সেখানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাল, সরষে, কয়েক রকম ডাল. ছোট আঁশের তুলো, পাট, উনিয়া (বুনো পাট), শন্, শুকনো মাছ, প্রায় সব শ্রেণীর জলজ টাটকা সামগ্রী, কাঠ, বেত, বাঁশ, বসুন, লঙ্কা, কাঠ আলু, রাঙ্গা আলু, তরমুজ, আনারস, কাঁঠাল এবং গোসাপ, পাইথন ইত্যাদি বন্য পশুপাখি, গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী এবং মোষের দুধের তৈরি জিনিস পাওয়া যেত। তাছাড়া বাজারে শুয়োর. হাঁস, মুরগী আর ডিমও কেনা-বেচা হতো। সুসঙ্গের বাজারে গরুর দুধ কিন্তু কখনও আসতো না। সময় বিশেষে হাতির দাঁত, শিঙ এবং বন্য জন্তুর চামড়াও পাওয়া যেত। এখন পাটের চাষ ব্যাপকভাবে হচ্ছে কিন্তু এ-অঞ্চলে পাটের চলন হয়েছে অনেক পরে। শন্ কিন্তু বহুকালের পরিচিত।

সমতটের বনজঙ্গল হাজার হাজার গবাদি পশুর চারণ ভূমিরূপে ব্যবহার হয়েছে। বড় বড় বিলের কাছে উঁচু জায়গায়, ছোট স্রোতস্বিনীর ধারে পশুপালকেরা তাদের বাথান করত। সে-বাথানের স্ত্রী মোষগুলোর সাথে বুনো পুরুষ মোষ অবাধে মেলামেশা করত। ফলে সুসঙ্গের 'কাঁচর' নামে প্রকাণ্ড বর্ণ সংকর মোষগুলোর খুব নামডাক হয়েছিল। ভূতপূর্ব ইংরেজ ভাইসরয়ের কৃষি সংক্রান্ত রাজকীয় বিবরণে এর উল্লেখ আছে। সুসঙ্গ রাজাদের পোষা স্ত্রী হাতিগুলোও বন্য পুরুষ হাতির সঙ্গে মেলামেশা করত। তাতে তারা বাচ্চা দিয়ে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করত। সারা পরগণাতেই অনেক পোষা হাতি দেখা যেত। রাজারা 'খেদা' করাতেন; কারণ, তাঁদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল খেদা এবং সেকালে মুঘল দরবারে সৈন্য বিভাগ থেকেও হাতি কেনা হতো।

পরগণাবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সব হিন্দুই এখানে দেখা যেত। মুসলমানরা এসেছে পরবর্তী কালে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বাসিন্দাদের বলা হতো 'সাবেকী' আর নবাগতদের বলত 'নগ্দি'। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জেলা থেকে কিছু অসৎ লোকও নবাগতদের দলে মিশে এসেছিল। পুরাতন অপরাধীদের একটা অংশও এদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ অঞ্চলের পুরাতন হিন্দুদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের কিছু উচ্চ বর্ণের হিন্দুও ছিল। পরগণায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার সঙ্গেই যে তারা এখানে এসেছিল এটা অনুমান সাপেক্ষ। তারা কিন্তু তাদের সামাজিক রীতিনীতির কোন পরিবর্তন করেনি। বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে তারা যুক্ত প্রদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেছিল। রাজ্যের সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য যথাযোগ্য পদে বিহারী ও যুক্তপ্রদেশের লোকও নিযুক্ত হতো। বিহারী 'নুনিয়া' সম্প্রদায়ের লোক খুব নীচু শ্রেণীর হিন্দু হিসাবে গণ্য ছিল। তাদের কিছু লোক বহুকাল পূর্বেই সুসঙ্গবাসী হয়েছিল। তারা রাস্তা, পুকুর, কুয়ো ইত্যাদি তৈরি এবং মাটি কাটার কাজ করত। সবচেয়ে পরে এসেছেন শ্বেতাঙ্গ জাতির মানুষ। তাঁরা কিন্তু পরগণাবাসী হতে আসতেন না। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু ধর্মযাজকও ছিলেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে আগে কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। কিছু কারিগর স্থানীয় উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে সুনাম অর্জন করেছিল। দক্ষ সূত্রধর, কর্মকার, কুমোর এবং স্বর্ণকার ছিল। এমন কি নৌকো তৈরি ও হাতির দাঁতের শিল্পকর্মেও লোক পাওয়া যেত। আদিবাসীদের মধ্যে তাঁত ও বেত-বাঁশের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করার জন্যে বিশেষ ধরনের কুটির শিল্প ছিল। সমতটের মানুষের কাছে গারোদের তৈরি কোঁদা নৌকোর বিশেষ চাহিদা ছিল। প্রয়োজনে গারোরা যে, মাটির পাত্র হাতে তৈরি করে নিত, অন্যত্র বলেছি।

সুসঙ্গ পরগণার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের কথা পৃথক ভাবে কিছু বলব। এই পরিচ্ছেদ শেষ করবার আগে মিঃ ফ্রঙ্ক বি. সিম্সনের 'লেটার্স অন স্পোর্টস ইন ইস্টার্ন বেঙ্গল' নামে ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত এক বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"মৈমনসিংহ স্টেশনের প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তরে, সুসঙ্গ পাহাড়ের পাদদেশে নাজিরপুর বিল নামে এক মৌজা আছে। এই জেলায় যত শিকারের জায়গা আছে, আমার মনে হয়, শিকারের ঋতুতে ঠিক প্রথম বর্ষা শুরু হওয়ার আগে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো শিকারের স্থান। জুন থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ জায়গাটা বড় বেশি সেঁৎসেতে হয়ে থাকে। ঘন সবুজ ঘাসে জায়গাটা ছেয়ে থাকে এবং শিকারের পক্ষে বনও অত্যন্ত গভীর মনে হয়। জেলার সব জমিদার বছরের প্রায় ছমাস তাঁদের হাতিগুলো এখানে ছেড়ে দেন। তারা দিনরাত সেই ভেজা 'চিঁচড়' ঘাস খেতে থাকে। এক একটা হাতি কয়েক সপ্তাহ এই বিলে থাকলেই মোটা আর গোলগাল হয়ে যায়। মাহুতদের কাছে এই জায়গাটার কথা

অনেক শুনেছি : তাই অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে যে জায়গাটা একটু পরীক্ষা করে দেখি।

জায়গাটার ভেতরে যাওয়া কিন্তু বেশ কঠিন·· প্রত্যেক নালার কাদায় আমি বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছি। সব জাতের হরিণও প্রচুর আছে। শুনেছি বুনো গোলাপের ঝোপ জঙ্গলে ভালুকও দেখা যায়। পশ্চিম দিকে মোষের একটা দলে ন'টা স্ত্রী ও একটা সুগঠন পুরুষ মোষ ছিল। তখন ঘাসের বন বেশ ভালো করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবু দু ফুটের মতো উঁচু ঘাস প্রচুর ছিল। কতগুলো বড় বড় ডোবায় জল কাদা থেকে খুঁটে খাওয়া পাখির দল আর গাছের ঘন বন ছিল। সেগুলো অধিকাংশই কাঁটা গাছ ; তাই সেখানে 'হাঁকাও' করে শিকার করা বেশ কঠিন। বিলটার অবস্থিতি পাহাড়তলীতে এবং বন জঙ্গলে ঢাকা। কোন জন্তু প্রাণ বাঁচাতে সেখানে আত্মগোপন করলে তাকে অনুসরণ করে কোন সুফল হবে না।

···হঠাৎ···একটা হরিণ লাফিয়ে উঠল। তাকে দেখে তার শিঙের প্রাধান্যটাই বেশী নজরে পড়ে। এমন শিঙেল হরিণ আমি কখনও দেখিনি।···১৮৭২ সালে সেটা লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। ···বাঘ, গণ্ডার, মোষ, সম্বর, বারো শিঙার মতো প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসাবে সুসঙ্গ পাহাড়তলী অঞ্চল যেন আরো অনেক দিন টিকে থাকে।"

প্রকৃত পক্ষে বহু দুষ্প্রাপ্য শিকারের পাখি সমতটের বিল ও অরণ্যে এসে আশ্রয় নিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বড় কুম (ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন), লামদানী উল্লামযুর, কৃষ্ণ তিতির, কয়ার, নাক্টা হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি।

শীতের মরসুমে যখন বিলগুলোতে পদ্ম ও অন্যান্য জলজ ফুল ফুটতে শুরু করে তখন নানা রকমের হাজার হাজার পাখি এবং বুনো হাঁসের সমাবেশে এ জায়গাগুলো সত্যিই নিসর্গ লোকের নন্দন কাননে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

ঐতিহাসিক পরিচিতি

'সুসঙ্গ' নামের তাৎপর্য খুঁজে দেখতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় সাত শতাব্দী আগে। এর কারণ সম্বন্ধে কিছু বলছি। বাংলা বা সংস্কৃতে 'সু' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৎ' এবং 'সঙ্গ' মানে 'সংসর্গ'। তাই 'সুসঙ্গ' বলতে বোঝা যায় 'সৎ সংসর্গ'। প্রসিদ্ধি আছে যে, তখনকার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কান্যকুব্জ থেকে একজন ব্রাহ্মণ যুবক কিছু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুদূর পবিত্র কামাক্ষ্যা পীঠের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা শুরু করেছিলেন। কনৌজ বা কান্যকুব্জ বর্তমান উত্তর প্রদেশের গঙ্গাতীরে আর কামাক্ষ্যা হচ্ছে আসামের ব্রহ্মপুত্র তীরে। দুটি স্থানই ভারতবর্ষে। দুয়ের মধ্যে ব্যবধান হবে হাজার মাইলেরও বেশী। তীর্থযাত্রিগণ সেকালে নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে সেই পথ অতিক্রম করতেন। ডঃ নাথ 'দি কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব আসাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ৬৪২ অব্দেও

কনৌজ ও কামরূপের মধ্যে দূত বিনিময়ের সৌজন্য বজায় ছিল। দুদিক থেকেই পথ অতিক্রম করতে প্রায় তিন মাস সময় লাগত। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্ন্যাসীরা পদব্রজে নানা তীর্থ পরিক্রমা করেন। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা সেযুগেও দল বেঁধে সাধুসঙ্গ আশ্রয় করতেন। মৈমনসিংহ সীমান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশে 'বাঘমারা' সোমেশ্বরীর তীরে এক উল্লেখযোগ্য স্থান। সেখান থেকে কামাক্ষ্যা তীর্থ পর্যন্ত একটা 'পাকদণ্ডি' বা হাঁটা পথ আছে। ইংরেজ সরকার ১৯১০ সালের কাছা-কাছি রাজনৈতিক কারণে গারো পাহাড়কে সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করার পূর্বে পর্যন্ত সন্ন্যাসী এবং তীর্থযাত্রীদল সে পথেই যেতেন।

কিংবদন্তী হচ্ছে যে, সেকালে জেলে বা ধীবর সম্প্রদায় সমতলের অধিবাসী ছিলেন। গারোরা কিন্তু সে যুগের মতো আজও পাহাড়বাসী। গারোদের ধর্মবিশ্বাস হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। তখন 'বাহিশা' ছিলেন গারোদের প্রধান। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটা অন্তত পক্ষে তাঁরই শাসনে ছিল। তিনি সমতলবাসীদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে কিংবা তাদের মেরে ফেলে মাঝে মাঝেই বিপর্যয় ঘটাতেন। কান্যকুব্জের সেই সন্ন্যাসীদল সে সময় বাঘমারা থেকে প্রায় মাইল খানেক উজানে সোমেশ্বরী নদীর তীরে ডেরা করেছিলেন। সোমেশ্বরীর স্বচ্ছ এবং ক্ষিপ্র প্রবাহে জেগে থাকা যে সমতল শিলাখণ্ডে বসে তাঁরা উপাসনা করতেন, সেটা আজও সেখানে আছে। তার নাম 'দেওশিলা।' সেখানে পুজো দেওয়ার রীতি গারোদের মধ্যেও ছিল। তাছাড়া জেলেরাও আসা যাওয়ার পথে দেওশিলার উদ্দেশে পুজো দিতেন। এই দুয়েরই অর্থ 'ভগবানের শিলা'। ধীবর দলপতি সাধুদের কাছে গিয়ে গারো প্রধানের উৎপীড়নের কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁদের ঐশিক শক্তির প্রভাবে বাহিশা আর তাঁর অনুচরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সাধুরা, যে কারণেই হোক, সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যুবক সোমেশ্বর কান্যকুব্জে গিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং ধীবর দলপতির সদিচ্ছা ও সহযোগিতায় তাঁর আপন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। রাজ্যের রাজধানী হবে আরো দক্ষিণে - যেখানে ছিল এক অশোকতরু বন। তার মধ্যে বিশেষ একটা গাছকে চিহ্নিত করে তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন যে, সেটা হবে রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং রাজ্যের পরিচয় হবে 'সুসঙ্গ রাজ্য' বা 'সুসঙ্গ দেশ'। শোনা যায় দলের সুযোগ্য এবং অতি প্রাকৃত শক্তির অধিকারী এক সন্ন্যাসী তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সে-অশোক গাছ যতকাল বেঁচে থাকবে, সোমেশ্বরের উত্তর পুরুষগণও ততকাল সসম্মানে টিকে থাকবেন। কিন্তু সে-গাছ মরে গেলে পরিবারের অবস্থান্তর ঘটবে। 'সুসঙ্গবাসীর মনে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর গভীর প্রভাব সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। বহু প্রাচীন সেই অশোক গাছের জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে আছে অন্য এক অশোক গাছ। পুরানো সেই অশোক গাছের মূল থেকেই উদ্ভব হয়েছে পরবর্তী গাছ। তাই সুসঙ্গ দেশের কেন্দ্রস্থলকে আজও নির্দেশ করা যায়।

এভাবে ত্রয়োদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে অথবা তার সমসাময়িক কোন কালে সুসঙ্গকে রাজধানী করে সোমেশ্বর তাঁর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৫৫৬ থেকে ১৬২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বরের সপ্তম পুরুষ রাজা রঘুনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করবার আগে এই পরিবারের নৃপতিগণ প্রায় আড়াই শতকেরও বেশী কাল স্বাধীন ছিলেন। মুঘলদের সঙ্গে সংযোগ রেখেও সুসঙ্গের রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাক্ত শাখার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন; তাছাড়া বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে বারেন্দ্র শাখার সঙ্গেও সম্পর্ক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৯০ সালে জরিপের সময় ব্রিটিশ সরকারের (তদানীন্তন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) সঙ্গে রাজা রাজসিংহের আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজগণ ১৮৮৪ সালে এই পরিবারের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠানুক্রম 'মহারাজা' উপাধিলাভ স্বীকার করে নিলেও দেশের প্রান্ত সীমায় এমন এক সামন্তরাজ্যের স্বায়ত্ত শাসন মানতে প্রকৃত পক্ষে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে তাঁরা এই অঞ্চলের শাসকবর্গের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে দুটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠানুক্রমে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রথা লোপ এবং দ্বিতীয়, ১৮৬৯ সালে 'গারো হিলস্ এ্যাক্টে'র বলে সমগ্র গারো পাহাড় অঞ্চল অধিকার।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে সমগ্র পূর্ববঙ্গের সাথে সুসঙ্গ অঞ্চলকেও পাকিস্তানভুক্ত করার ফলে এই রাজপরিবার একেবারে ভাঙনের শেষ সীমায় এসে পড়েন, এবং রাজপরিবার এক প্রাচীন নিষ্প্রাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের জীর্ণ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় সকলেই ভারতে এসে মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী। আজ আমার জমি বা প্রজা কিছুই নেই; তবু গণতান্ত্রিক ভারতে দুর্ভাগ্যক্রমে আজও আমি 'মহারাজা' উপাধির বোঝা বয়ে বেড়ানোর দায় থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার আগে কালের বিভিন্ন পর্যায়ে সুসঙ্গবাসীর জীবন যে সংস্কৃতি-ধারায় চলেছিল তার সারাংশ হচ্ছে:

১। সোমেশ্বরের রাজত্ব পত্তনের সময় গারো এবং হিন্দু ধীবর সম্প্রদায়ের আপন আপন আদি সংস্কৃতির প্রভাব।

২। উত্তর ভারতীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে ঐতিহ্য সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে এসেছিলেন বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রণের ফলে তার কিছু কিছু পরিবর্তন এবং জনজীবনে সুসঙ্গ রাজপরিবারের প্রভাব।

৩। ইসলাম সংস্কৃতি এবং মুসলমান রাজত্বের প্রভাব।

৪। খৃষ্টধর্ম, ইংরেজ শাসন, ইংরেজি শিক্ষা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বসবাসেচ্ছু দলবদ্ধ মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ও প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর ও পূর্ববঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কাঠামো

সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে ধারা বহন করে এনেছিলেন এবং বাংলার সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পরে তাকে যেভাবে রূপান্তরিত করেছিলেন, সুসঙ্গবাসীর জীবন ও কৃষ্টিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তা যে প্রভূত ভাবে কার্যকরী হয়েছিল সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

মহারাজা আদিশূরের সময় থেকে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজ প্রধান তিন শাখায় বিভক্ত—(১) বারেন্দ্র, (২) রাঢ়ী, (৩) বৈদিক। আদিশূরের সঠিক কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্মণগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসে বাংলায় বসবাস করেছেন এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলেও গিয়েছেন। এর উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে মহারাজ বল্লাল সেন বাংলার হিন্দু সমাজকে আবার সংগঠন করেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ 'সপ্তশতী' ও 'ঔপনিবেশিক' নামে পরিচিত ছিলেন। হয়ত মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালেও এসব নামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। উত্তরকালে বহিরাগত মুসলমান শক্তির সঙ্গে বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘাত বেধেছিল। তাই দেখা যায় যে, হিন্দুদের কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম, এমনকি সমাজ সংস্কারের কাঠামোও 'নারদীয় ধর্মসূত্র'-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ এক অনুশাসনকে আশ্রয় করেই স্বীকৃত হয়েছে।[১]

সেকালে 'যজন' (ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপাসনা), 'যাজন' (পরহিতার্থে ঈশ্বরপূজো), 'অধ্যয়ন' (বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি পাঠ), অধ্যাপনা—এ সবই ব্রাহ্মণের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই রীতির মধ্যে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, পরশুরাম ব্রাহ্মণ ঋষি হয়েও সে যুগে ভারতের উদ্ধত যোদ্ধা নৃপতিদের অনেকবার পরাভূত করেছিলেন। পরমবিজ্ঞ ভরদ্বাজ মুনি 'ধনুর্বেদ সংহিতা' নামে সমরশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাঁর উত্তর-পুরুষ দ্রোণাচার্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব সেনাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

বাংলা ও আসামের কোন কোন অঞ্চলে পাল রাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। শোনা যায় আদিশূরে বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিহত

করে বাংলায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন। বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের তখন এতোই অবনতি ঘটেছিল যে, তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধিমতো কাজের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় ব্রাহ্মণও পাওয়া যায়নি। তাই সেকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্রভূমি কান্যকুব্জ থেকে শ্রাদ্ধকার্যের জন্যে তাঁকে পাঁচজন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ আনাতে হয়েছিল।

'কুলশাস্ত্রে' এ সম্বন্ধে কৌতুককর এক ঘটনার উল্লেখ আছে। কান্যকুব্জের সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসে যখন রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের কাছে তাঁদের আগমন বার্তা জানালেন, তখন এই ব্রাহ্মণেরা রীতিমতো যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত ছিলেন। দ্বাররক্ষীদের কাছে আগন্তুকদের বর্ণনা শুনে মহারাজা তাঁদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা না-মঞ্জুর করলেন। কারণ, তিনি ভাবতেও পারেননি যে সং ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বেশে এসেছেন। ব্রাহ্মণগণ সে-সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। তার আগে তাঁরা প্রহরীদের কাছ থেকে একটু জল নিয়ে কমণ্ডলুতে রাখলেন এবং পরে অনতিদূরে পত্রবিহীন একটা মৃতবৃক্ষে সেই জল মন্ত্র উচ্চারণ করে ছিটিয়ে দিলেন। দ্বারপালরাও অবাক হয়ে দেখল যে, গাছটা জীবন্ত হয়ে সবুজ পাতা আর ফুলে একেবারে ছেয়ে গিয়েছে।

ব্রাহ্মণদের কোপে পড়ে পাছে রাজার কোন অনিষ্ট হয় তাই প্রহরীরা তখনি ছুটে গিয়ে রাজাকে সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা জানাল। রাজাও কালবিলম্ব না করে চলে এলেন এবং ব্রাহ্মণদের বন্দনা করে তাঁর গুরুতর ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ব্রাহ্মণরা এতে শান্ত হলেও রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন না। কিন্তু রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কান্যকুব্জে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দেবেন।

নবাগত সেই ব্রাহ্মণগণ বাংলাদেশের অধিবাসী হয়ে স্বজনদেরও কান্যকুব্জ থেকে নিয়ে আসেন। রাজ-আনুকূল্যে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজকে তাঁরা সংগঠিত করে সনাতন শাস্ত্রীয় রীতিতে আবার শিক্ষিত করে তোলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু এঁদের প্রভাব মেনে নেন, কিছু আবার আসাম, শ্রীহট্ট এবং অন্যান্য অঞ্চলে চলে যান।

আগন্তুক কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের মহারাজা আদিশূর জমি দিয়েছিলেন। তাঁরা গঙ্গার দুই তীরেই বসবাস স্থাপন করেছিলেন। এই বাসভূমির উত্তরাঞ্চল 'বরেন্দ্র ভূম' আর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল 'রাঢ়ভূম' নামে পরিচিত ছিল। মোটামুটিভাবে প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ নিয়ে রাঢ়ভূম এবং রাজসাহী বিভাগ ও ঢাকার এক অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূম গঠিত হয়েছিল। ফলে এই দুই অঞ্চলের মানুষ যথাক্রমে 'রাঢ়ী' আর 'বারেন্দ্র' নামে পরিচিত ছিলেন।

কালক্রমে এই দুই অঞ্চলবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি এতোই পৃথক হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ই স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে বিবাহাদিও বন্ধ হয়ে যায়। আগেই বলেছি যে, প্রাচীন সপ্তশতীদের মধ্যে কিছু কিছু এই দুই

সমাজের সঙ্গেই মিশেছিলেন। যাঁরা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও আসামে গিয়েছিলেন তাঁরা 'সারস্বত' ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অস্পৃশ্য ও আদিবাসী সমাজের যাজকও হয়েছিলেন। এঁদের বলা হতো 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'। সনাতন আদর্শপন্থী অনেক মানুষ আবার বাংলাদেশেই ছিলেন। একজন বিশেষজ্ঞ[২] বলেছেন যে আদিত্য, ভাদাড়ি, করঞ্জা, ভট্টশালী এবং কামদেব ব্রাহ্মণ গোষ্ঠিগুলি এ অঞ্চলের বারেন্দ্র সমাজের সঙ্গে মিশে যান।

প্রবাদ এই যে, মহারাজা বল্লালসেনের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে আগন্তুক ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষগণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১০০; তাঁদের মধ্যে ৭৫০ জন ছিলেন রাঢ়ী আর ৩৫০ জন বরেন্দ্র সমাজভুক্ত পরিবার।

শোনা যায় যে ৩৫০ জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে ২৫০ জনকে সনাতন বৈদিক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যথাক্রমে ৫০ জন মগধে, ৪০ জন উড়িষ্যায়, ৬০ জন রাভাঙ্গে, ৬০ জন ভুটানে এবং ৪০ জন নৌরাঙ্গে যান। অবশিষ্ট ১০০টি পরিবার পাঁচটি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়েন; যেমন. শাণ্ডিল্য-১৪, ভরদ্বাজ-২৪, কাশ্যপ-১৮, সাবর্ণ্য-২০, এবং বাৎস্য-২৪। রাজকীয় দান হিসেবে প্রত্যেকে এক-একখানি গ্রামের ভোগস্বত্ব পান।

সেই থেকেই প্রত্যেক বারেন্দ্র পরিবার রাজার দান হিসেবে পাওয়া পূর্বপুরুষদের 'গ্রাম' অথবা 'গাঁইর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[৩]

যাঁদের পূর্বপুরুষগণ দ্রাবিড় অঞ্চল বা দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিলেন, তাঁরা 'বৈদিক' নামে পরিচিত হন। এঁদের ছাড়াও পশ্চিম অঞ্চলের বৈদিক ব্রাহ্মণও ছিলেন; অর্থাৎ তাঁদের পূর্বপুরুষগণ আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত কনৌজী ব্রাহ্মণদের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিলেন। তাঁদের বসতি সম্বন্ধে কিন্তু কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ, তাঁরা সম্ভবত রাজার কাছ থেকে কোন গ্রাম দান হিসেবে পাননি। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা উত্তর-পশ্চিম দেশীয় বৈদিকদের পরম আগ্রহে তাঁদের গুরু বা পারিবারিক ধর্মকর্মের বিধায়করূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, শিষ্যের সমস্ত পাপের বোঝা গুরু নিজে বহন করেন। তাই গুরুবৃত্তি গ্রহণে এই দুই সমাজের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি।

মহারাজা বল্লালসেনের রাজত্বকালে তাঁর নির্দেশেই আর একবার সমীক্ষা করা হয়েছিল; ফলে প্রকৃত সৎ ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত মাত্র ১৯টি রাঢ়ী আর ৭টি বারেন্দ্র পরিবারকে পাওয়া গিয়েছিল। তাই তাঁদের বিশেষ স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছিল। তাঁরাই 'কুলীন' অর্থাৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। অবশিষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বলা হতো 'শ্রোত্রিয়।' কুলীন ব্রাহ্মণের লক্ষণ হচ্ছে—

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনম্,
নিষ্ঠা, বৃত্তি স্তপঃ, দানম্. নবধাকুললক্ষণম্ ॥

পরবর্তীকালে আদর্শভ্রষ্ট কুলীন বংশধরদের 'কাপ' শ্রেণীরূপে নির্দিষ্ট করা হয়। কাপ ব্রাহ্মণরা কুলীনদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কযুক্ত হয়েও কুলীন সমাজে প্রায় অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য হন। কাপের মেয়ের সঙ্গে কোন কুলীনের বিয়ে হতো না। কোন শ্রোত্রিয় কাপের সংগে মেয়ের বিয়ে দিলে তিনি মর্যাদা হারাতেন। তবে মর্যাদা ফিরে পাবার একটা উপায় ছিল। তাতে হয় কোন নায়ক শ্রোত্রিয় বা কুলীনের ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে হতো। যা হ'ক, কাপেরা ছিলেন উদার। তাই কালক্রমে তাঁরা বহু কুলীন, এমনকি বাইরের মানুষকেও আপন গণ্ডির মধ্যে এনেছিলেন। পরবর্তী যুগে মুঘল প্রতিভূরূপে তাহিরপুরের রাজা ছিলেন বাংলার সুবাদার বা গভর্নর। তিনি কাপদের শ্রোত্রিয়োত্তর মর্যাদা দান করেন।

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী নামে সে কালের এক পণ্ডিত বারেন্দ্র সমাজের নব ধারাকে সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করেছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে অনুলোম বিবাহপ্রথা উৎকর্ষের দিক দিয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল; অর্থাৎ বর্ণাশ্রম সমাজে পরবর্তী কালে বিধিনিয়ম কঠোর হওয়ার আগে উচ্চবর্ণের ছেলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্ণের মেয়ের বিয়ে হতো। কিন্তু কৌলীন্য প্রথার প্রচলনে অনুলোমরীতির মূল বিধানও ব্রাহ্মণ্য সমাজের নব রূপায়ণে কিছুটা স্থান পেয়েছিল। এর স্বীকৃত তাৎপর্য হচ্ছে যে, নীতি হিসেবে ছেলের ক্ষেত্রে প্রতিলোম বিবাহের ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও সেটা একেবারে অসম্ভবও ছিল না।[৪]

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সমগ্র হিন্দু সমাজের অবস্থা আবার বিচার করে দেখে বাংলার প্রধান প্রধান বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য (ব্রাহ্মণ পুরুষ আর শূদ্রা স্ত্রীর বিবাহজাত সন্তান) ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করা হয়। পর্যালোচনার সময় দেখা গিয়েছিল যে মহারাজা বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালের অধিকাংশ কুলীনই নির্দিষ্ট আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই বিশুদ্ধতার ক্রম পর্যায়ে সেই বর্ণগোষ্ঠীদের আবার নূতন করে বিন্যাস করা হয়। তখন বারেন্দ্র সমাজে কুলীনদের আটটি পঠি-তে যেভাবে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে— (১) নিরাবিল, (২) রোহিলা, (৩) বেণী, (৪) ভূষণা, (৫) কুতুবখানী, (৬) ভবানীপুরী, (৬) জোনালি, (৮) আলিয়াখানী।

বারেন্দ্রগণ যে-ভাবে পঠিতে পর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই রাঢ়ীরাও 'মেল'-এ বিভক্ত হন। সুসঙ্গের ঐতিহ্য যেহেতু বারেন্দ্র সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাই রাঢ়ী সমাজের প্রসঙ্গ অতঃপর আর উল্লেখ করা হবে না।

সামাজিক বিবাহাদি ব্যাপারে প্রত্যেক পঠি আপন আপন গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। তাই বিবাহযোগ্য কুলীন ছেলের খুব চাহিদা ছিল। ফলে, পণপ্রথা ও একাধিক বিবাহের চল হয়। তা সত্ত্বেও বারেন্দ্র সমাজে একাধিক

বিবাহ কিন্তু অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। প্রত্যেক পঠির নিজ নিজ নায়ক ছিলেন। পরে মূল নায়কের উত্তরপুরুষগণই সে সম্মানের উত্তরাধিকারী হতেন। তাই কালক্রমে বেশ কিছু নায়ক পরিবারকে দেখা গিয়েছিল। সমস্ত পঠির তথা বারেন্দ্র সমাজের নায়কত্ব গৌরব কিন্তু একমাত্র তাহিরপুরের রাজারই ছিল। সে মর্যাদা তাঁর পরিবারে বর্তিয়েছিল।[৫] তাঁরা 'উদয়াচল' নামে খ্যাত ছিলেন।

পঠি নায়করা কোন সমস্যায় একমত হতে না পারলে সাধারণ নায়কের কাছে তা উপস্থাপিত করতেন এবং সকলেই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে উদয়াচল সমাজ প্রধান অর্থাৎ সমাজপতি সমস্ত পঠিনায়ক, সমাজপ্রধান এবং তাবৎ বারেন্দ্রকুলের হাল আমল পর্যন্ত কুলজি রাখা যাঁদের কাজ সেই কুলজ্ঞদেরও ডেকে পাঠাতেন। প্রত্যেক পরিবারের সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত জন্ম ও বিবাহ ঘটিত ইতিবৃত্ত তাঁরা রাখতেন। সেগুলো 'কুল পঞ্জিকা' নামে পরিচিত ছিল। সাধারণ নায়কের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও অন্য সকলের সম্মতি তিনি কদাচিৎ পরিবর্তন করতেন এবং তিনি সর্বদা সর্বজনগ্রাহ্য এক সিদ্ধান্তে যেভাবে পৌঁছতেন, তাতে নায়ক হিসেবে তাঁর যোগ্যতাই প্রতিপন্ন হয়েছে এ কথা স্বীকার্য। নায়কদের প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস পাওয়ার ফলে কুলজ্ঞদের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে কুলজ্ঞদের অর্থলিপ্সা যে কোন পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধি বা হানি ঘটাতে পারত। বিশেষত যে কোন কুলীনের বিবাহ পাকাপাকিভাবে ঠিক করতে হলে একজন নায়কের সামনে দু' পক্ষকেই অপরিহার্যরূপে সে অনুষ্ঠান করতে হতো এবং কুলজ্ঞরাও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। তখন প্রায়ই, ঝামেলা তো হতোই, বিতণ্ডাও চলত। অবশ্য এ প্রথা প্রধানত কুলীনদের বিবাহ ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমার মনে আছে ১৯১২ সাল নাগাদ এক গ্রীষ্মের ছুটিতে এই ধরনের এক বিরোধ সর্বদিক দিয়ে বিচার করে মীমাংসা করার দায়িত্ব কাকাদের উপর এসে পড়ে। আমার বাবা তখন কলকাতায়। সমস্যাটা দেখা দেয় নবপরিণীত এক কুলীনের পাকস্পর্শ উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই উপলক্ষে নব বধূ কুলীন সমাজভুক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অন্ন পরিবেশন করে থাকেন। সেই অনুষ্ঠানে কোনও এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলেন যে, এ বিবাহ অশাস্ত্রীয় ভাবে হয়েছে। ফলে, সমাগত নিমন্ত্রিতদের খেতে ডাকা হলে কেউই রাজী হলেন না। সে প্রসঙ্গ নিয়ে প্রধানদের মধ্যে দু' দিন, দু' রাত্রি ধরে নিরবচ্ছিন্ন বিচার আর বিতণ্ডার পর বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা নবদম্পতির প্রতিকূলে ছিল। যথাস্থানে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে অপারগ হয়ে কুলীনরা এসেছিলেন পাঁচ মাইল দূরে সুসঙ্গ রাজবাড়িতে।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে বাংলার স্বীকৃত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রূপ একান্তভাবেই রক্ষণশীল ছিল। রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবাগত কান্যকুব্জবাসী।

কাজেই বাংলার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবিতকালে সে প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। পরিবারের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ ছিলেন রাজা জানকীনাথ। তিনি গৌর রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতায় তৎকালীন বাংলার সুবাদার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্র প্রতিষ্ঠায় সম্মত করিয়েছিলেন। তখন থেকে বারেন্দ্র সমাজে সুসঙ্গ রাজপরিবার 'উদয়াচল' রূপে এবং তাহিরপুর রাজপরিবার 'অস্তাচল' রূপে স্বীকৃত হন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃত্বে অতঃপর সুসঙ্গ রাজপরিবারের স্থান হয় প্রথম এবং তাহিরপুর রাজপরিবারের দ্বিতীয়। তাছাড়া আট পঠির কুলীনদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের অতিরিক্ত সুবিধেও সুসঙ্গ রাজপরিবার পান। এই সম্মান বিশেষত্বে অতুলনীয় ছিল এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তা বজায় ছিল। বিংশ শতকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রভাবে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটা সত্ত্বেও বারেন্দ্র সমাজের নেতৃত্বপদে সুসঙ্গ রাজপরিবার দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

যে কালে মহারাজ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রতিহত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছিল, সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাগণ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ব্রাহ্মণ্য সমাজে তখন আত্মপ্রকাশ করেন। পরিবেশটা তখন ছিল প্রতিরক্ষামূলক। তাই বিশুদ্ধ নৈতিক আদর্শের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়েছিল। সুসঙ্গ রাজারাও যুগোপযোগী রক্ষণশীলতার প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিশুদ্ধ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলে পরিবার বিশেষের মর্যাদা হ্রাস করার নীতিতে সমাজের সতর্ক দৃষ্টি যে কত কঠোর হতো তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বারেন্দ্র সমাজে তের রকমের ছোটখাটো ত্রুটির জন্যে 'আঘাত' এবং পঁয়তাল্লিশ রকম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির জন্যে 'অবসাদ' আরোপ করা হয়েছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পরে সমগ্র বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সংস্কার ও সংগঠন করার তেমন কোন চেষ্টা হয়নি। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বিংশ শতকের প্রথম দশকে তৎকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি সমস্ত ব্রাহ্মণদের নিয়ে সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ও বিচার করে সময়োপযোগী জরুরী পরিবর্তনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় কালীঘাটে এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সম্মেলনের কার্য পরিচালনার জন্যে সুসঙ্গের মহারাজা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ১৯১৩ সালের এক মাঘী পূর্ণিমায় মহারাজ কুমুদচন্দ্রের পৌরোহিত্যে বারেন্দ্র সমাজে কুলীনদের আট পঠির মধ্যে বিনা বাধায় বিবাহাদি কার্যের সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়েছিল।

বর্তমান পরিচ্ছেদের উপসংহারে পৌঁছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শক্তি প্রকৃতপক্ষে সামন্ত ভূস্বামীদের সহায়-নির্ভর ছিল।

তৎকালীন সামাজিক নেতৃত্বকে খেয়ালী কর্তৃত্ব মনে করা ভুল হবে। কারণ, তা ছিল বংশপরম্পরাগত, নিয়মতান্ত্রিক এবং সামাজিক প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা সমূহের নির্দেশ-শাসিত।

কোন সম্মেলনেই নেতারা যে, সর্বসম্মত এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রায় কখনও ব্যর্থ হতেন না তা উল্লেখযোগ্য। আমার ধারণা আধুনিক যুগের সার্বিক গণতন্ত্রের মধ্যেও ঐতিহ্যগত এক সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত হতে পারে।

নায়ক পরিবারদের সংহতি ক্রমে শিথিল হয়ে যায় এবং বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে মতৈক্যে আসা আরও জটিল হয়ে পড়ে। বারেন্দ্র সমাজে মুখ্য পরিবার-দের অসচ্ছল ও বিশৃঙ্খল অবস্থা ক্রমে সমাজে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশেষে নায়কতন্ত্রও দুর্বল হয়ে যায়। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। শুধু মুখরক্ষার খাতিরে ব্রাহ্মণ সভার মাধ্যমে মর্যাদার প্রশ্নটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্রাহ্মণ সভাও সনাতন শাস্ত্রীয় অনুশাসনের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে নায়কদের মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মণ সভায় তারও অভাব ছিল। ১৯২৩ সালের পর থেকে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় অচল অবস্থাতেই ছিল। কারণ, রাজনীতির সঙ্গে এর সংযোগ ঘটার ফলে ইংরেজ শাসকের হাতে এটা গান্ধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে সমাজ সংস্কারের প্রভাব ক্রমে হিন্দু মহাসভার হাতে চলে গিয়েছিল। হিন্দু মহাসভাও বহু ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম সমাজের নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল।

টীকা

১। উৎকৃষ্টং বা অপকৃষ্টং বা,
তয়ো কর্ম্মন্ বিদ্যতে।
মধম্যে কর্ম্মনি হিত্যে,
সর্বসাধারণ্যে হিতে ॥

২। শ্রী সাগর প্রকাশ।

৩। ব্রাহ্মণ ইতিহাস—শ্রী হরিলাল চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৩২৬।

৪। এই প্রথা সমাজে এতোই অনুপ্রবেশ করেছিল যে, অবৈধ সংসর্গের ক্ষেত্রেও অনুলোমের প্রাধান্য এবং প্রতিলোমের নিন্দা স্বীকৃত হয়েছিল।

৫। পরবর্তী কালে মূল নায়ক শ্রোত্রিয় পরিবার লোপ পেয়েছিল; তাই মেয়ের ছেলে অর্থাৎ এক কুলীন সম্পত্তির অধিকারী হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গ রাজপরিবার

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সুসঙ্গ রাজপরিবার তাঁদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি সুসঙ্গে বসবাস করেছেন। বাংলার প্রাচীন জমিদারদের মধ্যে সুসঙ্গ রাজপরিবারকেও যে গণ্য করা হয় সে আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনতিকাল পূর্বে ১৯৩৯ সালে বাংলায় ভূমিস্বত্ব প্রথা সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে যে রাজকীয় কমিশন বিচার বিবেচনা করেছিলেন, সেখানেও দেখা যায় যে, বাংলার বিশিষ্ট এক সিবিলিয়নের সাক্ষ্যে বঙ্গীয় জমিদারদের তিনি নিম্নলিখিত রূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) স্বাধীন বা করদ গোষ্ঠিপতি—মুঘল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও তাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন না বা সামন্ত নৃপতিও ছিলেন না। অথচ সার্বভৌম ক্ষমতার উপাঙ্গ হিসেবে জমিদারী তাঁদের অধিকারে ছিল। যেমন, সুসঙ্গের মহারাজা, ইশা খাঁর উত্তরপুরুষ হৈবতনগরের (মৈমনসিংহের) জমিদারগণ, রামগড়ের রাজাগণ ইত্যাদি।

(খ) উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদার—নদীয়া, বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর, পুঁটিয়া এবং তাহিরপুরের রাজাগণ।

(গ) আদিতে নাজিমদের দ্বারা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিযুক্ত হলেও কালের প্রভাবে পরে যাঁরা বংশানুক্রমে রাজস্ব আদায়কারী কিংবা তাও বাতিল হয়ে গিয়ে জমিদার হয়েছিলেন।[১]

সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও আমি এবার মোটামুটি ভাবে উল্লেখযোগ্য সুসঙ্গ রাজাদের সমকালীন ঘটনার বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

সুসঙ্গ রাজবংশের প্রবর্তক কবে সুসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেটা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা শক্ত। তাই এখানে কালের নির্ভুলতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করব না। সুসঙ্গ পরগণায় এই পরিবারের প্রভাব এবং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশের চলতি রীতিনীতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যেমন ছিল মুখ্যত তার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

সুসঙ্গে আর্দ্র জলবায়ু, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, ঘন ঘন ভূমিকম্পে স্থায়ী দালান-বাড়ির অভাব এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূলতায় রাজপরিবারের অধিকাংশ প্রাচীন নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া অবশিষ্ট দলিলপত্র যা আছে তাও আমার আয়ত্তের বাইরে। কারণ, সে অঞ্চল এখন ভূতপূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এবং বাধ্য হয়েই আমাকে ভারতবাসী হতে হয়েছে। তাই উপস্থিত প্রচেষ্টার পক্ষে প্রাপ্তিসাধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাসঙ্গিক দলিলের অনুলিপি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। বর্তমান রচনার কাজে সেগুলো থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। আমার কাকা স্বর্গীয় কুমার দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র সিংহের সংশোধিত একটা বংশতালিকা এবং স্বর্গীয় পিতৃদেব সুপণ্ডিত মহারাজা কুমুদ চন্দ্র সিংহের এক প্রামাণ্য লিপিও আমার কাছে আছে। উভয় সূত্রেই সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠকের বা ঠাকুরের আবির্ভাব কাল হিসেবে ১২৮০ সাল চিহ্নিত হয়ে আছে। 'মৈমনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র' এবং প্রাপ্তব্য লিখিত সমস্ত নথিপত্রেই এই তারিখ সমর্থিত হয়েছে। কুলজ্ঞবৃত্তির কল্যাণে রাজপরিবারের কুল পঞ্জিকায় প্রতিষ্ঠাতার আগমন কাল সম্বন্ধে পরোক্ষ ভাবে কিছু জানা যায়।

উপস্থিত কুমার দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র সিংহের সংশোধিত বংশতালিকার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে; কারণ, সম্ভাব্য বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া সমস্ত নথিপত্র সযত্নে মিলিয়ে তিনি এটা তৈরি করেছিলেন।

সুসঙ্গ রাজপরিবার সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য তথ্য নিম্নলিখিতরূপে বিন্যাস করা যায়:

সংস্কৃত ও বাংলায় বিভিন্ন রচনাবলী, বাংলার স্বাধীন নায়ক এবং ব্রাহ্মণদের ইতিহাস, গ্রাম্য গাথা, পারিবারিক সংস্কৃতি যা পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে এসেছে, মুঘল দরবারের গুরুত্বপূর্ণ দলিল, পারিবারিক নথিপত্র, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রচলিত পারিবারিক রীতি, গারো পাহাড় অধিকার সম্বন্ধে বিচারালয়ে উপস্থাপিত মকদ্দমার কিছু দলিল, এবং ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক রিপোর্ট।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত 'দেশাবলী বিবৃতি' নামে একটা সংস্কৃতে রচিত পাণ্ডুলিপি অতি সাম্প্রতিক কালে পাওয়া গিয়েছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (খণ্ড ৫৫, পৃঃ ১-২) এক প্রবন্ধও লিখেছেন। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই পাণ্ডুলিপি থেকে সুসঙ্গ দেশ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক অংশগুলো অনুগ্রহ করে আমাকে অনুলিপি করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিন'শ বা চার'শ বছর আগে অযোধ্যার রাজা পূর্ব ভারতীয় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের দেশজ ও লৌকিক রীতিনীতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের, বিশেষ করে সেই সব দেশের দুর্গ, প্রাসাদ আর জলপথের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজে এই পাণ্ডুলিপি রচয়িতাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সুসঙ্গ দেশের সমগ্র

বিবরণ দেখে মনে হয় যে, পাণ্ডুলিপিকার এই অঞ্চলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিশদ বর্ণনাগুলোও আশ্চর্যরকম সত্য।

'মৈমনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র' থেকে কিছু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছি : কারণ মনে হয় এর মধ্যে সুসঙ্গ রাজপরিবার সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তা তথ্যনির্ভর ও প্রাঞ্জল। বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-বাসী প্রাচীন এই হিন্দু পরিবারের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোও সুস্পষ্ট করার জন্যে আনুষঙ্গিক উদ্ধৃতির শেষে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো প্রয়োজন মতো সংযোজিত হয়েছে। বহু শতাব্দীর আবর্তে এই পরিবারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তবু প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কিছু উপাদান আজও টিকে আছে।

> সোমেশ্বর পাঠক কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ। তাঁর আগমন-কাল তেরশ শতকের শেষ দিকে। সঙ্গীয় সন্ন্যাসী দল এবং সমতট বাসীদের সাহায্যে তিনি শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ছোট ছোট টিলার অধিবাসী[২] গারোদের উপরেও প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেন। সাধুসংগ থেকে উদ্ভব হওয়ায় তাঁর রাজ্য সুসংগ নামে পরিচিত হয়। খাসিয়া রাজাকে তিনি কতগুলো গ্রাম ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিলেন। শ্রীহট্টের হুসেন প্রতাপ পরগণাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সোমেশ্বরের পুত্র বুদ্ধিমন্ত (গুণাকর কিংবা গুণেশ্বর) সর্বপ্রথম এক বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সংগে মেয়ের বিয়ে দেন।[৩] কুলীন ব্রাহ্মণের সংগে সুসংগ রাজপরিবার দুহিতাদের বিবাহ প্রথা কিছুকাল পূর্বেও অক্ষুণ্ন ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। প্রতিষ্ঠাতার ষষ্ঠ পুরুষ জানকীনাথ রাজসাহীর তাহিরপুর রাজকন্যাকে পৌত্রবধূ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
>
> পরবর্তী রাজা রঘুনাথের সময় গারোদের অশান্তি বৃদ্ধি পায়[৪], তাই তিনি আকবর বাদশাহের প্রতিনিধি মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং নজর হিসেবে অগুরু কাঠ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে, সমসাময়িক কাল পর্যন্ত এই পরিবারের যে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল,তা হারাতে হয়। মানসিংহের সহযোগিতায় রঘুনাথ বিক্রমপুরের চাঁদ রায়ের সংগে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধার্জিত সামগ্রীর সংগে তিনি চাঁদ রায়ের পারিবারিক বিগ্রহ দশভূজাকেও নিয়ে আসেন। দশভূজা বিগ্রহের নামেই বংশের রাজধানী দুর্গাপুর আখ্যায় আখ্যাত হয়। রঘুনাথের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে, বিয়ের রাতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে পিঠে তুলে নিয়ে পারিবারিক শত্রু বওলার জোয়ারদার বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাজকুমারকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেই বিয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন।[৫] রঘুনাথের পুত্র রামনাথকে দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর এক সনদ দেন। শোনা যায় এরপর পরিচিতি হিসেবে তিনি 'মতিনাশ' নামের সংগে যুক্ত হন। কারণ, জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তাঁর

দু'ভাইয়ের তরফে সন্নিহিত দু'টি পরগণার সনদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলেন : তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, দু'ভাই নিজে গিয়ে সেই সনদ গ্রহণ করবেন। কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে এসে দু'ভাইয়ের মধ্যে একজনকেও জীবিত অবস্থায় পাননি।

রামনাথের পরে উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামজীবন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ভাইপো যাদবেন্দ্র সিংহের নামে এক মৌরুসী তালুক দিয়ে যান। সেই ওয়ারিসী সূত্রেই পূর্বধলা ও ঘাগরার রাজারা এই সম্পত্তি পান। মূল সুসঙ্গ পরগণার ১৪ আনা অংশ পরে ১৩৭ নং তৌজিভুক্ত হয়।

রামসিংহ আওরঙ্গজীবের সময় রাজা ছিলেন। তিনি কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু রাজধানী সুরক্ষিত করার কাজ শেষ না হতেই তাঁকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, আব্দুল রহমান নাম নিয়ে এক মুসলমান মহিলার পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর হিন্দু ও মুসলমান পত্নীদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মুসলমান রাজশক্তি তাঁদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা হিন্দু রানীর পুত্র রণসিংহের পক্ষই সমর্থন করেন এবং ১৭৩৫ সালে আব্দুল রহমানও রণসিংহের অনুকূলে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। তিনি নিজের ভরণপোষণ এবং মুসলমান বংশীয় উত্তরপুরুষদের জন্যে পরগণা থেকে শুধু ডিহি মহাদেও রেখে দেন। রণসিংহের পুত্র রাজা কিশোর বিভিন্ন হাজং পরিবারকে হাতি খেদার কাজে সাহায্য করার জন্য পাহাড়তলী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু খেদা থেকে যথেষ্ট আয় না হওয়ায় যথাসময়ে রাজস্ব দেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে ১৭৫৭ সালে রাজা কিশোর আর তাঁর ভাই রাজসিংহ ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। তাঁদের শাস্তি হয় এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন বেত্রাঘাত এবং টাকা আদায় না হলে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ঢাকা শহর অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজ সৈন্যের দখলে চলে যায় এবং তাঁরাও রক্ষা পেয়ে যান।

রাজা রাজসিংহের সঙ্গে সেই সময় দশশালা বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয়। কোম্পানীও রাজা উপাধি স্বীকার করে নেন। রাজা রাজসিংহের তিন পুত্রই কালেক্টরিতে আপন আপন নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে ১৮২৭ সাল থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাজনা আদায় করতে থাকেন। ১৮২৯ সালে জগন্নাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী ইন্দ্রমণি এবং ১৮৩৩ সালে গোপীনাথের লোকান্তর ঘটলে তাঁর বিধবা পত্নী হরসুন্দরী যথাক্রমে কালেক্টরিতে নাম রেজিস্ট্রি করান। সুসঙ্গ রাজ্যের দুর্ভাগ্য এভাবেই শুরু হয়। ১৮৪৩ সালে হরসুন্দরী দুই মেয়েকে নিয়ে শঙ্করপুরে চলে যান এবং ১৮১৪ সালের ১৯ নং আইনের বলে সম্পত্তির অংশ ভাগের জন্যে আবেদন করেন। এর

বিরুদ্ধে রাজা বিশ্বনাথ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে জ্যেষ্ঠের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেন। কিন্তু আইনসংগত কালক্ষেপের ফলে সম্পত্তিতে হরসুন্দরীব দাবির অনুকূল সমর্থন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ালেও বিশ্বনাথের দাবির পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ছিল এবং ১৮৪৪ সালে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তথাপি তাঁর ভ্রাতৃবধূকে অধিকারচ্যুত করার ব্যাপারে তেমন সফল হননি। জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার সত্ত্বেও সদর আদালত পারিবারিক রীতির প্রতিকূলে ১৮৫৬ সালে ইন্দ্রমণির দত্তক পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তৌজির (১৩৬ নং) অধিকার দেন।

ততদিনে প্রাণকৃষ্ণ পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ১৮৬১ সালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দত্তকস্বত্ব অবৈধ প্রমাণিত করেন, এবং জগন্নাথের নিকটতম আত্মীয় হিসেবে তাঁর অংশ ফিবে পাওয়ার ব্যাপারে আদালতের রায় তাঁর অনুকূলে গিয়েছিল। হরসুন্দরী সম্পত্তি ভাগের জন্যে প্রিভি কৌন্সিলে যে আবেদন করেন তা ১৮৬২ সালে অগ্রাহ্য হয়। প্রাণকৃষ্ণ তাতে আশান্বিত হয়ে পারিবারিক প্রথার প্রশ্ন আবার আদালতে দায়ের করেন। আদালতে প্রধান আমিনের রায় তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৬৮ সালে প্রিভি কৌন্সিল সেই রায় বাতিল করে দেন। সুসংগ রাজপরিবারের মূল ১৬ আনা পরগণা থেকে এভাবেই হরসুন্দরী ৪ আনা, ১৩ গণ্ডা, ১ কড়া ও এক ক্রান্তি অংশ এবং তাঁর দুই কন্যা প্রাণদা ও বরদা প্রত্যেকে দুই আনা অংশ পান। রামচরণ মজুমদার চক্রান্ত করে রাজপরিবারের সম্পত্তি থেকে যে মৌরুসী স্বত্বগুলো বের করে নিয়েছিলেন সেগুলোও তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৪১ সালে কিছু গারো মহল নিয়ে সরকারের সংগে বিরোধ হয়; কিন্তু আসামের রাজস্ব কমিশনার রাজার স্বপক্ষেই তার মীমাংসা করেন।

প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র সীমানার প্রশ্ন নিয়ে আরও মামলা করেছিলেন। কিন্তু প্রিভি কৌন্সিল সে-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ১৮৬৯ সালে সরকার ২২ নং আইনের বলে গারো হিল অঞ্চলকে সব-আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন।[৮] সেই মামলায় রাজকৃষ্ণের জয় হয়। কিন্তু গারো পাহাড়ে তাঁর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ না হলেও বাধ্য হয়ে তাঁকে আজীবন 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি এবং ১,৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ এবং তাঁর ভাইদের দৃষ্টান্তে বর্তমান উত্তরপুরুষগণ প্রাচীন প্রথার প্রবর্তন করেন। তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। কিন্তু ১৮৯৬ সালে এক শরিক জগৎকৃষ্ণ আবার সম্পত্তির অংশ দাবি করেন। তাই চিহ্নিতরূপে কয়েকটি মৌজার ১৬ আনা মালিকানা স্বত্বে আপোষে তিনি পৃথক হন। অবশিষ্ট শরিকদের সম্মতিক্রমে যৌথ

স্টেটের পরিচালন ভার তখন থেকে একজন ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মামলার ফলে স্টেট দৈন্যদশায় পড়ে। রাজস্ব এবং কর যথাক্রমে ১১, ২৫০ ও ১০,৬৩৩ টাকা হলেও খাজনার পরিমাণ কিন্তু তিন লক্ষ টাকার বেশি ছিল না।

—ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার ১৯৩৭, পৃঃ ১৬৪-১৬৭

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়রের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দীর্ঘকালব্যাপী মামলায় পরিবারের আর্থিক সর্বনাশ ঘটেছিল। রাজপরিবারের সংহত ক্ষমতা ও সম্মান ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার ফলে বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উপর তার বহুকালের সক্রিয় প্রভাবও হ্রাস পাচ্ছিল।

ধূর্ত দেওয়ান রামচরণ মজুমদারের প্ররোচনায় দুজন রানী (বিশ্বনাথের দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূ) সুসঙ্গ ছেড়ে দূরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জামাতা, উকিল এবং দেওয়ান রামচরণের মাধ্যমে এভাবেই বাইরের প্রভাব সর্ব-প্রথমে রাজপরিবারে অনধিকার প্রবেশের সুযোগ পায়। অতএব এর প্রতিক্রিয়া যে শুধু রাজপরিবারের ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছিল তাই নয়, সুসঙ্গবাসীদের ক্ষেত্রেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল।

মহারাজা রাজসিংহ বেঁচে থাকতে থাকতেই সেই নিরবচ্ছিন্ন মামলার প্রকৃত চাপ তাঁর উপর এসে পড়ে। এই রাজপরিবারের দীর্ঘ ঐতিহ্য-গৌরব ক্রমে বেদনাদায়ক বিলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং আগামীকালের কর্মক্ষেত্রকে সফল করে তুলতে রাজসিংহকে সেই অবস্থার মধ্যেই প্রয়াসী হতে হয়। তবু মনে হয় মানুষ, প্রকৃতি, এমন কি দৈবশক্তির সম্মিলিত প্রভাবও বুঝি সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিপত্তি বিলোপ করার উদ্দেশ্যে জোট বেঁধে আঘাত হেনেছিল। রাজবংশের যে বিগ্রহকে সুসঙ্গবাসী তাঁদের রক্ষাকর্ত্রী বলে বিশ্বাস করতেন, এক রাত্রে তিনি অপহৃত হন। এবং সন্ন্যাসীদের উপদেশে বংশের প্রতিষ্ঠাতা যে অশোকবৃক্ষটিকে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন, সেটা ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এই অশোক গাছের জীবনের সঙ্গে রাজপরিবারের মঙ্গল যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এমন এক সংস্কার পরগণাবাসীদের মনেও দৃঢ়মূল হয়েছিল। সুতরাং দুটো ঘটনাই অশুভ ভবিষ্যতের সূচনা। এতে মহারাজা অত্যন্ত বিচলিত হন এবং সুসঙ্গবাসী জনসাধারণও দুটো ঘটনাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দেন।

এর কিছুকাল পরেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওয়ারিসী সূত্রে পাওয়া অনেক পারিবারিক দলিল এবং পুরানো অস্থাবর সম্পত্তি পুড়ে নষ্ট হয়। সেগুলোর মধ্যে হাতির দাঁতের সিংহাসন, পারিবারিক পালকি এবং পালঙ্ক উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু ক্রমান্বয়ে ব্যয়বহুল দীর্ঘ মামলার শেষে গারো পাহাড় ইংরেজ সরকারের অধীনে চলে যাওয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে যে আঘাত এসে পড়ে তাতে পরিবার

একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। এর পরিণাম পরবর্তীকালের প্রেক্ষাপটে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

সরকার এর পরে গারো পাহাড়ে হাতি খেদা বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, সুসঙ্গের সমতল অঞ্চলে মাঝে মাঝে যে হাতি ধরা হতো তাঁরা এক আইন প্রয়োগ করে সেক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করেন। পরতালা প্রথায় বড় বড় হাতি ধরার কলা কৌশলে সুসঙ্গের মাহুতরা সুদক্ষ ছিল। তাদের খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়েছিল। শোনা যায় মহীশুর রাজ্যের খেদা-কর্মকর্তা স্যান্ডারসন্ সাহেব খেদার কাজে সুসঙ্গ রাজার কাছ থেকে দুটো শিক্ষিত কুনকি (স্ত্রী) হাতি এবং গিদোরিয়া দাইদারকে (হাতি ধরার প্রধান সর্দার) নিয়ে গিয়েছিলেন।

মূল শাখার দুটো বংশতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। এতে সাম্প্রতিক কালে বিগত তিন পুরুষের শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠার কিছু আভাস আছে।

রাজা প্রাণকৃষ্ণের পরে দুই প্রধান উত্তরাধিকারীর জীবন কথা সবিস্তারে উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ এক সুযোগ্য শাসক ছিলেন। সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে গিয়েছেন। নূতন রীতি অনুসারে তাঁর পরবর্তী সব ভাই ইতিমধ্যে সুসঙ্গ স্টেটে মহারাজার সম-শরিক হন: কিন্তু তাঁরা মহারাজাকে নিজের নামেই স্টেট পরিচালনার ভার দেন।

নূতন পরিস্থিতির আবর্তে এমন এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে রাজকৃষ্ণকে স্টেটের আর্থিক পুনর্গঠনের দিকে আবার দৃষ্টি দিতে হয়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যে কাজের সূত্রপাত করেন সেটা হাজংদের মধ্যে 'টংক' প্রথা নামে পরিচিত ছিল। আগেই বলেছি যে গারো পাহাড়ে হাতি ধরা, শিকারে সাহায্য করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্যে পাহাড়তলি অঞ্চলে হাজংদের জমি দেওয়া হয়েছিল এবং তার কোন খাজনা দিতে হতো না। অপ্রত্যাশিত ভাবে গারো পাহাড় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় স্টেটের আর্থিক সঙ্গতির উপর গুরুতর চাপ পড়ে। তখন শুধুমাত্র জমির আয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই হাজংদের জমি থেকে কিছু ধান (টংক) দিতে বলা হয়। এই ব্যবস্থা হাজংরা মোটামুটি মেনে নেন এবং সে কাজ সুষ্ঠুভাবেই শুরু হয়।

হাজংরা নিয়মিত হারে টাকায় খাজনা দিয়ে সাধারণ প্রজার পর্যায়ভুক্ত হওয়া অপছন্দ করতেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে টাকার চেয়ে ধানের মূল্য তাঁরা ভালই বুঝতেন। তাই জমির ফসল থেকে বছরে কিছু ধান দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁদের বেশ মনঃপূতই হয়েছিল। সেসব জমি সুসঙ্গরাজের খাসমহল হিসেবে গণ্য ছিল। তাই সেগুলো বিক্রি করার অধিকার হাজংদের ছিল না। কিন্তু স্থলবর্তী ওয়ারিসকে রাজারা সাধারণত প্রথামতো স্বীকৃতি দিতেন। এই নিয়মের জন্যে হাজংদের জমি কখনও অবাঞ্ছিত শ্রেণীর লোকের দখলে যেত না। বিংশ শতকের

তৃতীয় দশকে প্রকৃত পক্ষে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ আইন প্রবর্তিত হয় : সে-উদ্দেশ্যে মৈমনসিংহের সমতল অঞ্চলগুলো আংশিক সংরক্ষিত এলাকাভুক্ত করে কার্যত যা হয়েছিল, তার চেয়ে সুসঙ্গরাজ প্রবর্তিত প্রথা আরও ফলপ্রসূ ভাবে তাদের স্বার্থরক্ষা করেছিল।

হাজং সম্প্রদায় প্রতিবেশী হিসেবে কিছু কিছু গারোর সঙ্গে মিলেমিশে বাস করলেও মুসলমান বা ভিন্ন সংস্কৃতির লোককে কিন্তু একেবারেই পছন্দ করতেন না। বস্তুতপক্ষে তাঁরা সমগোষ্ঠীভুক্ত পরিবেশেই বসবাস করতেন এবং সুসঙ্গ রাজারাও তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে রক্ষা করে চলতেন। মহারাজা রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর কলেজ প্রত্যাগত তরুণ মালিকগণ সম্পত্তি পরিচালনার ভার পান। মহারাজা কুমুদচন্দ্রের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু সেসব জমির খাজনা টাকায় রূপান্তর করাই শ্রেয় মনে করেন। সে ব্যবস্থায় হাজংরা ক্ষুব্ধ হন। সে-সুযোগে নেত্রকোনা এবং মৈমনসিংহের কিছু আইনজীবীর প্ররোচনায় তাঁরা অশান্তিও সৃষ্টি করেন। হাজংদের মধ্যে অনেকেই রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তার গুরুতর পরিণতিতে দু পক্ষের বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এটাই ১৮৯০ সালের হাজং বিদ্রোহ। তাৎকালিক স্থানীয় পরিবেশের উপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং সেই ফাটলের মধ্যে কীলক-সূচীমুখের আত্মপ্রকাশ এভাবেই ঘটে। রাজবংশের অদূরদর্শী তরুণ গোষ্ঠী যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন, আদিবাসীদের উপর প্রভুত্বলাভের আশায় মিশনারীরা স্পষ্টতই তাতে আরও ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে প্রথমে তাঁরা গিয়ে পড়েন উকিলদের খপ্পরে এবং পরে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও স্বার্থপর সমাজ-সেবীদের হাতে। এভাবেই অবশেষে তাঁরা কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত হন এবং পরিণামে সুদর্শন, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় এক চাষী উপজাতির সমাজ ভেঙে সর্বনাশের কবলে পড়ে।

রাজকৃষ্ণের বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মদ্যোমের মধ্যে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ডাক ও তার বিভাগ এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিজয়পুর, ফারংপাড়া ও গোপালপুরের টিলাগুলোতে চা বাগান এবং অন্যান্য টিলায় কমলা বাগানের প্রবর্তন করেন। গারো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সড়ক পথে মৈমনসিংহ শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনও তাঁর কাজ। তাঁর ছেলে ও ভাইপোদের সম্ভবপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে তিনি ১৮৮০ সালের কাছাকাছি কলকাতায় নিয়ে যান। তাঁর বড় ছেলে মহারাজা কুমুদচন্দ্র এবং এক ভাইপো প্রমোদচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত) স্নাতক হন। শুধু এঁদের নয়, তিনি পরগণার ভদ্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবারের উপযুক্ত যুবকদের নিয়ে আসেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁর নিজের পারিবারিক আশ্রয়ে থেকে সকলের সহপাঠীরূপে বর্তমান কালের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। বিভিন্ন শিল্পগত বিদ্যা শিক্ষার জন্যে সাধারণ পরিবার থেকেও কিছু

মানুষ এসেছিলেন। রবিনা ও কোকিলা নামে দুজন মুসলমান মেয়ে ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল যে, সেকালে নৌকো করে গোয়ালন্দে পৌঁছুতে প্রায় পনের দিন সময় লাগত। কলকাতা যাবার নিকটতম রেলস্টেশন ছিল গোয়ালন্দ। যাত্রাপথে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল, খরচও হতো অনেক। আমার পিতামহী ঠাকুরানীর কাছে সে কালের কলকাতা যাত্রা সম্বন্ধে বলার মতো নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেকথা বলার প্রলোভন থেকে আমাকে বিরত থাকতে হয়েছে।

রাজকৃষ্ণ জেলা বোর্ডের প্রথম সদস্য হন। স্থানীয় দাদনকারীদের পন্থায় তিনি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও শুরু করেছিলেন। পরে এ-প্রচেষ্টার উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর পিতা রাজা প্রাণসিংহ সুসঙ্গরাজ কর্তৃক চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব ক্রয়ের যে পরিকল্পনার সূচনা করেন, তিনি তার পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু রাজত্বের সার্থক শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। তাঁর তিন ভাইয়ের প্রত্যেকের জন্যে বিশেষ এক ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিকল্পনাও তিনি চালু করেছিলেন। অনেকের মতে তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছে; কারণ, তাঁর মৃত্যুর পর রাজত্বের যৌথ সম্পত্তির স্বার্থহানি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করা হয়।

ষাট বছর বয়সের আগেই রাজকৃষ্ণ হৃদরোগে দেহত্যাগ করেন। গারো পাহাড় হস্তচ্যুত হওয়া, সম্পত্তিতে বংশানুক্রম উত্তরাধিকার প্রথা বিলোপ, তার প্রতিক্রিয়া, অবশিষ্ট সম্পত্তি বিভাগযোগ্য হওয়া, এবং জ্যেষ্ঠানুক্রমিক রাজ্যের 'মহারাজা' উপাধি লাভ—পর পর এই সব দুরূহ ঘটনার গুরুভার নিয়েও তিনি সাহসের সঙ্গে তা বহন করলেও তাঁর জীবনশক্তি ক্রমে হ্রাস পায়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৪ সালে পুরুষানুক্রমিক মহারাজা উপাধি স্বীকার করেন এবং ১৮৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুমুদচন্দ্র কলকাতায় স্নাতকোত্তর এবং আইন পড়বার সময়ই মহারাজা হন। সুতরাং পাঠ্যজীবন অসমাপ্ত রেখেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ছন্দহীন এক জীবনধারার মধ্যে দাঁড়াতে হয়। বিভক্ত সম্পত্তির শরিক হিসেবে প্রথম থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সম্মানের উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হওয়া কত বিড়ম্বনা! তাঁর চেয়ে প্রবীণ বয়সের কাকারা তখনও জীবিত। সেক্ষেত্রে যৌথ এক পরিবারে যৌথ সম্পত্তির বংশানুক্রমিক মহারাজা হওয়ার ব্যাপারটাই ছিল সামঞ্জস্যহীন। তিনি ভেবেছেন এবং অনুভবও করেছেন যে পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণতম ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পিতা যেমন করে কাজ করেছেন, তাঁর পক্ষে তেমন করে চলা মোটেও সম্ভব ছিল না। উপরন্তু সেই পরিস্থিতির মধ্যে কোন বৃত্তিনির্ভর পথ গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহোক সেই জটিল পরিবেশ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন এবং জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার প্রথাও তাঁর জীবন রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে।

তাঁর এক ভাই আর দুজন কাকার তত্ত্বাবধানে একজন বেতনভোগী ম্যানেজার

নিয়োগ করার ব্যাপারে অন্যান্য শরিকদের তিনি সম্মত করিয়েছিলেন এবং এও ঠিক হয়েছিল যে মতানৈক্য হলে ম্যানেজার অন্য সব শরিকের মিলিত মতেই কাজ করবেন। ১৯৩৪ সালে সুসঙ্গের যৌথ স্টেট থেকে মহারাজার অংশ পরিচালনার দায়িত্ব 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর হাতে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সে ব্যবস্থাই কার্যকরী ছিল।

কুমুদচন্দ্রের উদ্যম প্রধানত সাহিত্যচর্চার শান্ত পরিবেশেই ব্যাপৃত ছিল। বিজ্ঞানে স্নাতক হলেও দর্শন, সংস্কৃত-সাহিত্য এবং ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। অন্যান্য বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক গুণের সঙ্গে তিনি ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাত্ত্বিক জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য অচিরেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। পশুপাখি প্রতিপালনে তাঁর বিশেষ শখ ছিল। পোষা প্রাণীর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল হাতি, গরু আর পাখি। তাঁর কাকা কমলকৃষ্ণ আর জগৎকৃষ্ণও ছিলেন বিদ্যা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে কুমুদচন্দ্র এঁদের সংসর্গে আসার ফলে কিছু বই আর হাতে লেখা 'কৌমুদী' নামে এক মাসিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে।

কুমুদচন্দ্রের চেষ্টায় সুসঙ্গে এক পৌরসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি তার সভাপতি হন এবং উন্নতিমূলক কিছু কাজও হয়। কিন্তু সেই সংস্থার অস্তিত্ব স্বল্পস্থায়ী হয়। কারণ, পারিবারিক মনোমালিন্যে সে উদ্যম পণ্ড হয়ে যায় এবং সূচনাতেই এই সাধু প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে। সুসঙ্গ রাজবংশে জ্যেষ্ঠানু-ক্রমিক উত্তরাধিকার প্রথা রহিত হওয়ার ফলে এই ভাঙনের গতিরোধ করতে পারত একমাত্র কোনও যৌথ সংস্থা। কুমুদচন্দ্র তাও উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু নবলব্ধ অধিকার উপভোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতাপ্রিয় শরিকদের বিরোধে তৎকালীন অবস্থা প্রশমনের সুচিন্তিত সেই প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

সুসঙ্গের প্রাচীন রাজবাড়ি ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে পুরোনো স্থাপত্য শিল্পের প্রায় সব চিহ্নই একসাথে মাটি চাপা পড়ে। কুমুদচন্দ্রের এক কাকা জগৎকৃষ্ণ আর তাঁর ছোট ছেলে নরেন্দ্রচন্দ্র সেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। পরবর্তী কালে এই পরিবারের বাসগৃহগুলো সেই পুরোনো রাজবাড়ির আদি ভিটাতেই গড়ে উঠে এবং ক্রমে সম্প্রসারিত হয়। জগৎকৃষ্ণের পরিবার একটু দূরে সরে যান, কিন্তু অন্য তিন শরিক পাশাপাশিই ছিলেন। তথাপি বলা যায় যে রাজপরিবার তখন থেকেই সুস্পষ্টরূপে চারটি পৃথক পরিবারে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পরিবারের বাসগৃহ-পুনর্বিন্যাসের কাজ যে অনেক সহজ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

পারিবারিক বাসগৃহ নির্মাণের জন্যে কমলকৃষ্ণ সুসঙ্গ রাজ্যের প্রাচীন প্রাসাদের ভিত্তিভূমি স্থানটিই বেছে নেন। এ-ব্যাপারে বড় তরফের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। কুমুদচন্দ্র নতুন ভাবে যে ব্যবস্থা করতে প্রয়াসী হন জগৎকৃষ্ণের উত্তরপুরুষগণ তা না মেনে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। নতুন বাসগৃহ

নির্মাণ এবং বিভিন্ন সাংগঠানিক কাজের প্রয়োজনে কুমুদচন্দ্র যে কয় বছর সুসঙ্গে ছিলেন, তার মধ্যেই মৈমনসিংহবাসী গুণী সমাজে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সারস্বত সমাজ, দুর্গাবাড়ি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংস্থা সমূহের শীর্ষস্থানে তিনি অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এমন কি ভারতের জাতীয়-কংগ্রেসের আদি সভাপতিদের অন্যতম নেতা এবং প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাঙ্গলার' শ্রী আনন্দ মোহন ঘোষ মহাশয়ও তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক অভিমতকে শ্রদ্ধা করতেন।

কার্জন যুগের পরে ব্রিটিশ ভারতে বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তাঁর বিচক্ষণ পরামর্শ অনুযায়ী জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৈমনসিংহ জেলাকে পৃথক তিন অংশে বিভক্ত করার পরিবর্তে বহু সড়ক পথের মাধ্যমে মহকুমা সদরগুলো পরস্পর সংযুক্ত করেন। এই আপোষ মীমাংসায় সরকার ও জনগণ উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হন।

তাঁর ছেলে ও ভাগনেদের শিক্ষা উপলক্ষে তিনি ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কলকাতাতেই ছিলেন। তখন কলকাতার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজ প্রতিষ্ঠান সমূহও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজ সংস্থার কাজ পরিচালনা করেন। পূর্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী এবং পুরুষানুক্রমে মহারাজা হিসাবে তিনি 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের' সভাপতি পদ পান। তাঁর গুণের সমাদরে সরকার তাঁকে 'স্ত্রীশিক্ষা সমিতি' এবং 'হিন্দু বর্ষপঞ্জি সংস্কার সমিতির' সদস্য করেন। তিনি সাহিত্য সভার সভাপতি এবং 'বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের' সদস্যও হন। একবার ভাইসরয়ের আইনসভায় তাঁকে মনোনীত সদস্য করার কথা হয়; কিন্তু তিনি সৌজন্যের সঙ্গে সেই পদ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কারণ, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯১১ সালে কালীঘাটে এক ব্রাহ্মণ সম্মিলনী হয়। সম্ভবত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পর সেবারই সর্বপ্রথম বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা আবার সম্যকরূপে পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে আট পঠির সমন্বয় সাধনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৬ সালে তিনি সুসঙ্গে আবার ফিরে আসেন এবং সে বছরই অক্টোবর মাসে রোগশয্যায় থেকেই জানতে পারেন যে, সুসঙ্গের খণ্ডিত যৌথ স্টেটের পুনর্বিভাজন আইনসম্মত হয়েছে। তাঁর পক্ষে সে আঘাত বড়ই মর্মান্তিক হয় এবং ১৬ই অক্টোবর সুসঙ্গেই মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

অতীত ধ্বংসাবশেষ থেকে এই পরিবার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ যা পেয়েছেন, তা হচ্ছে মহারাজা কুমুদচন্দ্রের জীবন। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছে তাই আজ আলোক-বর্তিকা হয়ে আছে। আমূল পরিবর্তিত নূতন এক

যুগে সুসঙ্গ রাজপরিবারের সম্মান বাঁচিয়ে রাখার মতো সাংস্কৃতিক সম্পদ তিনি রেখে গিয়েছেন।

সুসঙ্গ রাজপরিবারের পুরুষদের কথা মোটামুটি বলা হলো। এবার মহিলাদের কথা কিছু বলি। প্রাচীন নথিপত্রে সুবিখ্যাত রাজা রঘুনাথের মাতা কমলারানীকে বাদ দিলে অন্যান্য রানীদের কথা লিখিতভাবে কিছু পাওয়া যায় না। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র লোক সঙ্গীতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বস্তুত পক্ষে সুসঙ্গবাসী আজও তাঁর নাম অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রানী হচ্ছেন রাজা রণসিংহের মা। পুত্র থাকা সত্ত্বেও পিতা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেন। সে অবস্থায় এই পরিবারকে ধর্মান্তকরণের হাত থেকে রানীই বাঁচিয়েছেন।

এই দুজন ছাড়া অন্তঃপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে আর কোন মহিলার খ্যাতি প্রসারের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এর কারণ হয়ত জ্যেষ্ঠানুক্রমে পুরুষ সন্তান উত্তরাধিকারী হয়ে পরিবারের পরিচালন করতেন। প্রচলিত সাধারণ ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুযায়ী মেয়েদের স্থান ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে আর সহযোগী হিসাবে পুরুষদের অধিকার ছিল সর্বত্র[৭]। রাজপরিবারের মহিলাদের কর্মক্ষেত্র অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যতদূর জানি অন্তত আমার পূর্বের তিন পুরুষ ধরে এই পরিবারে স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার রীতি ছিল না। যদিও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্রভূমি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ থেকেই সাধারণত পরিবারের পুত্রবধূদের নির্বাচন করা হয়েছে, তবু মধ্যে মধ্যে বর্ধমান, শ্রীরামপুর কিংবা বারাণসীর মতো সুদূর অঞ্চল থেকে অখ্যাত হলেও বিশুদ্ধ বংশজাত বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় অথবা কাপ ব্রাহ্মণ পরিবারের সুদর্শনা কন্যাদেরও মনোনয়ন করে আনা হতো।

পরদানশীন অন্দরমহল চৌহদ্দির কঠোর নিয়ন্ত্রণে কর্মব্যস্ত থাকলেও পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কৃষ্টির অভাব ছিল অথবা সৃষ্টিশীল কাজে ব্যাপৃত না থেকে শুধু অবসর বিলাসে দিন কাটাতেন একথা মনে করা ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ছিল ঠিক তার বিপরীত। আজও পরিবার প্রধানদের সদা সতর্ক নিয়ন্ত্রণে অন্দরমহলের প্রাণবন্ত এবং কর্মমুখর এক ছবি চোখের সামনে ভেসে আসে।

প্রাক বিংশ শতকেও মাতৃভাষায় লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তাই বিদুষী না হলেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেকালের ছাপা বই পড়তেন। সেগুলোর মধ্যে 'পদ্মপুরাণ', 'পাঁচালী', 'মনসামঙ্গল', 'রাগমালা' ইত্যাদি বই তাঁদের খুব প্রিয় ছিল। তাছাড়াও ছাপা রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী, এবং সে যুগের কবি, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকদের রচনা আর দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাও তাঁরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন।

আমার সুচিন্তিত মত হচ্ছে যে, সেকালে অন্দরমহলের সেই পরিবেশ সহজে মানিয়ে নিয়ে তাঁরা তাঁদের সুস্থ জীবনে সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট ছাপ

রেখে গিয়েছেন। এমন মহিলাকেও দেখেছি যিনি জীবনের অর্ধেক কাল কঠোর আব্রুতার মধ্যে কাটিয়েও পরবর্তী কালের অবস্থান্তরে ও প্রয়োজনে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন[৮]।

টীকা

১। ১৯৩৯ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের পরিচালনায় ল্যান্ড এনকোয়ারি কমিশনার কর্তৃক প্রচারিত ৪নং প্রশ্নের উত্তরে রায়বাহাদুর কালীপদ মৈত্রের উত্তর থেকে সংগৃহীত।

২। এই সীমানা যে গারো পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট সবচেয়ে প্রাচীন সরকারী নথিপত্র দেখে তাঁর 'হিস্ট্রি অব আসাম' গ্রন্থে বলেছেন যে, গুণেশ্বর পাহাড় নামে গারো পাহাড়ের আর এক পরিচয় ছিল। প্রসঙ্গত এর উল্লেখ প্রয়োজন। সুসঙ্গ থেকে পাহাড়ের সবচেয়ে উন্নত যে শৃঙ্গ নজরে আসে আজও তার নাম গুণেশ্বর। গুণেশ্বর সোমেশ্বরের পুত্র। ইংরেজ সরকারের তৈরি গারো পাহাড়ের প্রাচীন মানচিত্রে গ্রাম, নদী এবং শৈল শৃঙ্গগুলোর নাম স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৬ সালের পর থেকে সেসব নাম গারো ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, সোমেশ্বরী—সিমসাং, গুণেশ্বর—ওয়াইমং, তপাখাল—দোবোখল ইত্যাদি। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

৩। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। গুধু গারোরা নয়, শক্তিশালী প্রতিবেশী ইশা খাঁর প্ররোচনাতেও সুসঙ্গের অধীন কিছু সামন্ত প্রধানও রাজার বিরুদ্ধে জোট বাঁধেন। ইশা খাঁ গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করে রঘুনাথের বৃদ্ধ পিতাকেও হত্যা করান। হত্যাকারীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ধানু। তার পিছু ধাওয়া করে সুসঙ্গের কাছে এক গ্রামে তার মাথা কেটে তিনি আংশিক প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সেই স্থান আজও ধানশিরা নামে পরিচিত।

৫। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া রাজা রঘুনাথের আরও কিছু কাহিনী রাজ পরিবারের অতি সুবিখ্যাত এই পুরুষ ও তাঁর সমসাময়িক কালের উপর কিছু আলোকপাত করবে।

"কোচ হাজু···ব্রহ্মপুত্রের কূলে। অপর রাজ্যটি কোচবিহার। দুই রাজ্যই আঞ্চলিক শাসকের অধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে কোচ হাজু রাজ্য পরীচ্ছিত (পরীক্ষিৎ) এবং কোচবিহার রাজ্য লক্ষ্মীনারায়ণ অর্থাৎ পরীক্ষিতের পিতামহ-ভ্রাতার শাসনে ছিল। সুসঙ্গের জমিদার রঘুনাথ তাঁর কাছে অভিযোগ করেন যে, পরীক্ষিৎ তাঁর পত্নীদের ও পুত্রদের উপর অত্যাচার করেছেন ও তাদের বলপূর্বক কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর অভিযোগ সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো। এই সময় লক্ষ্মীনারায়ণও বারবার সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির

কাছে তাঁর আনুগত্য জানায় এবং কোচ হাজু জয় করতে ইসলাম খাঁকে প্ররোচিত করেন। তদনুসারে সেই রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান।" (রামপ্রাণ গুপ্ত অনূদিত 'রিরাজ উস্-সানাতিন' থেকে)।

পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে মুঘল অভিযানে সহায়তা করে রাজা রঘুনাথ কিভাবে অপমানের শোধ নিয়েছেন সেকথা আমরা জানতে পারি মীর্জা নাথানের 'বাহার-ই-স্তান' থেকে।

ঢাকা মুাজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যে পত্র পেয়েছি তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"আপনি সম্ভবত ১৩২৭, ১৩২৮ ও ১৩২৯ সালের (বাংলা সাল) 'প্রবাসী'তে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় স্বাধীন জমিদারদের সম্বন্ধে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহোদয়ের প্রবন্ধগুলো পড়েছেন। 'বাহর-ই-স্তানের' উপর ভিত্তি করে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসও নিশ্চয়ই আপনার নজরে এসেছে।"

(২৭শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল : পত্র সংখ্যা ৯২৮)

আর এক পত্রে ডঃ ভট্টশালী মহাশয় উল্লেখ করেছেন (১৮১) ইসলাম খাঁ পরিচালিত অভিযানে প্রথম থেকেই রঘুনাথ তাঁর মিত্র ছিলেন। মুসা খাঁর বিরুদ্ধে ভাটি অভিযানে · কাটাসগড়ে···যাত্রাপুর দুর্গে···ডাকচেরায় (২৬৯)· · শ্রীপুরে···তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

(২৭৩) ইসলাম খাঁ এবং ভাটিমানের মধ্যে আবার মিত্রতা স্থাপনে সহায়তা (?)

(২৭৯) বিক্রমপুর নৌবাহিনী···শ্রীহট্টে উসমানের বিরুদ্ধে অভিযানে সহযাত্রী···।

(৭১২) কোচযুদ্ধ অভিযানে ··সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে মুক্রম খাঁর প্রধান সেনাপতি সৈকত কামালের সঙ্গে দুর্গ জয়। মুক্রমের সঙ্গে তিনি যোগ দেন 'টুকে' · পরীক্ষিতের সঙ্গে সন্ধি···শর্ত গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় আবার যুদ্ধ···পরীক্ষিতকে বন্দী করা···।

রঘুনাথের প্রথম যৌবনে আর একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা থেকে সে যুগের এক ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সুসঙ্গ থেকে কয়েক মাইল দূরে সোমেশ্বরীর অপর তটে কান্দাপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়িতে ছাত্রাবস্থায় রঘুনাথ গুরুগৃহবাসী হয়েছিলেন। সেকালে বাল্য এবং একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। তাই ছাত্রাবস্থাতেই রঘুনাথের বিয়ে হয়েছিল। গুরুগৃহে তাঁর শিক্ষালাভের বিষয়ের মধ্যে ছিল সাহিত্য, নীতি আর যুদ্ধ শাস্ত্র।

নিকটেই ব্যাঘ্রসঙ্কুল এক গভীর অরণ্য ছিল। একদিন সকালে একদল কাঠুরে একটা বাঘকে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় ভাবে শরবিদ্ধ অবস্থায় এক বটগাছে আটকে থাকতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। খবরটা রাজা জানকীনাথের কাছে পৌঁছতে দেরি হলো না। তিনিও ঘোষণা করলেন যে, এমন বীরত্বের কাজ

যে করেছে তাকে প্রকাশ্যে সম্মানিত করা হবে। খোঁজ খবর করতেই প্রকাশ পেল যে পূর্বরাত্রে রঘুনাথ সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদে তাঁর বালিকা বধূর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাবার পথে সামনা সামনি এক বাঘ দেখে তাকে তীরবিদ্ধ করেন। অবশ্য ভোর হবার আগেই সকলের অগোচরে তিনি গুরুগৃহে ফিরে আসেন। এও জানা গেল যে প্রবল বন্যাতেও মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা সোমেশ্বরী সাঁতরে পাড়ি দিয়ে তিনি তাঁর রূপসী পত্নীর সঙ্গে অভিসারে মিলিত হতেন। এভাবেই রঘুনাথ ক্রমে নিজেকে এক নির্ভীক সেনানায়ক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

দিল্লির সম্রাটের সংগে রাজা রঘুনাথের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কাহিনী হচ্ছে— মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি রাজা মানসিংহের সংগে রঘুনাথের দেখা হয় পূর্ববঙ্গে বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর তীরে। যশোরের প্রতাপাদিত্যকে বশে আনার উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাংগীর রাজা মানসিংহকে নিয়োগ করেন। প্রথম জয়ের পর মানসিংহ পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সেরে নদী তীরেই যে শ্রাদ্ধকার্যের অনুষ্ঠান করেন, সেখানে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করছিলেন। একটু দূর থেকে সেই অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে এক সময় রঘুনাথ হঠাৎ পুরোহিতকে বললেন. “আপনি অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।” হঠাৎ এমন দুঃসাহসিক ব্যাঘাতে মানসিংহ বিস্মিত হলেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর রাজোচিত দৃপ্ত চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, “মহারাজা! শ্রাদ্ধের কাজে শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ করে আমাকে সাহায্য করার যোগ্যতা আপনার আছে কি?” সৌজন্য দেখিয়ে রঘুনাথ বললেন, “মহামহিম! অনুমতি পেলে নিশ্চয়ই পারি। আমি ব্রাহ্মণ। আমার করণীয় কাজ আমি কেন করতে পারব না!” মানসিংহের অনুরোধে রঘুনাথ পুরোহিতের স্থান গ্রহণ করলেন এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শেষে অত্যন্ত তুষ্টচিত্তে মানসিংহ মুদ্রা মূল্যে যোগ্য দক্ষিণা দিতে চাইলেন। রঘুনাথ সৌজন্যের সংগে সেই দান গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, “মহামহিম! খুশি হয়ে যদি আমাকে কিছু দিতে চান তবে মহারাজা হিসেবে আমার সম্মান বজায় রাখতে অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন।” উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণকে ‘মহারাজ’ বলে সম্বোধন করার রীতি আছে। এই প্রসংগে সে-কথা মনে রাখা ভাল, মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে মানসিংহের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাই অজ্ঞাত পরিচয় এই ব্রাহ্মণকে তিনি ইংগিতে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর শিবিরে যেতে বললেন। ফলে দু জনের মধ্যে সখ্যতার বন্ধন ক্রমে স্থায়ী মিত্রতায় পরিণত হলো এবং রঘুনাথ দিল্লির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বশ্যতার নিদর্শনরূপে বছরে কিছু অগুরু কাঠ পাঠাতে সম্মত হন। আমরা শুনেছি যে রঘুনাথ মুঘল দরবারে সম্রাটের কাছে আমীরদের মতোই বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। তাঁর অধীনে পাঁচ হাজার শিক্ষিত এবং সশস্ত্র সৈন্য রাখার অধিকারও তিনি পেয়েছিলেন*। উপরন্তু তিনি ‘মুলক সুসংগের’ রাজা

* পঞ্চ হাজারী মনসবদার।

হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং সেই মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ 'গারো তাম্বে' (গারোদের শাসক) পদবীতে ভূষিত হন।*

যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় 'আরতি' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩১১) লিখেছেন যে রঘুনাথকে ইশা খাঁ বন্দী করেছিলেন। কিন্তু রঘুনাথের বিশ্বস্ত মুসলমান সৈন্য ও নৌকোর মাঝিরা রাতারাতি একটা খাল কেটে তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে সুসঙ্গে নিয়ে আসে। সেই খাল আজও রঘুখালি নামে পরিচিত।

আমাদের পারিবারিক দলিলগুলোর একটার মধ্যে উল্লেখ আছে যে সম্রাটের পুত্র সুবাদার শাহ সুজা একবার সুসঙ্গ পাহাড়ে খেদা দেখতে আসেন। সে-উপলক্ষে বাদশাহ্ ব্যক্তিগতভাবে এক পত্রে রামজীবনকে অনুরোধ করেন যে যতদিন শাহ সুজা সেখানে থাকবেন ততদিন তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যেন নজর রাখা হয়। রামজীবনকে খেদার কাজে সাহায্য করার জন্যে শাহ সুজার সঙ্গে এক হাজার অনুচরকেও তিনি পাঠান এবং খেদায় ধরা হাতির মধ্যে থেকে দরবারের জন্যে একশটা হাতি তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধও করেন।

আর একটা দলিলে দেখা যায় যে, সুবাদার রামসিংহের বিরুদ্ধে প্রায় একশ অভিযোগ আনেন। সেগুলোর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধান। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সম্ভ্রান্ত এক মুসলমান পরিবারের কন্যা বিবাহ করায় সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আওরঙ্গজীবের মতো এক খেয়ালী সম্রাটও যেখানে একজন মুসলমানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারতেন, সেখানে এক হিন্দু রাজাকে ওয়ারিস করে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শাসননীতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন রাজপুত, মারাঠা আর শিখগণ ক্রমান্বয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই রণসিংহ সুসঙ্গ দুর্গের অধীশ্বর হন। তাই আওরঙ্গজীবের উপর ইতিমধ্যেই যে চাপ পড়েছিল রণসিংহকে রাজ্যচ্যুত করে তিনি সেটা আর বাড়াতে চাননি।**

'মৈমনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ইতিহাসে' উল্লেখ আছে যে, রামসিংহ মুসলমান স্ত্রী নিয়ে সুসঙ্গে ফিরে এলে তাঁর হিন্দু রানী নিরাপত্তার জন্যে পুত্র রণসিংহকে নিয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী সেরপুর জমিদারদের আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁরাও বদান্যতার সঙ্গে সেরপুর অঞ্চলের এক অংশকে সুসঙ্গ পরগণা নাম দিয়ে অতিথিদের আশ্রয় দেন। দুই পরিবারের মধ্যে সেই সৌহার্দ্য আজও বজায় আছে। সেকালে কোন হিন্দু জমিদারের পক্ষে মুঘল সম্রাটের বিরাগভাজন আর এক রাজ্যের হিন্দু রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল।

* লেপব্রিজের "গোল্ডেন বুক অব ইণ্ডিয়া" দ্রষ্টব্য।

** সুসঙ্গ পরগণার মজুমদারের বংশাবলী ইতিহাস।

'সুসংগ পরগণার মজুমদার বংশাবলী' ইতিহাসে আছে যে রাজবংশের মর্যাদা এবং পূর্বপুরুষদের দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে দেওয়ান রাজাকে প্রাসাদ ছেড়ে দূরে গিয়ে বাস করতে অনুরোধ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে রাজাও সে প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চিরজীবনের মতো রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। কেউ বলেন তিনি মুর্শিদাবাদবাসী হয়েছিলেন, আবার কেউ দাবি করেন যে ডিহি মহাদেও অঞ্চলে সাধারণ এক দুর্গ তৈরি করিয়ে তিনি সেখানেই বাস করেছেন। পূর্বেকার দুর্গ যেখানে ছিল ১৯২৬ সালে বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে একবার সেখানে বনাকীর্ণ এক জায়গায় হাতি দিয়ে জংগল ভেঙে শিকারের চেষ্টা করে আমি একজোড়া বড় ডোরাদার বাঘ দেখেছিলাম।

রাজা কিশোর এবং রাজা রাজসিংহ দুজনই ছিলেন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁরা উচ্চমানের পদ্য সাহিত্যও রচনা করেছেন। বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারকে তিনি চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব দিয়ে সুসংগে বসবাস করিয়েছিলেন। রেজা খাঁ বিধিবহির্ভূত ভাবে সুসংগ রাজ্যকে সাধারণ জমিদারের পর্যায়ভুক্ত করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন এবং রাজ্যের দুটো পরগণা দখল করে নেন।

৬। সুসংগ রাজাকে গারো পাহাড় থেকে অধিকারচ্যুত করার পদ্ধতিতে অবিচার এতই প্রকট ছিল যে অবসরপ্রাপ্ত এক ইংরেজ সিবিলিয়নও তার নিন্দা করেছেন। উইলিয়ম টেলর (অবসরপ্রাপ্ত বেংগল সিভিল সার্ভিসের লোক—পরবর্তীকালে আই. সি. এস এর সমতুল্য) সাহেবের 'জাস্টিস ইন এক্সসেলসিস' (প্রকাশক : ওয়াটার্লু এণ্ড সন্স, ৪৯ পার্লামেন্ট স্ট্রিট, এস, ডব্লু) পুস্তিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"আমি এখানে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। ঘটনা হিসেবে পুরো-মাত্রায় এর বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও নীতি লংঘনের দিক দিয়ে শেষোক্ত ঘটনা থেকেও এটা জঘন্য। কারণ, তার পরিণামে প্রতারিত ব্যক্তির পদমর্যাদা বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে না হলেও সে-আঘাত সম্পত্তির উপর এসে পড়েছে। তা ছাড়াও এর কার্য পরিচালন পদ্ধতিও অস্বাভাবিক।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে মৈমনসিংহের কাছে এক রাজার সুসংগ নামে বেশ বড় জমিদারী আছে। তার অনেকখানি আবার গারো পাহাড়ের মধ্যে। কিছুকাল পূর্বে সরকার জরিপ বিভাগের লোকজন সেখানে পাঠান। সরকারের ইচ্ছামতো রাজার জমিদারি থেকে যতখানি জায়গা পৃথক করে দেখানো প্রয়োজন তাঁরা সেভাবেই সীমানা চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁরা রাজাকে এভাবেই অধিকার চ্যুত করেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, তাঁরা পাহাড় অঞ্চলের বৃহৎ অংশ নিজেদের দখলে আনেন।

রাজা…সরকারের স্বার্থ-প্রণোদিত এই জরিপের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে আবেদন করেন। পৃথক তিনটি ট্রাইবুনালে এই মামলা হয় এবং প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই (শেষেরটা ছিল কলকাতা হাইকোর্টের মিলিত বিচার

সভা) রাজার স্বপক্ষে যায়। ফলে সরকারী জরিপের কাজ বাতিল হয় এবং সমগ্র অঞ্চলেই সুসঙ্গ রাজার অধিকার স্বীকৃতি পায়।

শেষোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকার প্রিভি কৌন্সিলে আবেদন করেন। কিন্তু উক্ত বিচার-সালিসি-সভায় মামলা যাওয়ার আগেই তাঁরা এক আইন পাশ করিয়ে তাঁদের নিজস্ব আদালতের রায় বাতিল করে, যে অঞ্চল কোর্টের সিদ্ধান্তে রাজাকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা সরকারের অধিকারভুক্ত করা হয়। ...স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁদের যে চূড়ান্ত ধারণা আছে এই ঘটনা কি তার সমকক্ষ নয় অথবা তাকেও কি ছাপিয়ে যায়নি!

সত্য গোপন না করে আমি বলতে চাই যে, নীতিবিরুদ্ধ এমন কাজের জন্যে একটা সংগত যুক্তি দেখাতে হলে সরকারের পক্ষে এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। এমন কি অযৌক্তিক ভাবে ন্যায়নীতির আদর্শ লঙ্ঘন করার মতো নির্লজ্জতা ভারত সরকারেরও নেই। সুসঙ্গ রাজার অধীনে কিছু বন্য, বিবস্ত্র এবং হিংস্র-স্বভাবের আদিম মানুষ আছে। এটাই তাঁর দুর্ভাগ্য। বেশ কয়েক বছর আগে এদের বৈশিষ্ট্যমূলক একক নমুনা আমি দেখেছি এবং এঁকেছি। তারা মাঝে মাঝে সভ্য প্রতিবেশীদের উপর চড়াও হয়ে কিছু মানুষের মাথা কেটে নিয়ে অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে অরণ্যে ফিরে যায় এবং সেই নরমুণ্ডগুলোকে উপলক্ষ করে মস্ত উৎসব করে। মাঝে মাঝেই এ ধরনের নরমুণ্ড শিকার নিঃসন্দেহে অপ্রীতিকর। প্রকৃত পক্ষে এতে ব্রিটিশ সরকারের অখ্যাতি হয়। কারণ, শিরচ্ছেদের অস্ত্রাঘাত থেকে প্রজার মাথা বাঁচানোই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত; কিন্তু এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ বাহিনী পাঠানোর সুবিধে না থাকায় সরকার আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এই অজুহাতকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই তাঁদের আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যে ভাবে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন তার কথাই আমি বলেছি। অন্তত শোভনতার খাতিরেও তাঁরা এ কাজ প্রতিরোধ করতে পারতেন। বিধিবহির্ভূত এই কাজের অজুহাতে তাঁরা চতুর অথচ রাজভক্ত ব্যক্তিবিশেষকে উৎকণ্ঠাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ দীর্ঘকালের এক মামলায় জড়িয়ে শাস্তি দিয়েছেন। অবশেষে তাঁদের নিজেদের স্বাধীন বিচারালয়ে ন্যায় বিচারে তাঁরা যখন পরাজয় স্বীকার করতে যাচ্ছেন, তখন প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে প্রয়োজন মতো আইনের আশ্রয় নেন।

উনিশ শতকে ইংরেজের ন্যায়নীতি এই ধরনের ছিল—সেকথা আমি আবার বলছি। বর্বর যুগে বর্বরদের রীতিনীতি থেকে একে কোনও অংশে স্বতন্ত্র বলা চলে কি? অথবা 'নাবোথের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আহবের দুষ্কর্মের' সঙ্গে তুলনীয় এই ঘটনাকে কেমন করে পৃথক করা যায়?

অতএব আমরা দেখছি যে, সম্পত্তি বিভাজনের অনুকূলে ঘোষণা জারি করে সেখান থেকে এক বৃহৎ অংশ আত্মসাৎ করা হয়েছে। পরিবর্তে পরিবার প্রধানকে বৈশিষ্ট্যসূচক অতি উচ্চ সম্মানের পুরুষানুক্রমিক 'মহারাজা' উপাধি

দেওয়া হয়েছে। প্রিভি কৌন্সিলের সদস্যগণ একেই এক 'অস্বাভাবিক আইন বলে মন্তব্য করেছেন। এ কাজ মুঘলদের অনুসৃত রীতির ঠিক বিপরীত। কারণ, সেকালে দেওয়া যে কোন অতিরিক্ত উপাধির সঙ্গে মর্যাদার পরিপোষক জায়গির প্রদান করা হতো। এর কারণ হয়ত মুঘলরা ভারতকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন আর ইংরাজগণ ভারত শাসন করেছেন ইংল্যান্ড থেকে।

যা হোক এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে সুসঙ্গরাজা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন। সম্পত্তির প্রধান উৎস 'গারো হিল' থেকে তাঁর অধিকারচ্যুতি এবং পরিবারে প্রচলিত জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার প্রথা লোপ করা—তাঁদের এই দুইটি কাজই বংশের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে ভূম্যধিকারীগণকে সর্বোচ্চ যে সম্মান দেওয়া হতো, সুসঙ্গের মহারাজা পুরুষানুক্রমিক প্রথায় সে উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করলেও, সে মর্যাদা রক্ষার উপায় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় একথা বলা চলে ভারতীয়দের খেতাব প্রদান সম্বন্ধে তাঁদের নীতি চূড়ান্তভাবে শূন্যগর্ভ না হলেও এতে চরম উপেক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে।"

৭। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বরের আমল থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত এই পরিবারে কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়নি। বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারদের মধ্যে এটা এক বিরল ঘটনা।

৮। ঊনবিংশ শতকে সুসঙ্গের মতো অনগ্রসর অঞ্চলে সুপ্রাচীন এবং অতি সংরক্ষণশীল এক পরিবারের কুলবধূ হয়েও রাজা প্রমোদচন্দ্র সিংহের রানী সুরমা দেবী পরগণায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিলেন। সুসঙ্গে এবং পূর্ব মৈমনসিংহের কিছু বিশিষ্ট রক্ষণশীল পরিবারেও সেকালে তাঁর প্রভাব পড়েছিল। প্রসঙ্গত, রানী সুরমা দেবী ছিলেন শ্রীরামপুরের নব লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মৃতিচারণ : 'আদি'

অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সব ঘটনাগুলো স্থান ও কালের ক্রমানুযায়ী যথাযথ ভাবে আজ আবার বিন্যস্ত করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। যে পৃথিবীতে আমি দিনের আলো প্রথম দেখেছি এবং পরে বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে ক্রমে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিপুষ্ট হয়েছে, সেখানে আমার স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ আর বিপৎসঙ্কুল অভিযানের কথা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বলেছি।

পারিবারিক নথি থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৮ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা সুসঙ্গে আমার জন্ম। শৈশবের ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে জেনেছি আমার জন্মের এক বছর তিন মাস আগে ১৮৯৭ সালে ১২ই জুনের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা, যাতে পুরোনো সুসঙ্গের রূপটাই মাটি চাপা পড়ে গিয়েছে। সুপ্রাচীন এক প্রতিষ্ঠান কেমন করে এত তাড়াতাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল. আমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত সে-দৃশ্যই আমাকে দেখতে হয়েছে এবং ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পই নাটকীয় ভাবে তার গোড়াপত্তন করে গিয়েছে। স্মৃতিকথার পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেটা আরও স্পষ্ট হবে।

আমার স্মৃতির আদিতম ছবি হচ্ছে অন্দরমহল প্রাঙ্গন। সেটা মহিলাদের কর্মক্ষেত্র। সেখানে ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালখুঁটির উপর পোক্ত বাঁশের কাঠামোর মাথায় খড়ে ছাওয়া চার-চারটে বড় বড় পুবমুখো 'আটচালা' ঘর। প্রত্যেকটাতে ছিল মস্ত এক 'হল ঘর'। তার চারধারে ছিল আড়াল দেয়া চওড়া বারান্দা আর পশ্চিম প্রান্তে আরও দুটো ঘর—একটা স্নান ও শৌচাগার, আর একটা নানা কাজের। হলঘরগুলোতে কোন দরজা বা জানালা ছিল না। কাঠের ফ্রেম থেকে শুধু পুরু পুরু পরদা ঝুলত। দিনে সেগুলো সাধারণত গুটিয়ে রাখা হতো। যতদূর মনে পড়ে সেই আটচালাগুলোর সব উপকরণই ছিল স্থানীয়, এমনকি কব্জা, ছিটকিনিগুলোও কাঠ, বাঁশ, বেত প্রায় সবকিছুই সংগৃহীত হতো গারো পাহাড় থেকে।

একটা লম্বা মই প্রত্যেক ঘরের পিছন দিকে ঠেকানো থাকত। কারণ, কখনও কখনও প্রবল ঝড়ে চালে ছাওয়া পুরু খড় এলোমেলো হয়ে যেত। তখন

ঘরামী নামে বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মী মই বেয়ে চালে উঠে খুব চটপট সেগুলো সারিয়ে ফেলত। তাদের মধ্যে একজন যখন চালের উপর কাজ করত, তখন তার অন্য দুজন সঙ্গী তাকে খড় আর বেত এগিয়ে দিত। ঝড় হলেই, দিনে বা রাতে, এরা সব সময়ই আসত। গ্রীষ্মকালে কখনও আগুন লাগলে এদের একজন মাটির কলসী ভর্তি জল নিয়ে উপরে চলে যেত আর দুজন লোক জলভরা কলসী নিয়ে মইয়ের নীচে অপেক্ষা করত। তাদের সেই আশ্চর্য কাজ দেখে আমরা খুব আমোদ পেতাম। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময় জাগতো যখন বাড়ির ঝি-রা খুব তাড়াহুড়ো করে সমস্ত খাবার জিনিস সরিয়ে নিয়ে যেত ; কারণ. ঘরামীরা অস্পৃশ্য, চালে উঠলে সব খাবার অপবিত্র হয়ে যেত।

গ্রীষ্মের প্রবল খরায় প্রায়ই আগুন লাগত, বিশেষ করে গ্রামের খড়গাদায়, আর সেটা ছড়িয়ে পড়ত কুটির থেকে কুটিরে। সেই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে গ্রামের মানুষ অসহায়ের মতো দিশেহারা হয়ে চেঁচামেচি করে ছুটোছুটি করত। আমাদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আকর্ষণীয় দাবাগ্নিও দেখা যেত। সেগুলো 'ঝুম' চাষের জন্যে বনের মধ্যে কাটা গাছপালায় ধরিয়ে দেওয়া আগুন। ছেলেবেলায় আমরা ভাবতাম যে মর্ত্যবাসীদের পক্ষে সে-স্থান অগম্য ; কারণ পরীরা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমরা শুনেছিলাম যে. যারা নিষ্পাপ তারাই শুধু সেই পরীদের দেখতে পায়।

অন্দরমহল আঙ্গিনায় ঘরদোরগুলো যেভাবে ছিল সেকথা বলছি। দক্ষিণ পাশে মাঝারি আকারের একটা টিনের ঘরে থাকতেন বাবার স্নেহের এক বোন. আমার পিসীমা। অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় তিনি স্বামী হারিয়েছিলেন। কাজেই তিনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে স্থায়ীভাবেই ছিলেন। ছেলে মেয়েরা সকলেই তাঁর উৎসাহ পেয়েছে। কর্তাব্যক্তিরা বিরূপ হলে শাস্তির ভয়ে তারা পিসীমার স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় খুঁজত। ছেলেমেয়ে সবাই, এমন কি যুক্ত পরিবারের ছেলেরাও, প্রায় জন কুড়ি, সেখানে যেত 'টুবা' বা সকালের খাবার খেতে।

এই ঘর বরাবর প্রায় একশ গজ পশ্চিমে ছিল পুবমুখো এক 'আঁতুর' বা 'সূতিকা ঘর'। অন্য সব ঘর থেকে সেটা দূরেই ছিল। কারণ, সন্তান প্রসবের পরে মা আর শিশুকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অশৌচ পালন করে সেখানে থাকতে হতো। এমন কি আমরা ছোট ছেলে হলেও নবাগত সেই শিশুকে দেখার জন্যে আঁতুর ঘরে ঢুকতে পারতাম না। শাস্ত্রমতে আমরা তাহলে অশুচি হতাম এবং শুচি হওয়ার জন্যে আমাদের স্নান করতে হতো।

পিসীমার ঘরের পূর্বদিকে আরও দুটো টিনের ঘর ছিল। সে-দুটোর মধ্যে একটা ছিল খাদ্যসামগ্রী রাখার 'ভাঁড়ার ঘর' আর একটা ছিল 'হবিষ্য' বা পরিবারের বিধবা মহিলাদের পুজো এবং রান্না-খাওয়ার ঘর। কারণ, সকলের জন্যে রান্নাঘরে তৈরি খাবার তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। রান্না করা খাবার তাঁরা দিনে

একবারই শুধু খেতেন। তাঁরা নিজের খাবার নিজেই রাঁধতেন অথবা পরিবারের বয়স্কা পুত্রবতী কোন মহিলাও রেঁধে দিতেন। তাঁরা এবং পরিবারের বয়স্কা সধবাগণ বিশেষ বিশেষ পর্বের দিন নিরম্বু উপবাসী থাকতেন। এই ঘরটার আকর্ষণ আমাদের কাছে একটু বেশীরকমই ছিল; কারণ. সেখানে আমরা বাছাই করা সুস্বাদু ফল বা দুধের তৈরি মুখরোচক খাবার পেতাম।

ছোট সেই টিনের ঘর দুটোর পশ্চিমে, বেড়া ঘেরা পৃথক চত্বরে, বেশ বড় আর লম্বা ধরনের একটা ঘরে সকলের রান্না হতো। তার কাছাকাছি চত্বর সীমা সংলগ্ন ছোট একটা টিনের 'ঢেঁকি ঘর' ছিল। নিম্নবর্ণের পরিচারিকারা সেখানে ধান ভানা, সরষে গুঁড়ো করা ইত্যাদি কাজ করত। চিঁড়ে আর কিছু কিছু শস্যের বেসন কিন্তু শূদ্র পরিচারিকারাই তৈরি করত। পালপার্বণে প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের গুঁড়ো তৈরি করতেন নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ মহিলা বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ারা। পরিবারের মেয়েদের কাছেও ঢেঁকিঘরের টান বড় বেশী ছিল।

ঢেঁকিঘরের ঠিক পূবেই ছিল মধ্যমবাড়ির[১] অন্দরমহল পথের দরজা। আমার বাবার বড়কাকা রাজা কমলকৃষ্ণের চৌহদ্দি ছিল সেটাই।

অন্দরমহল এলাকাটা প্রায় দশ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। বাবার আর এক কাকা শিবকৃষ্ণের পারিবারিক অন্দরমহল 'নয়া বাড়ি' যাবার পথটা ছিল উত্তর দিকে।

অন্দরমহলের পিছনদিকে অনতিদূরেই বড় একটা স্নানের পুকুর ছিল। পুকুরের দক্ষিণ পারে ছিল দুটো টিনের চালাঘর। একটা বেশ বড়, আর একটা কিছু ছোট। বড় চালাঘরটা আবার দুটো কোঠায় ভাগ করা ছিল। একটাতে বাড়ির রাঁধুনে বামুনেরা থাকত, আর একটাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত ধর্মবিহিত ক্রিয়াকর্ম হতো। এখানে কোন পুজো বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হলে দাসীরা আমাদের অন্তঃপুরের বাইরে নিয়ে আসত। সাধারণ গৃহস্থ বধূদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুকুরে স্নান করা দেখে আমাদের কি আনন্দই না হতো!

বড়, মধ্যম আর নয়া প্রত্যেক বাড়ির পিছনে পাহারাদারদের জন্যে একটা করে ছোট ঘর ছিল। তারা দিনরাত পালা বদল করে হাজির থাকত।

অন্দরমহল চত্বরের পূবসীমায় বেশ লম্বা টিনের দেয়াল ঘেরা একটা গুদাম ঘর ছিল। তার কাছেই একটা ঘরে নানা জাতের পায়রার সঙ্গে 'উড়ন' পায়রার দলও থাকত। গুদাম ঘরের পশ্চিম-বারান্দা আর অন্দরমহল চত্বর সীমার মাঝামাঝি জায়গাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। সেটাই প্রকৃতপক্ষে অন্দরমহল ও বাহির বাড়ির মধ্যবর্তী এলাকা।

সেই এলাকার পারে অন্তঃপুর ও বাহির বাড়ি প্রাঙ্গনে মাঝারি আয়তনের পূবমুখো একটা টিনের ঘর ছিল বড়বাড়ির বৈঠকখানা অর্থাৎ মহারাজার অভ্যাগত অভ্যর্থনা গৃহ। প্রথম দিকে এই ঘরের দেয়াল ছিল 'ইঁকড়' বা বাঁশের তৈরি। ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে সুসঙ্গের মহারাজা তাঁর সামাজিক

প্রতিষ্ঠার তুলনায় একেবারে আড়ম্বরশূন্য এক বৈঠকখানা বজায় রাখতে যে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথা বলা বাহুল্য।

বাইরের প্রাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ঘরের মধ্যে ছিল টিনে ছাওয়া মস্ত সেরেস্তা আর স্কুল বাড়ি। কাছারি বাড়ির পূব-দক্ষিণে ছিল বাগান। সেখানে কলকাতা থেকে আনা নানা জাতের দেশী বিদেশী ফুলের গাছ দেখা যেত।

মধ্যমবাড়ির দক্ষিণ সীমার বাইরে ছিল পরিবারের দেবালয় বা 'মায়ের বাড়ি'। মধ্যমবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সেখানেই ছিল সাবেক রাজপ্রাসাদের ভিত্তি।

যৌথ স্টেটের 'খালসা' কাছারিবাড়ির দপ্তরগুলো ছিল দেবালয় চত্বরের পূবে। দেবালয়ের দক্ষিণে খোলা ময়দান আর পশ্চিমে যে পুকুর তার নাম 'মিঠা পুষ্করিণী।' মিঠা পুষ্করিণীর পূবে ছিল পিলখানা দারোগা বা হাতিদের ইন্সপেক্টরের বাসাবাড়ি। আরও দক্ষিণে ছিল বাজার। পূবদিকের প্রকাণ্ড দিঘিটার নাম ছিল 'বড় দিঘি'। বড়দিঘির পূবদিক বরাবর সড়কটা গিয়েছিল দুআনী বাড়ি অর্থাৎ জগৎকৃষ্ণের চৌহদ্দি পর্যন্ত।

পরস্পর-সংলগ্ন অন্য তিনটে রাজবাড়ির চেয়ে দুআনী বাড়ি তার পৃথক দেবালয়, কাছারি, কর্মচারী আর দাসদাসীদের ঘরদোর নিয়ে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ-রূপে বেশ দূরেই ছিল।

অন্দরমহলের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তার একটা ছবি দিচ্ছি।

ছেলের জন্মের সাত মাস আর মেয়ের জন্মের পাঁচ মাস পর্যন্ত অন্নপ্রাশনের আগে সাধারণত তাদের অন্তঃপুরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল না। আমি অতি শৈশবে দেখেছি যে, প্রবীণ বয়স্ক কোন ব্যক্তি, পরিবারের কেউ হলেও, সঙ্গের ভৃত্য সোচ্চারে তাঁর আগমন বার্তা না জানালে তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করতেন না। এই ঘোষণা শুনেই পরিবারের কোন কোন মহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে, শাড়ির আঁচল নীচু করে টেনে ধরে দ্রুত পায়ে আপন ঘরের নিরালা খুঁজে নিতেন। আমরা পরে বুঝেছি যে কোন কোন আত্মীয়ের বেলায় ব্যতিক্রম থাকলেও সকলের সামনে তাঁরা সহজে যেতে পারতেন না। পরিবারের মেয়েরা বিয়ের পরে ঘোমটা ছাড়াই অন্তঃপুরে থাকতেন। শাশুড়ি বা স্বামীর বড় বোন ধারে কাছে না থাকলে বাড়ির বধূরাও সেভাবেই থাকতেন। দেবরদের সামনে তাঁরা সাধারণত সহজভাবেই থাকতেন কিন্তু ভাশুরদের বেলায় তা চলত না। ছোট ভাই বৌয়ের কোন কথা বড় ভাই শুনে ফেললে খুবই লজ্জার ব্যাপার হতো। ভাশুরদের মতো ছোট ভাই বৌ তাঁর স্বামীর ভগ্নীপতিদের সঙ্গেও দেখা করতে পারতেন না।

অন্দরমহলের জীবনযাত্রা যথেষ্ট কর্মব্যস্ত ছিল। বাড়ির প্রবীণা মহিলারা গৃহস্থালীর নানা কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন। হয়ত এক-এক দল পরিচারিকা নিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করছেন, তাদের স্নান করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, মাছ, মাংস, তরকারি কাটা পরিদর্শন করছেন, রান্না আর পরিবেশন দেখছেন,

খাদ্যসামগ্রী ভাঁড়ারে তোলাচ্ছেন, আচার, চাটনি, সন্দেশ ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করছেন, সেলাই করছেন, উলের আসন, সোয়েটার বানাচ্ছেন আর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজ তক্‌লিতে পৈতের সুতো কেটে 'নগুন' তৈরি করছেন।

মধ্যাহ্নের আহার শেষ হলে প্রবীণারা স্বভাবতই একটু বিশ্রাম নিয়ে কোন বাংলা বইয়ে মনোনিবেশ করতেন। সেসব বইয়ের ছবি দেখে আমরাও খুব আনন্দ পেতাম। পরে আমি যখন বুঝতে শিখেছি তখন দেখেছি মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অথবা সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপন্যাস, কাব্য কিংবা প্রবন্ধ পড়তেন। ছেলেবেলায় হাসিখুশি, খুকুমণির ছড়া, শিশুশিক্ষা ও বোধোদয় আমাদের খুব প্রিয় ছিল। রজনীকান্ত গুপ্তের রাজপুত বীরত্ব কাহিনী পড়তে পড়তে আমরা যেন শৌর্যময় অতিপ্রাকৃত এক রাজ্যে চলে যেতাম!

বাড়ির সমবয়সী মেয়েরা বিশ্রামের সময় দলে ভাগ হয়ে কেউ পড়তেন, কেউ কেউ তাস বা সে জাতীয় কোন খেলা খেলতেন, আবার গল্পগুজব নিয়েও কেউ কেউ সময় কাটাতেন। ছোটরা লুকোচুরি খেলার ফাঁকে ফাঁকে গাছ থেকে পাকা ফল পেড়ে খাওযাব সুযোগ খুঁজত। কারণ, অন্দরমহল চত্বরেই নানা জাতের গাছ ছিল।

প্রতিদিনের কর্মমুখর এই ছবি ছেলেবেলায় আমাদের কেমন লাগত এবার সে কথা বলছি। ভোব হতে না হতেই ঝাড়ুদার, মালী বা তাদের সর্দার খোঁড়া মতি মণ্ডলেব অবিরাম বকবকানির সঙ্গে ঝাঁটার আওয়াজে আমাদেব ঘুম ভেঙে যেত। ঝাঁটার একঘেয়ে সেই খস্‌রর খস্‌রর আওয়াজের পরেই শুনতে পেতাম গোবর জল ছিটানোর শব্দ।

অন্য মালীদের খবরদারি করার মাঝে মাঝে মতি মণ্ডলের বকবকানি থেমে গেলে ঝি 'ছেরার বৌ' এসে দরজা খুলে দিত। বাবা তখন বাহির বাড়িতে চলে গেলে সব পরদাও গুটিয়ে ফেলা হতো। এর মধ্যেই আমাদের প্রাতঃকৃত্যের গরম জল তৈরি করে রেখে 'ছেরার বৌ' ছুটি নিত। মায়ের তত্ত্বাবধানে আর-এক দল পরিচারিকার সাহায্যে আমাদের মুখধোওয়া ইত্যাদি সারা হলে আমরা পেতাম এক পেয়ালা করে গরম দুধ। ভোর হওয়ার আগেই কন্তা গারো দুধ নিয়ে আসত আর উঁচু স্বরে ভাঙা ভাঙা বাংলায় নিজের আগমন বার্তা জানিয়ে সে বলত, "কন্তা দুধ নিয়ে আসছে, 'রানীরা' ঘরে চলে যান।" কন্তার আগমনের সঙ্গেই দিনের কাজ শুরু করার সংকেত পাওয়া যেত।

আটচালা ঘরে কে কোথায় থাকতেন সে কথা বলছি। কাকা নীরদচন্দ্র তাঁর পরিবারদের নিয়ে একেবারে উত্তর দিকের ঘরে থাকতেন। তার দক্ষিণের ঘরটা ছিল বাবার। সেই সারিতে আর একটা ঘরে থাকতেন আমাদের ঠাকুমা। তিনি বেঁটেখাটো ছিলেন; কিন্তু ষাট বছর বয়সেও অসাধারণ সুন্দরী, মাথায় সাদাচুল, শান্তিপ্রিয়, সংযত স্বভাব, নমনীয় কিন্তু কিছুটা ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। এরপরই ছিল রাজপরিবারের সবচেয়ে ভয়ের কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কাকা

নগেন্দ্রের ঘর। তার সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ঘরটাতে থাকতেন আমাদের প্রিয় ও স্নেহময়ী মধ্যম পিসীমা—যাঁর কথা আগেই বলেছি।

সকালবেলা প্রায় সাতটায় কাকাদের সঙ্গে নিয়ে বাবা অন্দরমহলে আসার সময় ভৃত্যরা প্রবেশ দ্বার থেকে যথারীতি চেঁচিয়ে খবর দিত। গ্রীষ্মকালে তাঁদের গায়ে থাকত সূতি আর শীতকালে পশমী চাদর। তাঁরা ঠাকুমার ঘরে গিয়ে প্রাতঃ-সন্ধ্যা সেরে দুধের তৈরি খাবার আর ফল খেতেন। তারপর চা পানের জন্যে যাঁর যাঁর ঘরে চলে যেতেন।

ইতিমধ্যে যে ছেলেমেয়ে ভাত খেতে শিখেছে তারা সবাই এসে জড়ো হতো মধ্যম পিসীমার ঘরে। সেখানে আগে থেকেই অনেকগুলো কাঠের পিঁড়ি আর প্রত্যেক পিঁড়ির সামনে কাঁসার রেকাবি ও গ্লাস মেঝেতে সার করে সাজানো থাকত। বাবার সব বোন আর আমাদের বিবাহিতা বোনেরা ছেলেমেয়ে নিয়ে এলে আমাদের সংখ্যা মাঝে মাঝে কুড়ি জনেরও বেশী হয়ে দাড়াত। আমরা সাধারণত ডিম, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সেদ্ধ গরম ফেন-ভাতে গাওয়া ঘি দিয়ে মেখে খেতাম। খাবার সময় ভাত মাখা, আঙুলে ধরে তুলে খাওয়ার পদ্ধতি আমাদের নির্ভুল ভাবে শেখান হতো।

খাওয়ার শেষে পাঁচ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা চলে যেত কৈলাস পণ্ডিতের পাঠশালায়। সেটা ছিল অন্দরমহলের প্রবেশ পথে, পাহারা ওয়ালাদের ঘরের কাছে। কৈলাস পণ্ডিত ছিলেন শ্যামবর্ণ, টাকমাথা, ছিপছিপে গড়নের কিন্তু নরম স্বভাবের মানুষ। দোর গোড়ায় এসে বেশ জোর গলায় তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে তিনি ডাকতেন, "রাজকুমারীরা পড়তে এস।" বারো বছরের কম অবিবাহিতা মেয়েরা আর আট বছরের কম বয়েসের ছেলেরা যার যার বইখাতা, স্লেট নিয়ে কাঠের তক্তপোশে বিছানো মাদুরে বসে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়ত আর লিখত। বিয়ের আগে মেয়েরা অনায়াসে বাংলা পড়তে পারত, ব্যবহারিক গণিত জানত এবং ইংরেজি প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে ফেলত। যে সব শিশু সবে হাঁটাহাঁটি, ছুটোছুটি করত, পড়তে যেত না, তারা থাকত দাসীদের হেপাজতে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পড়াশুনা করে আমরা একসাথে আঙ্গিনায় খেলাধুলো করতাম।

দশটার মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেলে যে মেয়েদের বয়স ন' বছরের বেশী হয়েছে তারা স্নান সেরে বড়দের কাছে চলে যেত। সেখানে তারা পরিবারের বয়স্কা বিধবাদের প্রাত্যহিক শিবপূজার আয়োজন করে দিত। তাছাড়া, তরকারী কাটা, রান্না করা, বা পৈতেতে সুতো কাটাও তাদের শিখতে হতো।

এদিকে পাঁচ বছরের চেয়ে ছোট ছেলেদের ভালো করে তেল মাখিয়ে দাসীদের তত্ত্বাবধানে স্নান করিয়ে দেওয়া হতো আর তাদের চেয়ে বড় ছেলেরা খুশিমতো বয়স্কদের সঙ্গে পুকুরে বা নদীতে গিয়ে ভৃত্যদের সাহায্যে স্নান করে ফিরে এসে হয় বাবা কিংবা কোন কাকার ঘরে গিয়ে সে সময়কার কোন ফল পেট ভরে খেত।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দুপুরের খাওয়া হতো। ছোট শিশুদের মা-বাবার ঘরেই খাইয়ে দেওয়া হতো। বড়রা সবাই একসাথে খেতে বসতেন। খাওয়ার শেষে যে যার ঘরে চলে যেতেন পান খেতে। সাবালিকা মেয়েরা অথবা বয়স্কা মহিলারা কখনও পুরুষদের সামনে কিংবা পুরুষদের খাওয়া না হলে খেতে বসতেন না। খাওয়া সেরে মা আর কাকীমারা ঘরে ফিরে এলে বাবা কাকারা বাহির বাড়িতে চলে যেতেন।

বিকেলের দিকে ছেলেমেয়েদের বাইরে নিয়ে খেলাধুলা বা বেড়ানোর জন্যে পরিচারিকারা তাদের অন্দরমহলের প্রবেশপথ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিত। তখন মাঝে মাঝে আমরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়তাম। সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে এলে দাসীরা আবার আমাদের অন্দরমহলে নিয়ে যেত।

খানিক বাদেই প্রবেশ পথে বাবা আর কাকাদের আসার খবর পেয়ে দাসীরা লণ্ঠন হাতে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসতে যেত। তাঁরা এসে ঠাকুমার ঘরে সায়ংসন্ধ্যা সেরে আপন আপন ঘরে চলে যেতেন। আমরা তখন মা-বাবাকে ঘিরে তাঁদের মুখে আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকথা শুনতাম—সে সময়কার হাতি খেদার গল্প, ১৮৯০ সালের হাজং বিদ্রোহের ঘটনা কিংবা ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের কাহিনী।

আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাবা আবার বৈঠকখানায় চলে যেতেন। সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে মিলে সব ভাই একসাথে বৈঠকী পরিবেশে গান, বাজনা, আলাপ আলোচনা কিংবা সংবাদপত্র পড়ে সময় কাটাতেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কোন কোন জমিদার পরিবারে মদ্য বা ধূমপান কিংবা প্রমরা (একরকম জুয়া) খেলার যেমন রেওয়াজ ছিল, আমাদের পরিবারে কিন্তু তার কোনটাই ছিল না। বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিরাই শুধু বৈঠকখানায় ধূমপান করতে পারতেন। পাঁচ বছরের কিছু বেশী বয়স থেকে কিছুক্ষণের জন্যে আমি বৈঠকখানায় যেতে পারতাম।

সন্ধ্যাবেলা আমরা ঘরে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলতাম। তারপর মোমবাতি কিংবা মাটির প্রদীপে রেড়ির তেলের অস্পষ্ট আলোতে হয় মা নয়তো কোন বড় বোন মনমাতানো গল্পের বই পড়তেন। এর মধ্যে যদি কোনদিন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আওয়াজ হতো তবে পরিবেশ আরও জমে উঠত। মা তখন সুর করে আবৃত্তি করতেন—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যে দান;
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যে খান,

আর এক কন্যে গোঁসা করে
বাপের বাড়ি যান।

অবশেষে আসত আমাদের ঘুমোতে যাবার পালা। চওড়া খাটের এক বিছানায় মায়ের ডান পাশে ঘুমোতাম আমি আর আমার ছোট বোন, বাঁ পাশে ঘুমোত আর কেউ। বয়স অনুসারে আর সবাই যার যার শোবার জায়গায় চলে যেত, আর বুড়ী দাসীদের মুখে ভূতের গল্প বা ঘুমপাড়ানী ছড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো। মাঝে মাঝে হুতোম পেঁচার বিকট ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যেত, তখন আমি ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোতাম। কখনও-বা দেশী কুকুরের ঝগড়া, শেয়ালের ডাক অথবা পাহারাওয়ালার শব্দেও আমাদের গভীর ঘুম ভেঙে যেত।

অন্দরমহলের জীবনযাত্রায় মোটামুটি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ; তবু এতোবড় এক সংসারে পরিচারিকাদের অস্বাভাবিক বাহুল্যে আর ছেলে মেয়ের ভিড়ে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধতো। তখন আমার মেজকাকার হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠত। আগেই বলেছি যে, ঠাকুমার স্বভাব ছিল কোমল, তাই মস্ত এক পরিবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাঁকে মা আর পিসীমার উপর নির্ভর করতে হতো।

দাসীদের হাজিরার পালা বদল হতো। তাদের মধ্যে বয়স্কা পরিচারিকারা বাবার শৈশবকাল থেকেই আমাদের সংসারে ছিল। তারা থাকত রাত্রে। বাকী সবাই আমাদের শুতে যাবার আগে পর্যন্ত হাজির থাকত। এদের ছাড়াও বাসন মাজা, জামা কাপড় ধোওয়া, মাছ মাংস কাটার আলাদা দাসী ছিল। এরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পেনসন ভোগী প্রাচীন বৃদ্ধা দাসীরা থাকত ঠাকুমার কাছে। এছাড়া কিছু বয়স্কা কিন্তু কর্মক্ষম, সুবিধেভোগী, নতুন আগন্তুক আর সাধারণ দাসীও ছিল। এরা সবাই শূদ্র। 'বাহির কামলী' নামে অস্পৃশ্য শ্রেণীর আর একদল ঝিও কাজ করত। তারা ধোপা, মালী, পাটুনী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক। মুসলমান অপহরণ করেছে কিংবা কোন সামাজিক কলঙ্কে সমাজচ্যুতা হয়েছে এমন স্ত্রীলোকও এদের মধ্যে ছিল। পরিচারিকার কাজে যারা নিযুক্ত হতো তাদের মধ্যে যুবতী, বিধবা এবং বৃদ্ধাও থাকত। কিছু বিবাহিতা মহিলাও ছিল। এদের মধ্যে সিকদার মেয়েদের স্বভাব আর রুচি বেশ উচ্চ মানের ছিল।

বাইরের যে ক'জন পুরুষ মানুষ সহজে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত —জয়া নাপিত তাদের একজন। প্রবেশপথে এসে যখনই জয়া চেঁচিয়ে জানাত যে সে আসছে, বাড়ির মহিলারা তখনই যাঁর যাঁর ঘরে চলে যেতেন আর পরদার আড়াল থেকে নখ কাটার জন্যে হাত-পা বের করে দিতেন। সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে জয়া তার ক্ষৌরকর্মের মোড়ক খুলত আর কাজ করতে করতে সেকালের রানীদের কথা সবিস্তারে অনর্গল বলে যেত। বাড়ির বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মেয়েরা কিন্তু পরদার বাইরে থেকেই নখ কাটাতেন।

রাজপরিবারের মেয়েরা কখনও নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করেননি। তবুও আমার মায়ের সমসাময়িক কালের প্রায় সকলেই বেশ ভাল বাংলা পড়তে, লিখতে পারতেন। আমার ঠাকুমাও বাংলায় চিঠিপত্র লিখতেন। তাছাড়া রান্না, কিছু কিছু শিল্প কর্ম, সাংসারিক কাজ, দাসীদের শাসনে রাখা, ছেলেমেয়ে সামলানো, শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা, দেশজ ঔষধের ব্যবহার, স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহারিক আদান প্রদানে তাঁদের জুড়ি ছিল না। মোট কথা, পারিপার্শ্বিক বাস্তব সামাজিক জ্ঞানের জন্যে তাঁরা যথাযোগ্য সম্মানের স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে বলা যায় যে, আমাদের পরিবারে মেয়েদের পক্ষে নাচগানের চর্চা করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হতো না।

এক যুক্তপরিবারে উপাধির গুরু দায়িত্ব কিভাবে মহারাজার জীবন ভারাক্রান্ত করে জটিল আবর্তে টেনে আনে উত্তর জীবনে আমি উপলব্ধি করেছি। মহারানীর জীবন কিন্তু সে তুলনায় অনেক স্বচ্ছন্দ ছিল। পদমর্যাদার অগ্রাধিকার, বয়স এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিবারের অন্দরমহল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

রাজবাড়ি এবং স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্দরমহলের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অতি সামান্যই ছিল। অবশ্য লৌকিকতার অতিরিক্তও রানীদের পালনীয় কিছু দায়িত্ব ছিল। কুটুম্ব বাড়িতে অন্নপ্রাশন বা বিয়ের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগ দেওয়ার রীতি থাকলে রানীরা যেতেন এবং সেই আত্মীয় পরিবারের দায়িত্বসম্পন্না মহিলাদের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে প্রয়োজনীয় সব কাজ করতেন। রাজপরিবারের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের যথার্থই প্রীতির বন্ধন ছিল। সেখানেই রানীরা গ্রামের সাধারণ মেয়েদের সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেতেন। আমার মায়ের আমলের রানীরা এভাবেই সামঞ্জস্য বজায় রেখে গ্রাম্য জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার সমকালীন নব্য ধারায় শিক্ষিতা শহুরে রানীরা এসে কিছুটা বেসুরো মেজাজের প্রবর্তন করতে শুরু করেন। কারণ, গ্রাম্য মেয়েদের তাঁরা অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। তাঁদের রুচিতে তারা ছিল অভদ্র। তাই নতুন যুগের রানীদের সামনে তারা স্বভাবতই স্বচ্ছন্দ হতে পারত না।

অন্তঃপুর আর বাহিরমহলের মাঝামাঝি জায়গাটা ছিল আমাদের আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র। সেখানেই ছিল গুদাম ঘর, পায়রার ঘর, পাহারাওয়ালার চৌকি আর পাঠশালা। পণ্ডিত মহাশয়, তহবিলদার এবং খানদানী ভৃত্য লোকনাথ ও কৃষ্ণধরের সঙ্গে সেখানেই দেখা হতো। তহবিলদার যে গুদামের জিম্মাদার সেটা বুঝতে আমাদের দেরি হয়নি। সেখানে লোহা আর কাঠের আলমারিগুলোতে থাকত অলঙ্কার, পোষাক এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চিত অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি। তাছাড়া বিদেশী অভ্যাগতদের জন্যে নানা রকম কাবুলী মেওয়া সব সময়ই মজুত রাখা হতো। সম্ভবত লোভনীয় সেই খাদ্য

ভাণ্ডারের ত্রিসীমা থেকে আমাদের সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তহবিলদার এবং আরও অনেকে গুদাম ঘরে বিষাক্ত সাপের ভীতিপ্রদ নানা কাহিনীর অবতারণা করেছিল। কারণ সেই মেওয়ার জন্যে তহবিলদারকে আমরা যখন তখন উপদ্রব করতাম। মজুত ভাঁড়ারের হিসাব তহবিলদার রাখত আর দারোগা বা ইন্সপেক্টর সেই হিসাব পরীক্ষা করে ভুলভ্রান্তি শুধরে দিত। তাছাড়া পরিচারিকাদের হাজিরা ও কাজ ভাগ করে দেওয়াও ছিল দারোগার কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তহবিলদারই সেই কাজ করত। চাকরিবৃত্তির জন্যে বাড়ির সব ভৃত্যই জমি-পেত। পরে জমি সংক্রান্ত আইন বদলে গেলে তাদের জমি সম্বন্ধেও কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

তহবিলদারের আর এক ধরনের কাজ দেখে আমাদের উৎসাহের অন্ত থাকত না। মাঝে মাঝে গুদামের বারান্দায় বন্দুক, রাইফেল ও তলোয়ারগুলো বিছিয়ে রেখে ভৃত্যদের দিয়ে তহবিলদার সেগুলো পরিষ্কার করিয়ে তেল মাখাত আর ফাঁকা টোটায় গুলি বারুদ পুরে সেগুলো আবার ব্যবহারোপযোগী করে ফেলত। সেই প্রক্রিয়াগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করত।

তহবিলদারের হ্যারিকেন লণ্ঠন সাজানো আর আলো জ্বালানোর কাজটাই কি কম আকর্ষণীয় ছিল? প্রতিদিন বিকেলে গুদামের বারান্দায় একরাশ লণ্ঠন সাজিয়ে নিয়ে দু-একজন ভৃত্যের সাহায্যে সেগুলো ঘষে মেজে পরিষ্কার করে একজোড়া সেকেলে কাঁচি দিয়ে সলতেগুলো সমান করে কেটে সন্ধ্যার আগেই সে আলো জ্বালিয়ে রাখত এবং অন্দরমহলের এঘর-সেঘর থেকে দাসীরা এসে লণ্ঠনগুলো নিয়ে যেত।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে কয়েকজন ভৃত্যের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে কৃষ্ণধর, টুনিয়া আর লোকনাথের কথা মনে স্থায়ী হয়ে আছে। তাছাড়া জগৎকৃষ্ণের নীতিভ্রষ্ট এবং অবাধ্য ছেলে জঙ্গবাহাদুরের বেপরোয়া কাহিনী শুনিয়ে হরু আমাদের প্রিয় হয়েছিল; তার গল্প বলার বিচিত্র ক্ষমতা ছিল। হরু ছিল কাকা নগেন্দ্রের সবচেয়ে পছন্দসই ভৃত্য। কারণ, কাকার খেয়াল মতো সব ফরমাশ একমাত্র হরুর মতো দক্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন লোকই সমাধান করতে পারত। উপরন্তু গল্প বলতে বলতে সে তার অঙ্গ-সংবাহন বিদ্যার দক্ষতাবলে যে কোন লোককে আধঘণ্টার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই অমায়িক, শান্ত ও পক্ককেশ কৃষ্ণধর, যে তার অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার থেকে আমাদের গল্প শোনাত। ১৯১০ সালে তার মৃত্যু সংবাদে, কলকাতাতে থাকা সত্ত্বেও মনে এতো আঘাত পেয়েছিলাম যে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। যুবক টুনিয়া ছিল সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট। অন্দরমহলের বাইরে, আশেপাশে, পাখি ধরার কৌশল বা সে-ধরনের উত্তেজনাময় কাজে টুনিয়া আমাকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল। বাবার প্রিয় অনেক সুকণ্ঠ আর বুলিধরা খাঁচার পাখি ছিল।

সেগুলো প্রায় সবই স্থানীয়। তাছাড়া কলকাতা থেকে কেনা বিদেশী পাখির মধ্যে ছিল কাকাতুয়া, লরি, ক্যানারী ইত্যাদি আর মুনিয়া পাখির খাঁচায় কিছু 'জেব্রাফিঞ্চ' ও 'জাভা স্প্যারো'। বাবার পছন্দের ভৃত্য লোকনাথ ছিল বেঁটে-খাটো, বিনয়ী আর কেতাদুরস্ত। রাজবাড়ির কোন উৎসব তাকে ছাড়া চলত না। দারোয়ানদের মধ্যে উন্নতকায়, বলিষ্ঠ ও প্রায় বয়স্ক উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ মাধোলাল যেন ছিল সততা, বিশ্বাস আর ধর্মনিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। তার সুর করে তুলসীদাসের রামচরিত মানস পড়া শুনে আমার মন ভক্তিরসের গভীরে ডুবে যেত।

কদর্য চরিত্র অনেক ভৃত্যের কথাও মনে আছে। ভৃত্যদের কাজে পালা বদল হতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজের তাড়া খুব বেশী ছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়াত প্রায় বারোজন। তাছাড়া জল আনার জন্যে আর এক দল ভৃত্য ছিল। তারা ছিল বিহারী কাহার—পরিবারের অন্যান্য ভৃত্যদের পর্যায়ভুক্ত এবং খুব পরিশ্রমী। যত দূর মনে হয় আমাদের ছেলেবেলার জল আনার কাজ শূদ্রেরাই করত। কিন্তু তারা ক্রমে সে কাজ ছেড়ে দেয়। কারণ, স্থানীয় শূদ্রদের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের প্রবণতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল।

মনে পড়ে বিকেল বেলা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখেছি যে, কিছু কুস্তিগিরকে ঘিরে মেলাই লোকজন জড়ো হয়েছে। সেকালে শূদ্রেরা স্বাভাবিক ভাবেই সে কুস্তি খেলায় যোগ দিত, তাদের শারীরিক শক্তির পরিচয় দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিত, গর্বও অনুভব করত। কিন্তু ক্রমে তাদের ধারণা হলো যে এ খেলায় মর্যাদাহানি হয়। তাই সহজ, শক্ত, সমর্থ স্বাস্থ্যলাভের পরিবর্তে তারা ভোজন আর বেশভূষা বিলাসী হয়ে পড়েছিল।

প্রসঙ্গত, সেকালে গ্রামবাসীদের মধ্যে আর এক ধরনের উত্তেজনাময় খেলার কথা মনে পড়ছে। সেটা ছিল মস্ত কুঁজ আর সূচ্যগ্র শিঙওয়ালা সুগঠন দুই ষাঁড়ের লড়াই। রাঁচির কাছে মোরগের লড়াই দেখতে খোলা মাঠে যেমন লোক জড়ো হয়, সেরকম আমাদের এদিকেও গ্রামের মানুষ মজবুত লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে ভিড় করত। সেই লড়াইয়ে একটা ষাঁড় পরাজয়ের খেসারত হিসেবে হয় প্রাণ দিত, নয়ত বাকি জীবন পঙ্গু হয়ে কাটাত। হেরে যাওয়া ষাঁড়টা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে গেলে দর্শকবৃন্দের অতি উৎসাহীদের মধ্যে অবাধ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সেই উত্তেজনা শেষ হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ খেলা কিন্তু মুসলমান সমাজেই হতো।

অন্দর ও বাহিরমহলের মধ্যবর্তী এলাকা পার হলেই আমরা দেখতাম কাকা নীরদচন্দ্র কাছারির কাজ করছেন। তাঁর সামনে একটা কাঠের রেলিঙের সামনে প্রজারা এসে জড়ো হচ্ছেন। কেউ এগিয়ে এলে একজন কর্মচারী তাঁর সমস্যা উপস্থাপন করছেন। মুসলমান প্রজারা কুর্নিশ করলে তিনি প্রথামতো তাঁদের সেলাম জানাচ্ছেন। ব্রাহ্মণরা ছাড়া অন্যান্য সব হিন্দুরা প্রত্যভিবাদন না পেলেও প্রণাম করছেন। ছেলেবেলায় এ-জায়গাটাকে আমরা অত্যন্ত ভয় আর সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি।

পরিবারে আমার বাবা প্রধান এবং সবচেয়ে বড় হলেও কাছারির কাজ এড়িয়ে চলতেন। কারণ, স্বভাবতই জ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলনে তার প্রবল অনুরাগ ছিল। বিদগ্ধ লোকের সাহচর্যে তিনি আনন্দ পেতেন। স্থানীয় কিংবা বাইরের জ্ঞানীগুণীদের সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে বিভিন্ন জটিল সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতেন।

আমাদের পরিবারে অভ্যাগতদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের খানদানী প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

আমরা দেখেছি যে, বিশেষ এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক যখন আসতেন, তখন বাবার সঙ্গে দরবারে উপস্থিত সব লোকই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতেন। ফরাসে আলাদা একটা কার্পেটের আসনে তিনি বসলে তাঁকে সৌজন্যের সঙ্গে প্রণাম করে বাবা তাঁর নির্দিষ্ট মসনদ থেকে কিছু দূরে আসন গ্রহণ করতেন। অতি সম্মানের পাত্র সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন আমাদের কুলগুরু। এককালে বৈদিক-তান্ত্রিক শাখার সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি বাকলজোড়াতে তিনি বাস করতেন।

স্থানীয় প্রজা এবং বিশিষ্ট লোকদের কেমন করে অভ্যর্থনা করা হয় তা শেখার জন্যে আমি কিছুক্ষণ দরবারে উপস্থিত থাকতাম।

তখন দেখেছি দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদের আচরণ এবং আসন গ্রহণ করার রীতি কত শোভন ছিল। আসন পর্যায়বিভক্ত থাকত। ঢাকা, টাঙ্গাইলের সাহা মহাজন বসতেন ঘাসের মাদুরে। সেই দরবারে প্রবীণ কোন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, "মহারাজ কুমারের শরীর ভাল আছে তো?" আমিও উত্তর দিতে শিখেছিলাম, "শক্তিরূপিনী দশভূজার আশীর্বাদে আমরা ভালোই আছি। তাঁর অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আপনাদেরও সব মঙ্গল।"

মুসলমান প্রজারা জিজ্ঞেস করতেন, "আল্লার দোয়ায় মহারাজ কুমার বহাল তবিয়তে আছেন তো?" আমি বলতাম, "মহামায়া আর খোদার দোয়ায় আপনাদের পরিবারে সকলেই নিশ্চয়ই ভাল আছেন।"

কোন নতুন প্রজা দরবারে আমাকে দেখতে এলে কয়েকটা সোনা বা রূপার টাকা রুমালে করে আমার সামনে রাখতেন। আমাকে বলা হয়েছিল যে, সেগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। সেসব নজরানা যে মহারাজ কুমারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সে কথা আমি পরে জেনেছি।

মনে পড়ছে অভিজাত মুসলমান প্রজাদের কথা। তাঁরা হিন্দুদের মতোই আনত হয়ে আমাদের পা ছুঁয়ে নিজের মাথা আর বুকে হাত রাখতেন। আমি শুনেছি যে তাঁরা খুব পুরোনো মুসলমান প্রজার বংশধর। চিরাচরিত বিশ্বস্ততায় তাঁরা রাজপরিবারের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

কিছু কিছু বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণকে দেখেছি যে, তাঁরা এগিয়ে এসে বিশেষ ভঙ্গিতে করজোড়ে দাঁড়াতেই বয়স্করা সকলেই আসন ছেড়ে অর্ধোত্থিত অবস্থায়

নুয়ে নমস্কার করতে উদ্যত হলে তাঁরাও প্রতি নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করতেন। একটা রীতি আমার চোখে অভিনব মনে হয়েছে—বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় হয়েছেন এমন কোন ব্যক্তিও সুসঙ্গে প্রজা হিসেবে বসবাস করতে শুরু করলে, বয়স ও আত্মীয়তার পদমর্যাদা নিরপেক্ষে, রাজপরিবারের সবাইকে অভিবাদন করতেন। এটা, সাধারণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বয়স ও আত্মীয়তা-ভিত্তিক পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান ও অভিবাদন জানানোর প্রথার বিপরীত। তাই বলা চলে আত্মীয়তার কিছু কিছু স্বাভাবিক রীতি ভূস্বামীত্বের আভিজাত্য প্রভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছিল।[২]

কায়স্থ কর্মচারীরা বয়স বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাজপরিবারের প্রত্যেককে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতেন। ব্রাহ্মণদের পরের সারিতে তাঁদের আসন নির্দিষ্ট ছিল। পারিবারিক চিকিৎসক, যৌথ স্টেটের দেওয়ান, এবং প্রধান কর্মচারীরা প্রতিদিন তিন রাজবাড়ির দরবারেই যেতেন।

জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে আঞ্চলিক সরকারের সব কর্মচারীকেই বসবার জন্য ফরাস পেতে দেওয়া হতো। উচ্চপদের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বৈঠকখানার বারান্দায় চেয়ারে বসতে দেওয়া হতো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের রাজকর্মচারীদের অভ্যর্থনার জন্যে মধ্যমবাড়িব দরবাব ঘর নির্দিষ্ট ছিল। ক্ষমতাসীন ইংরেজ সরকাবের প্রতিনিধি হয়ে কোন রাজকর্মচারী যখনই আসতেন তখনই এক প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হতো। তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তদবিরে স্টেটের সব কর্মচারী তৎপর থাকত, ম্যানেজার দরবারের পোষাক পরতেন, আর হাতি-মাহুত, ঘোড়া-সহিস, পালকি-বেহারা সব ফিটফাট সাজিয়ে রাখা হতো। তখন জাঁকজমক দেখানোর উপরে এতই গুরুত্ব দেওয়া হতো যে, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই স্টেটের আর্থিক সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে যেত।

মহকুমা বা জেলা শাসক এসে প্রথমে মহারাজা আর তাঁর ভাইদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁরাও উপযুক্ত সমারোহ করে ডাকবাংলোতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিনিময় করে আসতেন। মহারাজা বা তাঁর প্রতিনিধি সেই রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একদল অনুচর নানারকম খাদ্য সামগ্রীর 'ভেট' বা 'সিধা' নিয়ে যেত। বলা বাহুল্য যে, নিষিদ্ধ খাদ্য বা পানীয় কখনও পাঠানো হতো না এবং সরকারী কর্মচারীদের খানাপিনায় রাজারা কখনও যোগ দিতেন না। কারণ, রাজপরিবার যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তা তাঁদের অবিদিত ছিল না।

আমি যখন থেকে 'গুড মর্নিং' বা 'গুড বাই' আওড়াতে শিখেছি, তখন থেকেই আমাকে সাজিয়ে গণ্যমান্যদের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ভাবেই পদস্থ রাজকর্মচারী বা ইংরেজদের সঙ্গে চালচলনের প্রথম পাঠে আমি অভ্যস্ত হয়েছি। ইংরেজ রাজপুরুষদের তুষ্ট করার প্রবল আগ্রহ, যাকে প্রায় খেপামি বলা যায়, স্বাভাবিক কারণেই আমার মনে ছেলেবেলাতেই গভীর ছাপ ফেলেছিল।

ফলে ইংরেজদের আমরা নিরঙ্কুশ শক্তির প্রতিভূ হিসেবে দেখেছি এবং যথাযোগ্য সম্মান ও ভয় করেছি। তাছাড়া অস্পৃশ্য হিন্দুদের মতো ইংরেজদের মধ্যে অশাস্ত্রীয় আহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। কাজেই তাঁদের সংগে বসে খাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং শৃংখলা মেনে চলেন—বাবা ও পরিবারের প্রবীণদের কাছে তাঁদের এই গুণের প্রশংসা শুনেছি। তবু আমাদের অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ্যরীতি বর্জন করে বিলিতি চালচলনের দিকে কখনও আকৃষ্ট হইনি।

সুসংগ রাজপরিবার সংগত কারণেই মুঘল আমল থেকে দিল্লীর প্রকৃত শাসকদের সংগে সাক্ষাৎভাবে জড়িত ছিলেন। ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নেও এই রাজপরিবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতীত ঐতিহ্যের সংগে সংগতি বজায় রেখেছিলেন।

সেকালে সুসংগ পরগণায় ছোটখাটো ফৌজদারী বা দেওয়ানি মামলাগুলো প্রথমে রাজবাড়ির বিচারসভায় আসত। ছেলেবেলায় সেসব বিচারসভায় আমরা কদাচিৎ যেতাম। কারণ, মাঝে মাঝে সেখানে আসামীরা কঠিন বেত্রাঘাতে যন্ত্রণায় চীৎকার করত; তা শুনে আমরা ভয় পেতাম। এ অঞ্চলে প্রথম যেবার জমি জরিপ আর খাজনার হার ঠিক করার কাজ শেষ হলো, তখন থেকেই রাজ বাড়ির বিচারসভা বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী পুলিশ ও আদালত আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নেন। ফলে মামলা-মকদ্দমাও বেড়ে যায় এবং আইনজীবীরাও খুব সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

আমরা তখন সবে হাঁটাহাঁটি আর দৌড়াদৌড়ি করতে শিখেছি। তখন থেকেই অভিভাবকরা আমাদের নিয়ে যেতেন মনোহর বা বড় বাগানে। সংগে ভৃত্যরাও থাকত। বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে বড় বাগানে ছিল পরিবারের খামার আর ফল বাগিচা। সেখানে যাওয়া-আসার সময় দেখেছি যে, পথের লোক মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের সম্মান দেখাচ্ছে। শূদ্রেরা আমাদের পায়ে হাত দিতে পারত কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু জাতির মানুষ দূর থেকেই প্রণাম করত।

কোন গৃহস্থ-বধূ পথে হঠাৎ আমাদের দেখা পেলে তখনি মাথায় শাড়ি টেনে, মুখ ঢেকে একেবারে পিছন ঘুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ত। গারো, হাজং কিংবা অন্যান্য উপজাতি মেয়েদের চালচলন কিন্তু একেবারেই অন্যরকম ছিল। হাজং মেয়েরা খুশির হাসি হেসে মাটিতে মাথা ঠেকাত, আর অনাবৃত বক্ষ কটিবস্ত্র পরিহিতা গারো মেয়েরা একপাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত। বাঙালি হিন্দু মেয়েরা শুধু একটা শাড়ি কোমরে দুবার পেঁচিয়ে পায়ের গোড়ালি থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের উপরটা ঢেকে রাখত; কারণ, সেকালে সেমিজ বা ব্লাউজের মতো কোন অন্তর্বাসের চলন ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন সব বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে কী কৌতূহলই না হতো! ছেলেবেলায় এভাবেই প্রতিদিন স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আর তাদের

রীতিনীতি, সৌন্দর্যবোধ ও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রেই আমার উত্তর জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে।

বড়বাগানের প্রবেশপথে ছিল দীনা দারোগার বাড়ি। তার ছোট সুন্দর বাড়ির চারদিকে বাঁশের বেড়া ঘেরা আঙিনাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। দীনা বাগান দেখাশোনা করতেন। আমরা প্রায়ই সেখানে যেতাম এবং বয়স্কা এক স্ত্রীলোক বাইরে এসে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেত। তার নাম ছিল 'অপর্তর মা'। সেখানে আর একজন সুশ্রী, মোটাসোটা আর গোলগাল গড়নের স্ত্রীলোক আমাদের মুখরোচক ফল আর দুধের টাটকা সর খেতে দিত। তার চুলের লেশমাত্রহীন মাথা সে সুকৌশলে ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখত।

দীনার স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতেই থাকত। সে কথা আমরা অনেক পরে শুনেছি। সেই সুশ্রী স্ত্রীলোকটি ছিল দীনার রক্ষিতা আর বয়স্কা স্ত্রীলোকটি ছিল অপর্তের মা। সেকালে রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ ছিল এবং নিম্ন শ্রেণীর যুবতী বিধবারা কোন সক্ষম লোকের আশ্রিতা হয়ে পারিবারিক জীবনের সুবিধে উপভোগ করতে পারত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাদের সন্তানাদি বড় একটা হতো না; যদি হতো, তবে নীচ বর্ণের কোন পরিবারে সে স্থান পেত।

বড়বাগানে একটা মজবুত ঘেরের মধ্যে দশ-বারোটা শম্বর হরিণ ছিল। দীনার বাড়ি থেকে আমরা সেই হরিণ দেখতে যেতাম। একবার একটা মন্দা হরিণ শিঙের গুঁতো দিয়ে তাদের এক রক্ষককে মেরে ফেলেছিল। সে কথা শোনা অবধি নিরাপদ দূরত্বে থেকেই আমরা হরিণ দেখতাম।

বাগানে চার পাঁচটা গোয়ালঘর ছিল এবং অনতিদূরেই বিশ্রামের জন্য খড়-ছাওয়া একটা বাংলো ঘর ছিল। আমরা মাঝে মাঝে গোয়ালঘর দেখতে যেতাম। সেখানে একটাতে থাকত দুধেল গরু আর বাচ্চা। যে গরুর দুধ বন্ধ হয়েছে সেগুলো থাকত আর একটা ঘরে। স্থানীয় সাধারণ গরুর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল তৃতীয় ঘরটা, তার পরের ঘরে ছিল সংকর জাতের গরু। পৃথক একটা ঘরে প্রকাণ্ড এক হিংসারী ষাঁড় ছিল। সবচেয়ে ভালো জাতের গরুগুলো এক-একটা খুঁটিতে বাঁধা থাকত। তাদের প্রত্যেকের নাম ছিল। দুধ দোয়া হয়ে গেলে বড়রা চলে যেতেন সবজি খেত দেখতে। আর আমরাও নানা ফলের লোভে বাগানের দিকে নজর দিতাম।

বড়বাগান থেকে গারো পাহাড় আর তার পাদদেশে সমতলের বিস্তীর্ণ দৃশ্য দেখা যেত। আমার শৈশব অর্ধশতাব্দী পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সে-ছবির মনোমুগ্ধকর অনুভূতি আজও অম্লান আছে। আজ আমি কলকাতায় কোণঠাসা ছোট এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, তবু আমার মন ছুটে যায় সেই দিগন্তপ্রসারী ধানখেত আর পাহাড়ের টানে।

ফলবাগানের আশেপাশে ছোটখাটো কিছু কিছু ঝোপঝাড় ছিল। একটু দূরে

নজরে পড়ত গারোদের বাঁশের কুঁড়েঘর বা বাচান্। সেগুলোকে তারা বলে 'নক'। তারা সকলেই স্টেটের কর্মী। ঝোপজঙ্গল পিটিয়ে গারোরা মাঝে মাঝে খরগোশ ধরত। ফাঁদে খরগোশ ধরার দৃশ্য দেখে আমাদের রোমাঞ্চ হতো।

সূর্য পাটে যাবার আগেই আমরা বাগান থেকে বাড়ি ফিরে আসতাম। বড়রা তখন বৈঠকখানার সামনে সাজানো চেয়ার আর মোড়ায় বসলে ভৃত্যরা এসে তাঁদের হাতের ছড়ি, গায়ের জামা এবং পায়ের জুতো খুলে নিত। তাছাড়া গরমের সময় তারা বড় বড় হাত পাখা দিয়ে হাওয়াও দিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে হাত-পা ধুয়ে তাঁরা অন্দরমহলে যেতেন। সঙ্গীভৃত্য যথারীতি সেই প্রবেশপথে এসেই উচ্চকণ্ঠে তাঁদের আগমনবার্তা জানাতেই দাসীরা এগিয়ে এসে সবাইকে ঠাকুমার ঘরে নিয়ে যেত। সেখানে তাঁরা সায়ংসন্ধ্যায় বসতেন আর এদিকে দশভূজা মন্দির থেকে ভেসে আসত সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি।

ইতিমধ্যে আমরাও হাত পা ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে বাবার অপেক্ষায় থাকতাম। তিনি এলেই সব বোনকে নিয়ে আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম। তিনি হয়ত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নয়ত পারিবারিক ইতিহাসের কাহিনী থেকে সোমেশ্বরের দুঃসাহসী অভিযান, রঘুনাথের শৌর্য, কমলারানীর ভক্তি, দেওয়ান রামচরণের দুর্বৃত্তি ইত্যাদি গল্প শোনাতেন। প্রকৃতপক্ষে বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সোমেশ্বর এবং বীর রাজপুরুষ রঘুনাথ ছিলেন আমার আদর্শ। ছেলেবেলায় শোনা সেই সব কাহিনী থেকেই আমাদের পরিবারের প্রতি অনুরাগ ও গৌরববোধের উন্মেষ হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতাই এ রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। ঘণ্টাখানেক গল্প শুনিয়ে বাবা আবার বৈঠকখানায় চলে যেতেন আর আমরাও মাকে ঘিরে বসতাম। তখন হয়ত মা কিংবা তাঁর নির্দেশে বড় বোনদের কেউ 'ক্ষীরের পুতুল', 'খুকুমণির ছড়া'র মতো মজার কোন গল্পের বই অথবা 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী পড়ে শোনাতেন। পুরাণের দেবদেবী আর অন্যান্য আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। আমার মা কখনও কখনও 'সত্যি' ভূতের গল্পও বলতেন।

আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে পুজো, সামাজিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় উৎসব, পদস্থ রাজকর্মকর্তার আগমন, অষ্টমী মেলা, পুরুষদের যাত্রাভিনয়, কীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি পাঠ, কিংবা ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝে মাঝে সাময়িক রূপান্তর ঘটিয়ে যেত।

গারো পাহাড়ে কখনও মুষলধারে বৃষ্টি হলেই সোমেশ্বরী নদীতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিত। তখন কোঁদা নৌকো কিংবা কলাগাছের ভেলায় মানুষ খুশির আমেজে দলে দলে জলবিহারে বেড়িয়ে পড়ত।

প্রতি সপ্তাহে বড়োরা হাতি চড়ে মাঝে মাঝে যখন শিকারে যেতেন, তখন

ভৃত্যারা প্রবীণ অভিভাবকদের মাথায় মস্ত মস্ত সাদা ছাতা ধরে থাকত। সে দৃশ্য যে খুবই জমকালো হতো তাতে সন্দেহ নেই। বড় বাঘ বা লেপার্ড শিকারের সময় মাহুতদের হাতে বর্শা থাকত। আমরা অধীর আগ্রহে শিকারীদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকতাম। সূর্যাস্তের কিছু পরে তাঁরা ফিরে আসতেন। হাতির পিঠ থেকে মাহুতরা শিকার নামিয়ে মাটিতে রাখত। শিকার দেখে আমাদের যেমন ভয় তেমনি উত্তেজনাও হতো। পরদিন সকালে শিকার করা জন্তুর মাংস বিতরণ করা হতো। এক টুকরো হরিণের মাংসের জন্যে কত লোকই না জড়ো হতো! দেখে মনে হতো যেন মরা জন্তুকে ঘিরে শকুন বা শ্বাপদের দল জুটেছে! কাকা নগেন্দ্র মাংস বিতরণ তত্ত্বাবধান করতেন।[৩] দশভূজা মন্দিরের পুরোহিত স্টেটের কর্মচারী, কুলীন বা রাজপরিবারের জ্ঞাতি, সম্মানযোগ্য ব্রাহ্মণ, কোনও ভদ্র কায়স্থ ও শূদ্র শুধু মর্দা হরিণের মাংস পেতেন। মুসলমানী রীতি অনুযায়ী মুসলমান মাহুতের জবাই করা হরিণীর মাংস বিশিষ্ট মুসলমান, স্থানীয় সরকারী কর্মচারী ও নানা শ্রেণীর মুসলমান পরিচারকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। বন্য শূকরের অংশ শূদ্র ভৃত্যেরা আগে পেত এবং অবশিষ্ট অংশ ধোপা, মালী, নমঃশূদ্র, মাঝি, হাজং, বানাই, হাদি আর গারোদের বিতরণ করা হতো। শূকরের দাঁত, হরিণের শিং, বাঘের নখ ইত্যাদি এবং রোমশ জন্তুর চামড়া স্থানীয় কর্মীদের দিয়ে পাকা করিয়ে রাজবাড়িতে রাখা হতো। মাংস বিতরণের সময় কাকা নগেন্দ্র প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অংশে নাম লেখা টুকরো কাগজ সেঁটে দিতেন। বাহকরা মস্ত মস্ত পেতলের থালা বা পরাতে কলাপাতা আর কাপড় দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে ঢেকে নিয়ে যখন যেত তখন দুজন লোক লম্বা ছড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকে উড়ন্ত চিলের ছোবল থেকে তা বাঁচাত। আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কাজ দেখতাম। দেখে শুধু যে আনন্দ পেতাম তাই নয়, শিকার করা প্রাণীর দেহ বিন্যাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। স্থানীয় শিকারীরা মাঝে মাঝে রাজবাড়িতে শিকার নিয়ে এসেছেন এবং বাঘের জন্যে কুড়ি টাকা, শম্বর বা বারোশিঙা হরিণের জন্যে দশ টাকা, লেপার্ড বা ভালুক বা বিষাক্ত সাপের জন্যে পাঁচ টাকা আর 'হগরা' হরিণের জন্যে দু টাকা করে স্টেটের নির্দিষ্ট হারে পুরস্কার পেয়েছেন। শিকার করা শম্বর হরিণের মাংস উল্লিখিত ভাবে বিতরণ করা হতো। ১৮৯৭ সালের সেই ভূমিকম্পের ভগ্নস্তূপগুলো ক্রমে সরীসৃপ কুলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়েছিল। কিছু বিষাক্ত বা নির্বিষ সাপ রাজবাড়ির চত্বরে প্রায়ই দেখা যেত। লাঠির ঘায়ে ভৃত্যদের সাপ মারার ব্যাপারটাও ছিল প্রায় নিত্য ঘটনা।

আমার প্রথম জীবনে চুরির কোন ঘটনা মনে পড়ে না। শুধু একবারই বাড়ির দুজন চাকর চুরি করে মাস খানেক বাদে ধরা পড়ে। সেজন্যে তারা উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। শোবার ঘরের সব দরজাই রাত্রে খোলা থাকত। মনে পড়ে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সে-রীতিই বজায় ছিল। পরে তার পরিবর্তন হয়।

সুসঙ্গের হাতি সম্বন্ধে কিছু না বললে এই স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, রাজপরিবারের জীবনযাত্রায় হাতি এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, তাকে বাদ দিয়ে সুসঙ্গের কথা চিন্তা করা যায় না। কেননা, হাতিকে নদীতে স্নান করানো, রাত্রে বিশ্রামের জন্যে পিলখানায় সার করে বেঁধে রাখা, একের পর এক হাতির পিঠে সদ্য বোঝাই করা 'লাদ' বা জাবনার উপর দড়াবাজিকরের মতো দাঁড়িয়ে মাহুতদের হাতি চালানো, উৎসবে হাতির শরীরে রঙবেরঙের নক্শা আঁকা, ঘণ্টা-অলঙ্কারে তাদের সাজানো, হাতির দৈনন্দিন ক্রীড়া কৌশল, অতিকায় মায়ের সঙ্গে খেলায় মত্ত ক্ষুদে শাবক—সব কিছুই আমাদের উত্তেজনা, পুলক ও বিস্ময় জাগাত! জমকালো চেহারার এমন প্রাণীদের দেখে কখনও অবসাদ আসে কি? উপরন্তু মাহুতরা নতুন ধরা হাতি আর বাচ্চাদের দেখাতে যখন রাজবাড়িতে নিয়ে আসত, তখন আমাদের উদ্দীপনা চরমে পৌঁছুত। রাজাদের হাতি খেদার ক্ষেত্র গারো পাহাড় হাতছাড়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুসঙ্গের হাতির সৌভাগ্য বিলীন হয়ে যায়। আধুনিক যুগে যান্ত্রিক গতিশীলতার সাথে প্রতিযোগিতায় হাতি যেমন অচল হয়ে গিয়েছে, সেভাবেই কাল প্রবাহের ঘাতে প্রতিঘাতে সুসঙ্গ রাজপরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্য স্রোতও বিলীন হয়ে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে আমরা 'মায়ের বাড়ি' যেতাম। সেখানে ছিল পত্র-পুষ্প সুশোভিত বিখ্যাত সেই অশোক গাছ, মহিষ ও ছাগ উৎসর্গের বড় বড় যূপকাষ্ঠ; ঘণ্টা-ঝাঁঝরের ধ্বনি, অপূর্ব শিল্প মণ্ডিত দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। সব কিছুই আমাদের কল্পনা রাঙিয়ে তুলত। পবিত্র সেই অশোক গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া যে পাপের কাজ সে ধারণাও আমাদের হয়েছিল। কারণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে তার বহুশ্রুত সেই সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুজোবাড়ির প্রাঙ্গনে পবিত্রস্থানে পায়ের জুতো খুলে যাওয়ার রীতিও আমরা শিখেছিলাম। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষ দেবী দশভূজার সামনে গিয়ে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাত। পুরোহিত রূপা বা তামার পাত্র থেকে চরণামৃত এনে দিত। এক ফোঁটা চরণামৃতের জন্যে আমরা একসাথে কলরব করে উঠতাম আর সেই অমৃত পেয়েই মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তিভরে মুখে দিতাম। ভৃত্যেরা তারপর আমাদের হাত মুখ ধুইয়ে সন্ধ্যাবেলায় আরতির আগেই বাড়িতে নিয়ে আসত।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোন মুসলমান প্রজা মানত করে দেবী দশভূজার মন্দিরে কিছু বাতাসা দিয়েছিলেন। আমাদের কাছে সেকথা শুনে বড়রা বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ দেবীর কাছে বাতাসা নৈবেদ্য দিতে পারেন। তাঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, হিন্দুরাও মুসলমান পীরের কাছে বাতাসা মানত করে থাকেন। আমাদের পরিবারে মেয়েদের মধ্যে 'ঠুনুকাপীর' পুজার প্রচলন ছিল। পরবর্তী কালে সুসঙ্গ বা

সেরপুর পরগণার মুসলমানদের মধ্যেও দেবীর কাছে মহিষ বা ছাগ উৎসর্গ করতে দেখেছি।

রাজবাড়িতে শাস্ত্রীয় পুজো-পার্বণ প্রায় সারা বছর জুড়েই হতো। সেসব অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু হতো দেবালয়ে আর কিছু হতো অন্দরমহল চত্বরে। আমাদের এত বড় এক যুক্ত পরিবারে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধাদির মতো সামাজিক ক্রিয়া যে প্রায়ই হতো সে কথা বলা বাহুল্য।

মণিপুর পাড়ার রথযাত্রা উৎসবে গ্রামের প্রায় সব মানুষ এসে জড়ো হতেন। রাজারাও সেখানে যেতেন, অবশ্য হাতি চড়ে। বর্ণনির্বিশেষে বহু লোক প্রভু জগন্নাথের রথ টানত ; তখন সমবেত জনতার উচ্চরোলে আর বিকট শব্দের বাজনা শুনে হাতিগুলো ভয় পেয়ে যেত। মাঝে মাঝে রথ থেকে ঘি মাখানো আস্ত নারকেল ছুঁড়ে দেওয়ার সাথে সাথে সেগুলো ঝাপটে ধরার জন্যে উপস্থিত লোকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যেত।

মুসলমানদের সামাজিক উৎসব খুব অল্পই দেখেছি, তাও স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টান গারোদের উৎসব উপভোগ্য ছিল, কিছু মনেও আছে।

হিন্দুদের নানা উৎসব বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত। নবজাতকের জন্মের আগে ও পরে অন্দরমহলে যে অনুষ্ঠান হতো তার কতই না বৈচিত্র্য ছিল! তখন পাটুনি ও সিকদার মেয়েদের নাচগান হতো। বয়স্ক পুরুষদের এ উৎসবে কখনও আসতে দেখিনি। শুধু স্থানীয় এবং রাজপরিবারের মহিলারা সে আনন্দ উপভোগ করতেন। অবশ্যই ছোট ছেলেমেয়েরা বাদ যেত না।

ষষ্ঠী আর শ্রাবণী ব্রত ছিল আমোদ প্রমোদে ভরপুর। শ্রাবণী ব্রত উপলক্ষে অন্দরমহল চত্বরে এক চাঁদোয়া খাটানো হতো। সেখানে শূদ্র আর সিকদার পুরুষরা নানা বাদ্য যন্ত্র নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হাতে লেখা পুঁথি থেকে পদ্মপুরাণ কাহিনী আগাগোড়া বাজনার সাথে সুর করে বর্ণনা করে যেতেন। যতদূর মনে হয় মালী, ধোপা, পাটুনি এমন কি নমঃশূদ্র দাসদাসীরাও এতে যোগ দিত। রাজবাড়ির মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে উৎসব দেখতেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিন চাঁদ সদাগরের সাজানো ডিঙি নৌকো মাথায় নিয়ে ঢোলের বাজনার সঙ্গে সারারাত নাচগান হতো, আর প্রায় প্রতি বছরই ঠিক সেদিন আকাশে মেঘ গর্জনের মধ্যে নামত মুষলধারে বৃষ্টি। সে উৎসবের ছন্দ, সুর, তাল আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে যেন কোন স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত। সে রাতটা আমরা প্রায় জেগে কাটাতাম। উৎসবের পরে শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে উৎসর্গ করা ভেড়ার মাংস ভোজ দিয়ে সমবেত গায়কদের যথারীতি ভুরিভোজের ব্যবস্থা হতো। স্থানীয় সেই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রচলিত সনাতন হিন্দু আচারের আশ্চর্য এক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত। সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে আঞ্চলিক নিম্নবর্ণ এমন কি আদিবাসীদের প্রচলিত রীতিনীতির অনেক উপাদান সহজেই মিশে গিয়েছিল।

ভাইফোঁটা উৎসবে আমরা কত আনন্দই না পেয়েছি ! কোন কোনও রানী সে সুযোগে তাঁদের ভাইদের দেখা পেয়েছেন। সেটা রানীদের ভাগ্যই বলতে হবে ! আমরা যখন বোনদের ফোঁটা নিতাম, তখন অবাক হয়ে দেখতাম যে, রাশভারী বড় ভাইদেরও বড় বোনরা ফোঁটা দিচ্ছেন। ভাইফোঁটায় বোনেরা বড় বেশী কর্মব্যস্ত থাকতেন। সন্দেশ মিষ্টি তৈরি করা থেকে ভাইফোঁটার সব উপকরণ সাজানোর কাজে তাঁরাই প্রধান অংশ নিয়েছেন। আমাদের কোন কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় রাজবাড়ি থেকে দূরে থাকতেন। তাঁদের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। ভাইফোঁটা উপলক্ষে আমরা তাঁদের বাড়িতে যাবার সুযোগ পেতাম। সেদিক দিয়ে এই উৎসব খুবই অর্থবহ ছিল। মনে পড়ছে যে, আমার মামার বাড়ি থেকে কেউ কখনও সুসঙ্গে আসেননি। কিন্তু পাঠ্যজীবনে কলকাতায় থাকতে আমার বৃদ্ধ মাতামহ শ্রী সূর্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় মাঝে মাঝে সুদূর বর্ধমানের কৃষ্ণবাটি থেকে মাকে দেখতে আসতেন। তখন প্রায়ই বারান্দায় বসে তিনি হুঁকো টানতেন আর হাসিমুখে সেকালের মনমাতানো গল্প বলতেন। আমরাও তন্ময় হয়ে শুনতাম।

রাজপরিবারে ছেলেদের অন্নপ্রাশনে আমোদপ্রমোদ, খাওয়াদাওয়া আর সাড়ম্বর মিছিল হতো। সে সময়ের সেই জাঁকজমকের কথা মনে পড়ছে। সে-উপলক্ষে শামিয়ানার নীচে শুধু পুরুষদের যাত্রাভিনয় হতো। মাঝে মাঝে ঢাকা, কলকাতা থেকে নামকরা নর্তকী বা বাঈজীকেও আনা হয়েছে। শামিয়ানার নীচে জরির নক্‌শা করা মখমলের মসলন্দ বিছানো হতো, রকমারি ঝাড়বাতি টাঙানো হতো, রাজপরিবারের পরিচয়-তক্‌মা আঁটা উপযুক্ত পোষাকে পাহারাদার আর আসা-সোঁটা বাহকরা যথারীতি হাজির থাকত। গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্টেটের আমলা, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি সকলের জন্যেই আসন নির্দিষ্ট থাকত। কর্মচারীরা যার যার আসনে বসতে সাহায্য করতেন। একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মহারাজা, রাজা বা রাজপরিবারের কেউ শামিয়ানায় ঢুকতেই উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেউ বসতেন না। ছোটদের বসার আলাদা জায়গা ছিল। সেখানে কেউ অশিষ্ট আচরণ করলে ভারপ্রাপ্ত ভৃত্যেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। মহারাজা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি স্থানীয় কোন প্রবীণ ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। ভৃত্যেরা মাঝে মাঝে গোলাপজল ছিটিয়ে দিত। আসরে ধূমপান করা, এমন কি পান খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। কেউ জোরে কথা বলতে পারত না। দর্শকদের ভিড় সংযত রাখার জন্যে চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকত। বিশেষ অধিকারে বাবার পাশে আমার আসনে বসে আমি আসর পরিচালনার যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখেছি সে কথা আজও মনে আছে।

আমাদের সমকালে সুসঙ্গে দুই কি তিনজন রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছে। সে-উৎসবে জাঁকজমক ও আমোদ যে যথেষ্ট হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তখন পাহাড়

প্রমাণ উপকরণ এসেছে। অবশ্য তার অনেকখানিই স্টেটের প্রজাদের স্বেচ্ছায় দেওয়া উপচার। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পরগণার সব মানুষ আর উপজাতি এসে রাজপরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কয়েক হাজার প্রজা পরিপূর্ণ ভোজ খেয়েছেন। রাজবাড়ির সেসব উৎসবে গ্রামে যে প্রাচুর্য দেখা যেত, শহরে তার দশগুণ মূল্যেও সে সমারোহ করা সম্ভব হতো না। এও উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের বাড়ির বিয়ে বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে রাজবাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় নানারকম সাহায্য পেয়েছেন।

আমাদের পরিবারে মেয়ের বিয়ের সময় অস্বাভাবিক খরচ হয়েছে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় বারোজন মেয়েকে কুলীন পরিবারে বিয়ে দেওয়া হয় এবং খরচ হয় প্রায় লাখ দেড়েক টাকা। একালের (১৯০০) মূল্য মানে সেটা প্রায় পাঁচ লাখেরও বেশী দাঁড়াবে।

এবার অন্দরমহল চৌহদ্দির বাইরে এসে হাতি চড়ে গারো পাহাড় উপত্যকায় ভ্রমণের কথা কিছু বলছি। তখন হাতির পিঠে বাবার পিছনে আমি আর আমার পিছনে মস্ত সাদা ছাতি মেলে ধরে এক ভৃত্য বসত। মাঝে মাঝে নদীর ধারে একটা বনের চারদিকে ঘুরিয়ে বাবা আমাদের দেখাতেন। সেখানে এক সময় রাজা বিশ্বনাথ সিংহ ফলের বাগান করেছিলেন। অতীতের সাক্ষী হয়ে তখনও সেখানে প্রকাণ্ড একটা চাঁপা ফুলের গাছ দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ঝোপেঝাড়ে খরগোশ শিকারের চমৎকার সুযোগ পাওয়া যেত। সময় সময় লেপার্ডও দেখা যেত। সোমেশ্বরী নদীর প্রবাহ পথ সেখানে তখন কিছুটা সংকীর্ণ কিন্তু গভীর ছিল। নদীর পাড় জুড়ে ছিল কাশবন এবং কাশবনের পরে ছিল বাঁশ ও ঝোপ-জঙ্গল। কালক্রমে নদী অনেক চওড়া এবং স্থানে স্থানে অগভীর হয়ে যায়। ফলে সেই রক্ষা বেষ্টনী নষ্ট হয়ে নদীর ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

পাহাড়তলীতে ফারংপাড়া, বাদামবাড়ি, নলুয়াপাড়া আর গোপালপুরে হাজং ও গারোদের বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি ছোট ছোট বস্তি ছিল। তাদের ভাষা, বেশভূষা আপন বৈশিষ্ট্যে আমাদের পরিবেশ রাঙিয়ে তুলত। মাঝে মাঝে হাতির পিঠে চড়ে ছোট ছোট টিলায় উঠতে গিয়ে আমাদের বড় আনন্দ হতো। তখন বাবা আর সঙ্গীয় লোকেরা কখনও কখনও বুনো মুরগী, উল্লা ময়ূর আর হরিয়াল পাখি শিকার করেছেন। শুধু শিকার নয় বনের নানা রকম পাখি, গাছপালা এবং ফলের পরিচয়ও বাবার কাছে পেয়েছি। এভাবেই ছেলেবেলা থেকে আদি-বাসীদের প্রকৃতি, রীতিনীতি, ভাষা, নানা পদ্ধতির চাষ ও ফলন সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। পরবর্তীকালে আদিবাসীদের সঙ্গে সহজে চলাফেরা করার সময় সেই শিক্ষা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে।

হাতি চড়ে সোমেশ্বরী নদী পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা আজও স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। অতিকায় এই প্রাণীদের বালির চর আর জল ভেঙে নদী পাড়ি দেওয়ার সময় আমরা বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হতাম।

একবার আমরা গারো পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় তিন মাইল দূরে ছোট এক টিলা[৪] দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা একেবারে জঙ্গলে ঘেরা ছিল। টিলার একেবারে পূবে শিখরের উপর এক জায়গায় একটা ভগ্নস্তূপ ছিল। বাবা সেখান থেকে নকশা করা সুন্দর কয়েকটা পোড়ামাটির ইঁট কুড়িয়ে আমাদের দেখান। আমরা শুনেছি যে, এককালে সেখানে এক শিব মন্দির ছিল। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পের আগেই অগ্নিকাণ্ডে সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 'দেশাবলী বিবৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে এই মন্দির এবং সংলগ্ন টোল সম্বন্ধে বিবরণ আছে। একদা খ্যাত সে মন্দির আর টোলের ভগ্নস্তূপ আজ সরীসৃপদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে আছে।

সুসঙ্গের আশেপাশে বনে জঙ্গলে অভিভাবকদের সঙ্গে আমিও যেতাম। আমার বয়স তখন কত ঠিক মনে নেই। মধ্যাহ্নে হাতি চড়ে আমরা যাত্রা করতাম আর ফিরতাম সন্ধ্যার কিছু আগে। তার মধ্যেই শিকার করা দু-একটা হরিণ (হগ্‌ডিয়ার), বুনো শুয়োর, তিত্তির (মার্শ পার্ট্রিজ) আর খরগোশ হাতির পিঠে বোঝাই করা হতো। আমাদের জমিদারী চৌহদ্দির মধ্যে এভাবে শিকার যাত্রার মাধ্যমে সে অঞ্চলগুলোর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। সেকালে সেসব স্থানে টিন-ছাওয়া কোন ঘর দেখেছি বলে মনে হয় না। এমনকি খড় দিয়ে চাল ছাওয়ার রীতিও খুবই বিরল ছিল। কারণ, তখন বিস্তীর্ণ 'ছন' বা তৃণভূমি ছিল। চাল ছাওয়ার উপকরণ হিসেবে তার বহুল প্রচলন ছিল। সে যুগে কাটা ধানের অবশিষ্ট অংশ খেতেই থাকত এবং পচে খেতের সার হতো। আজকাল একেবারে গোড়া থেকে ধান কাটা হয়; ফলে জমির উর্বরতার জন্যে খড় আর থাকে না। গ্রামবাসী মানুষ তখন মোটামুটি সুখী ও পরিতৃপ্ত ছিল, কখনও কোন ভিখারী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম বৈষ্ণব ভিক্ষুরা। তাঁরা ধর্মীয় রীতি অনুসারে ভিক্ষার অন্নে জীবন চালাতেন। মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণবীরা মাঝে মাঝে অন্দরমহলে ভিক্ষা করতে এসে মন্দিরা আর খঞ্জনি বাজিয়ে রাধাকৃষ্ণের দৈব প্রেমসঙ্গীত শোনাতেন এবং ভিক্ষার চাল তাঁদের সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝুলিতে ঢেলে নিতেন। এঁদের দেখে কেন জানি না আমার অনুকম্পা হতো। অথচ যে কোন পন্থের বাউল বা গাজী আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছেন। মনে পড়ে ভাট বা চারণকবিরা রাজবংশের ইতিহাস এবং সাময়িক ঘটনাবলী থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তাঁদের স্বরচিত সঙ্গীতে কেমন দ্রুত লয়ে গান গেয়ে শোনাতেন। মুসলমান গাজীরা হিন্দু দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করে উপস্থিত শ্রোতাদের পবিত্র চামর দিয়ে স্পর্শ করতেন। হিন্দুরাও কোন দ্বিধা না করে তাঁদের সমাদর করেছেন।

পরবর্তী কালে শিকারে গিয়ে স্থান বিশেষে আমি গাজী বা পীরের দরগায় পুজো দিয়েছি। কারণ আঞ্চলিক জনশ্রুতি ছিল যে, তাঁরা বন্যপ্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে সব পশুপক্ষীকে রক্ষা করেন এবং শিকারীদের সব চেষ্টাই বিফল

হয়। এমন ধরনের জনশ্রুতি হয়তো আমার কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাতে আমার বিশ্বাস করার কোন ঝোঁক ছিল না। ভূতের গল্প বা অলৌকিক কাহিনী যাঁরা বিশ্বাস করেন আমাকে সে দলে টানলে অনেক শিক্ষিত মানুষের মতোই আমিও লজ্জাবোধ করব। যা হোক, একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার অস্বাভাবিক রকম বড় একটা বাঘকে শিকারের পক্ষে সুবিধেজনক অবস্থায় পেয়েছিলাম ; কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। শুনেছি গাজীর জন্তু নামে সেই বাঘের খ্যাতি ছিল। আদিবাসীদের মায়াবিদ্যাধর 'দেওসি', 'কামাল', 'গাজী' বা 'পীর'-কে উপযুক্তভাবে পরিতৃপ্ত করলে বনে-জঙ্গলে শিকারে ভাল ফল পাওয়া যায়। বলা চলে এটা আমার যুক্তিবহির্ভূত ধারণা।

বাঘমারা আর মাচ্ছি ঘাটের মাঝামাঝি স্থানে সোমেশ্বরীর স্রোতে আবর্ত সৃষ্টি করে 'দেওশিলা' নামে প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঁই জেগে আছে। সেটা সুসঙ্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। গারোদের বিশ্বাস ছিল যে, সেই শিলাখণ্ডের উপর থেকে এক জোড়া সাদা পায়রা ছেড়ে দিলে তারা উড়ে এসে আবার সেখানে বসলে হাতি খেদায় ভালো ফল পাওয়া যাবে। তাদের সেই বিশ্বাসে আমাদের কতোই না আস্হা ছিল ! বাউসাম সমতটে একবার শিকারের ছাউনি হয়। সেবার শিকারে যাওয়ার আগে মাহুতদের এক জমাদারের কথা মতো সেখানে মহিষ বাথানের কাছে একটা শিমুল গাছের নীচে এক পীর সাহেবের দরগায় একান্ত শ্রদ্ধায় শিরনি দিয়েছি। ১৯২২-২৩ সালে আমি গারো পাহাড়ে প্রথম হাতি খেদার চেষ্টা করি। সে-উপলক্ষে খেদা-পরিচালক প্রধান গারো সর্দার দেওশিলাতে উৎসর্গের জন্য এক জোড়া সাদা পায়রা, এক জোড়া সাদা মুরগী আর একটা সাদা পাঁঠা চাওয়ায় কিছুটা বিস্মিতই হয়েছিলাম। গারো পাহাড়ে কোন 'নক্‌মা' অর্থাৎ স্হানীয় ভূস্বামীর এলাকায় হাতি খেদার 'স্টকেড্' বা খোঁয়ার তৈরির সময় স্হানীয় বনদেব বা দেবীকে তুষ্ট করার জন্য 'মারাং' উৎসর্গ করার প্রথা আমরা মেনে চলতাম। গারো পাহাড়ে আমরা একবার 'বালপাক্রামে'র সুপরিচিত মালভূমি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক পাহাড়ে কোন জায়গায় নৌকোর আকৃতি একটা পাথর ছিল। সেটা দেখিয়ে গ্রামের নক্‌মা আমাকে বলেছিলেন যে নৌকোটা রামের, লক্ষ্মণ সেখানে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকাণ্ড এক গুহাও সেখানে দেখেছি। প্রায় শ'খানেক লোক অনায়াসে সেখানে শুয়ে থাকতে পারে। গারোদের বিশ্বাস সেটা হচ্ছে 'মিমাং' বা মৃত্যুদেবতার মুখ ; মৃত্যুর পর আত্মা একদিনের জন্যে সেখানে থাকেন। সেখান থেকেই আত্মা শেষ বিশ্রামের জন্যে চলে যান 'চিকমাং' বা কৈলাস (গুণেশ্বর) শিখরে, শিবের আলয়ে। সুসঙ্গ রাজ্যের ভূতপূর্ব অঞ্চল গারো পাহাড়ের এত অভ্যন্তরে গারোদের মতো আদিবাসীরাও হিন্দুদের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত থেকে কিছু উপাদান আত্মস্হ করেছেন এটাই লক্ষণীয়। আমাদের গ্রাম্যজীবনে 'পবন' বা 'নদী'র দেবদেবীকে তুষ্ট করার বৈশিষ্ট্য এতই সার্বজনীন যে, সেটা কোন্

সম্প্রদায়ের পুজো সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুসঙ্গবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মানুষ যেন এক পরিবারভুক্ত ছিলেন। উত্তরজীবনে মুক্ত চিন্তা থেকে আমি এ সত্য অনুভব করেছি।

সুসঙ্গে নানা জাতি ও আদিবাসীর মধ্যে আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শোভন রীতির কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছেলেবেলায় চোখে পড়েছে। আমার মন বেদনায় ভরে গিয়েছে। একদিনের ঘটনা মনে আছে। তখন আমার বয়েস ন'বছর। সেদিন আমি এক গ্লাস জল খেতে চেয়েছিলাম। তাতে আমাদের সাবেক আমলের হালচাল দুরস্ত পুরোনো এক ভৃত্য জল আনার আগে বারান্দায় উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, নিম্নবর্ণের হিন্দু আর মুসলমানদের বাইরে যেতে বলেছিল।

আমাদের ছোটকাকার বিয়ে হয়েছিল ঢাকা শহরে। সেটা ১৯০৩ বা ১৯০৪ সালে। সেকালে নদীপথে সোমেশ্বরী দিয়ে সহজে ব্রহ্মপুত্রে যাওয়া যেত। ঠিক হয়েছিল যে, বরযাত্রী দল নদীপথে প্রথমে যাবেন মৈমনসিংহে এবং পরে বাকি পথ যাবেন ট্রেনে। বাবা, দুই কাকা, ঠাকুমা, পরিবারের মেয়েরা আর আত্মীয়, আমলা, পাইক, বরকন্দাজ, ঢাকী, নকিব, নাবিক আব দাসদাসীদেব মস্ত বড় এক বরযাত্রীদল নিয়ে বজরাগুলো যখন যাচ্ছিল, তখন ঢাকীরা ঢাক বাজিয়ে সে-খবর ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমাদের বজরা আব সঙ্গের সব নৌকোর মাঝি হিন্দু হলেও তারা অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য ছিল। তবু নৌকোর মধ্যে রান্না বা খাওয়ার ব্যাপারে তাদের উপস্থিতি কোন উদ্বেগের হেতু হয়ে দাঁড়ায়নি। অবশ্য বিধবারা শুচিতার কঠিন শাসন মেনেই চলেছেন। তাঁদের রান্না খাওয়ার জন্যে বজরা তীরে ভিড়িয়ে, একটা জায়গা গোবর জলে নিকিয়ে সেটা তখনকার মতো ঘিরে দেওয়া হতো। আমার প্রথম জীবনে দেখেছি যে, রাজবাড়ির এবং স্থানীয় বিধবা মহিলারা বিভিন্ন উপবাসের দিন জলবিন্দুও গ্রহণ করতেন না এবং পরদিন স্নান সেরে, পুজো করে, নিজ হাতে কাটা ফল, দুধ বা ছানা খেতেন। তাঁরা যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন কিন্তু সূর্যাস্তের পর পক্বান্ন কখনও খেতেন না। তাঁদের পান খাওয়া রীতিও ছিল না। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বিধবাদের জীবনযাত্রা সম্ভ্রান্ত শূদ্র মহিলাদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। সেকালে কোন বিধবার বেশভূষা বা চালচলনে অসামঞ্জস্য দেখা গেলে তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হতো। তাঁরা সাদা থান ধুতি আর চাদর ব্যবহার করতেন। সেলাই করা ব্লাউজ ইত্যাদি অচল ছিল। পরবর্তীকালে প্রচলিত অনেক রীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে; রাজপরিবারের বিধবাদের মধ্যে অনেকেই সেদ্ধ, সেঁকা বা বা ভাজা ছাড়া, একাদশীতে আজকাল, সব কিছু, এমনকি দোকানের মিষ্টি, সন্দেশও খান। প্রায় সকলেই চা বা পানও খান। আমার বাবার খুড়তুতো এক

বিধবা বোন প্রায় পরিণত বয়েসেই রেজিস্ট্রি করে আবার বিয়ে করেন। আমাদের পরিবারে বিধবার বিয়ের নজির এই প্রথম।

রাজপরিবারের মেয়েরা পরদা প্রথার কঠিন নিয়মে ঘেরাটোপের পাল্কি চেপে বজরা থেকে ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়াগাড়ি থেকে রেলগাড়ি এবং রেলগাড়ি থেকে একেবারে স্টিমারে উঠেছেন। বাইরের উৎসুক দৃষ্টি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি। আরোহিণীদের নিয়ে পাল্কিগুলো স্টিমারের সিঁড়ি দিয়ে ডেকে তোলার বিচিত্র কায়দাটা মনে রাখার মতো দৃশ্য হয়েছিল। তাঁদের উপর ঝাঁকুনির চোট আর শারীরিক পীড়নের কথাটা একবার ভেবে দেখুন! পাল্কি-গুলো কখনও যাচ্ছিল মেঝে থেকে কিছুটা উঁচুতে সমান্তরালে, কখনও একদিকে কাৎ হয়ে, আবার কখনও-বা একেবারে খাড়াখাড়ি হয়ে!

কৌতুকের এ-ধরনের ঘটনা ছাড়া প্রথম ঢাকায় যাওয়ার কথা আমার তেমন মনে নেই। কিন্তু আমাদের নতুন ছোট কাকিমা অর্থাৎ যুবক ছোটকাকার স্ত্রীর কথা মনে আছে। কারণ, মাত্র দশ বছর বয়েসে নূতন বালিকা বধূ হয়েও তিনি সহজেই আমাদের খেলার সাথী হয়েছিলেন এবং বাড়ির প্রবীণাদের সামনে চোখের নীচে ঘোমটা টেনে বালিকা বধূ হিসাবে নিজেকে কেমন করে ফিটফাট ভাবে মানিয়ে নিচ্ছেন তা দেখে আমরা খুব আমোদ পেতাম। মাঝে মাঝে আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর বালিকাসুলভ কোন ত্রুটি ধরে দিলে তিনি তখনই হালে-আয়ত্ত-করা রাশভারী ভূমিকাটা আবার শুধরে নিতেন। অবশ্য এতবড় পরিবারে এমন অরসিকা মহিলাও ছিলেন যাঁদের সমবেদনাহীন আচরণে তাঁকেও মাঝে মাঝে বেগ পেতে হয়েছে বইকি!

একবার ঢাকায় আমাদের বংশের রাজা রঘুনাথ সিংহের স্থাপিত রঘুনাথজীউ বা রামসীতার মন্দির আমরা দেখেছি। সে-মন্দির রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সমকালীন। অধুনা ঠাঠারি বাজার, উয়ারি আর টিকাটোলী নিয়ে রঘুনাথপুর নামে পরিচিত ঢাকা শহরের মস্ত বড় এক অঞ্চল একদা সুসঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল।

ছেলেবেলায় আর-একবার সুসঙ্গের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে আছে। সেটা ছিল ১৯০৫ সাল। সেবার আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস সাত বছর। তবু অস্পষ্টভাবে আমি আঁচ করেছিলাম যে, পারিপার্শ্বিক হাওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে। কারণ, 'সুনিয়ন্ত্রিত' ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে কিছু লোক সোচ্চার হয়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল সর্বশক্তিময়ী মহারানী ভিক্টোরিয়া সাক্ষাৎ দেবীরূপে আমাদের দেশটা শাসন করছেন। প্রচলিত নিয়মে আমার বাবা আর পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিরা যথার্থই রাজভক্ত নাগরিক ছিলেন। তাই সেবার লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব আমাদের উপর যাতে না পড়ে সেদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। গুরুজনদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে সেই ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা

আরও বেড়েছিল। আমাদের অস্পষ্ট এক ধারণা হয়েছিল যে, সৎ সাহসী কিছু লোক শক্তিশালী ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশে এক হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছেন। ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের হাত থেকে গারো পাহাড় ছিনিয়ে নেওয়ায় ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সম্বন্ধে এক বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস না পেলেও সে-আন্দোলনের প্রতি আমার গোপন সহানুভূতি বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আমি একরকম দোটানা ভাব পোষণ করেছি। তাঁদের পারিপাট্য আর শৃঙ্খলা আমার ভাল লাগত কিন্তু তাঁদের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপকে বেশ ভয়ের চোখেই দেখতাম। তাই আন্তরিক ভাবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা কামনা করলেও সুসঙ্গ রাজপরিবারের মানুষ হিসাবে আমার স্বাধীন আনুগত্য প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট বাধা ছিল।

১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে আমার ছেলেবেলায় দেখা রাজবাড়ির অস্থায়ী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আগে দিয়েছি। পরে ১৯০৪-০৫ সালে রাজবাড়ির সংস্কার হতে দেখেছি। তখন মস্ত এক বৈঠকখানা তৈরির কাজ শুরু হয়। সে কাজে গারো পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল খুঁটি আসে। মাটি কাটার কাজ করত বিহারী নুনিয়ার দল। জ্যান্ত রোলারের মতো গোটা বার হাতিকে পা দিয়ে চেপে ভিতের মাটি সমান করার কাজে লাগানো হয়। আমাদের কাছে সেটা খুবই মজার দৃশ্য ছিল। রাজমিস্ত্রীর কাজের জন্যে মস্ত এক চৌবাচ্চা তৈরি হয় আর তার মধ্যে রাশি রাশি সুপুরি আর মশলা ঢেলে ফেলা হয়। ব্যাপার দেখে আমরা তো অবাক! কয়েক দিন বাদে সেই সুপুরি আর মশলা জল থেকে ভেজা ইঁট তুলে গাঁথুনির কাজ শুরু হয়ে যায়। ঢাকা থেকে অনেক নমঃশূদ্র ছুতোর মিস্ত্রী আসে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিস্ত্রীর নাম ছিল অক্ষয়। ছুতোর মিস্ত্রী হিসাবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর মধ্যে দেখেছি নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা এবং প্রখর বুদ্ধি। নারায়ণগঞ্জ হয়ে নৌকোয় করে একেবারে রেঙ্গুন থেকে সেগুন কাঠ আসে। দরজা-জানালার জন্যে খুব দামী রকমারি বিদেশী শার্সির কাঁচ, নাট, বল্টু ইত্যাদি কলকাতা থেকে আনানো হয়। সেকালে সে কাজ কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। কারণ তখন মৈমনসিংহ থেকে হয় গোরুর গাড়ি, নয় নারায়ণগঞ্জ থেকে নৌকোয় সব জিনিস আসতো। বাড়ির ভিত তৈরি হয়েছিল প্রায় চার হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে। তিনতলা টিনে ছাওয়া মস্ত সেই বৈঠকখানার মাথায় ছিল সুন্দর এক চূড়া। ভিতের উপর কাঠ আর কাঁচ দিয়ে মিস্ত্রীরা ধীরে ধীরে কেমন করে একটা কাঠামো দাঁড় করাচ্ছে সেটা দেখাই ছিল আমাদের বিস্ময়ের মস্ত বড় এক উৎস। স্থানীয় লোক বৈঠকখানার নাম দিয়েছিল 'রঙমহল'। শুধু সুসঙ্গ পরগণা নয়, সারা মৈমনসিংহের মানুষের কাছে 'রঙমহল' হয়েছিল আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। ১৯১০ সালে বাড়ি তৈরি শেষ হলে বাবা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মহামহোপাধ্যায়

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানার জন্যে কলকাতা থেকে সমস্ত আসবাব ও আলোর সাজ কেনেন। বলতে গেলে তখন থেকেই কলকাতার প্রচলিত গৃহসজ্জার রীতি সুসঙ্গ রাজপরিবারে অনুপ্রবেশ করে। বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে গিয়ে সুসঙ্গের প্রাচীন আভিজাত্যে হয়তো এভাবেই বাইরের প্রভাব এসে পড়ে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রঙমহল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই সুসঙ্গে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রসঙ্গত, রাজপরিবারের 'দরবার গৃহ' হিসাবে মধ্যম বাড়ির সুন্দর যে বাংলোবাড়িটা এতদিন ব্যবহৃত হয়েছে সেটা ভেঙে ফেলা হয়। এবার সাবেক হালচাল যে বিদায় নিচ্ছে সে-আভাস যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আবার রঙমহলে ফিরে আসছি। তার উত্তরে ছিল ছোটখাটো এক চিড়িয়াখানা। সেখানে সারস, ময়ূর, ফেজান্ট, বড় ও ছোট জাতের দেশী এবং বিদেশী টিয়া, ফিঞ্চ, সাদা হরিণ, চিতল হরিণ, বার্কিং হরিণ, উল্লুক, হিমালয় ও মালয়ী ভালুক, প্যাঙ্গোলিন, উদ্‌বিড়াল, রাজধনেশ, চিতাবাঘ ও বড় বাঘ প্রভৃতি স্থানীয় এবং বিদেশী নানারকম পশুপাখি ছিল। সুসঙ্গের অষ্টমী মেলা উপলক্ষে জনসাধারণের জন্যে রাজবাড়ির প্রবেশ পথ খুলে দেওয়া হতো। তখন তারা দলে দলে এসে রঙমহল আর চিড়িয়াখানা দেখত।

সাবেক বৈঠকখানার পরিবর্তে নতুন বৈঠকখানা বা রঙমহলের প্রতিষ্ঠা হলেও অন্দরমহলের তখন পর্যন্ত তেমন কিছু বদল হয়নি। শুধু তিন রাজবাড়ির সীমা বরাবর সেকেলে বাঁশের বেড়াগুলো ভেঙে মজবুত পাকা দেওয়ালের উপর লোহার খুঁটিতে টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছিল।

১৯১১ সালে বিশেষ এক শুভদিনে কলকাতায় আমার উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। আমি আগেই কলকাতার এক হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সে-উপলক্ষে আমাদের কলকাতার বাসাবাড়ি বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। পিসীমা আর খুড়তুতো ভাইরা সবাই সেখানে ছিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় সব বোনেরাও এসেছিলেন।

আমার অভ্যস্ত জীবনধারার নতুন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উত্তরণ সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। কারণ কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবনে উপনয়নের তাৎপর্য যে কত সে কথা বাবা আগেই আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ সন্তান পাঁচ বছর বয়েসেই গুরুগৃহে গিয়ে কঠিন দৈহিক ও মানসিক শিক্ষা ও শাসন মেনে চলত। জীবনের সে পর্যায় ছিল 'ব্রহ্মচর্য'। ব্রহ্মচর্য মানুষের জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠা করত এবং পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন সংযমী যুবক স্বাবলম্বী হয়ে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের অধিকার পেত। অতীতের বার বছরের সেই কঠিন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আর শিক্ষা ক্রমে সংক্ষিপ্ত হতে হতে নিয়মরক্ষার প্রতীক হিসাবে শুধু তিন থেকে এগারো দিনের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে।

একালের উপনয়ন অনুষ্ঠান এত সংক্ষিপ্ত হলেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন শুদ্ধ-ব্রাহ্মণ হয়ে জীবনে শিক্ষার আদর্শ মেনে চলতে পারি।

যথারীতি সে-অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আগের দিন আমিও অধিবাস পালন করে একবেলা মায়ের তৈরি বিশুদ্ধ খাবার খেয়েছি। ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ বালক সন্ধ্যার আগে দিনে একবারই খেতে পারে। যা হোক, উপনয়নের আগের দিন ঠিক সন্ধ্যার মুখেই আকাশে হঠাৎ মেঘের ডাক শোনা গেল। ফলে কলকাতার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা একমতে বিধান দিলেন যে, পরদিন উপনয়ন অসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অতএব সব ব্যবস্থাই পণ্ড হয়ে গেল।

সে-ঘটনায় আমি যে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবার শুভদিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। দ্বিতীয় বার উপনয়নের দিন ঠিক হলো এবং অনুষ্ঠানের বাহুল্য অনেক কমানো হলো। কিন্তু সেবারও হঠাৎ এমন বৃষ্টি হলো যে, তাতে গব়ুর খুব ডুবে যায়। পণ্ডিতদের মতে সে-লক্ষণও অশুভ। সুতরাং অনুষ্ঠান আবার বাতিল হলো। পরপর এমন ব্যত্যয় ঘটায় মা, বাবা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, শাস্ত্র অনুসারে আর এক বছরের মধ্যেই আমাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, নয়তো আমি ব্রাত্য হয়ে যাব।

বাবার মন ভেঙে গেল। তাঁর ভয় ছিল যে তৃতীয় বারেও কোন কারণে যদি বাধা আসে তবে আমার পক্ষে এক সংস্কারহীন ব্রাহ্মণ হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। সে-অবস্থার কথা চিন্তাও করা যায় না ; যেহেতু আমাদের পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ বাবা তখন বাঙলা দেশে ব্রাহ্মণ সমাজের নায়ক। তিনি এতই অভিভূত হলেন যে, শিক্ষার জন্যে অগত্যা আমাকে বিলেতে পাঠাবার বাসনাও ব্যক্ত করলেন। অবশ্য তাঁর মতো মানুষ চূড়ান্ত হতাশা থেকেই যে তেমন কল্পনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বিলেতযাত্রায় সেকালে জাত যেত।

যা হোক, তৃতীয় বা শেষবারের অনুষ্ঠান সার্থক হলো। সেদিন যাবতীয় করণের মধ্যে মুণ্ডিত শিরে, কর্ণবেধ করে সোনার কুণ্ডল পরে, দণ্ডী আর ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে, ব্রহ্মচারীর বেশে বিচিত্র এক অনুভূতির মধ্যে আমার অভ্যস্ত জীবনধারা পরিবর্তনের আভাস পেয়েছিলাম। আমার আচার্যগুরু ছোটকাকা আমাকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। অনুষ্ঠানের শেষে আমি প্রথমে মা, পরে বাবা এবং উপস্থিত স্বজন ও অভ্যাগত ব্রাহ্মণদের ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। তাতে ফল, দুধ, আতপচাল, গব্যঘৃত ইত্যাদি উপকরণে ঘরটা ভরে যায়। ভিক্ষার ঝুলিটা বোঝাই হয়েছিল ব্রাহ্মণ কন্যাদের হাতে কাটা পৈতা আর সোনারুপার টাকায়। অতঃপর নির্জন বন্ধ একটা ঘরে কুশের উপর বিছানো এক কম্বলের শয্যায়, মায়ের নির্দেশে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে শাস্ত্রবিধিমতো তিন দিন বাস করেছি। তখন আচার্যগুরুর সাহায্যে নির্ভুল ভাবে ত্রিসন্ধ্যা করেছি, বাবাও উপস্থিত থেকেছেন। সন্ধ্যার মন্ত্রগুলো বাবা আমাকে সুস্পষ্ট ভাবে লিখে দিয়েছেন। তাছাড়া সর্বজনপূজ্য শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের দেওয়া সেই 'সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি' বইখানা শেষ জীবনেও ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। তৃতীয় দিন ভোরের আলো ফোটার আগে আমার দণ্ডী ও ঝুলি গঙ্গায় ভাসিয়ে, স্নান করে গেরুয়া বসন ছেড়ে আগের মতোই আবার ধুতি চাদর পরেছি।

উপনয়নের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য জীবনের দীক্ষা অধিকার আমি আন্তরিক ভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। কালের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার বহু প্রলোভন থেকে আহার্য ব্যাপারের মূলনীতি আমি আজও সাধ্যমতো মেনে চলি। আপাতদৃষ্টিতে এ-ধরনের সংযম নেহাৎই এক খেয়াল মনে হতে পারে। কিন্তু আমার পরিবেশ এমন এক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, হতাশায় মন ভেঙে গিয়েছে। সে-অবস্থায় আমার একমাত্র অবলম্বন গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি আমাকে রক্ষা করেছে। গায়ত্রী ছন্দের মধ্যে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগসূত্র আমি যেন অনুভব করি!

১৯০৬ সালে বারাণসীতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বারেন্দ্র জমিদার তাহিরপুরের রাজাবাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে আমার চতুর্থ-ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে সুসঙ্গ থেকে মস্ত এক কন্যাযাত্রী দলের সঙ্গে আমিও সেখানে যাই। তখন আমার বয়েস আট বছর। বিয়ের পরে ফেরার পথে ঠিক হলো যে, কলকাতায় থেকেই আমি পাঠ্য জীবন শুরু করব। আমার সুসঙ্গে ফেরা হলো না। মা, বাবা আর ঠাকুমার সঙ্গে কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীটের এক ভাড়াবাড়িতে আমিও থেকে গেলাম।

পিতৃবন্ধু এবং পরিবারের শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে আমার ঠাকুর কাকা একদিন আমাকে হিন্দু স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। স্বনামখ্যাত রায়বাহাদুর রসময় মিত্র মহাশয় তখন হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেদিন তাঁর সেই স্নেহপূর্ণ আচরণের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে। সেটা ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। স্কুলের নিয়ম কানুনে বেশ কড়াকড়ি ছিল। তবুও স্কুলের জীবন বেশ ভালোই লাগছিল। ইংরেজিতে আমি ভালই ছিলাম, ড্রইংয়েও কৃতিত্ব দেখিয়েছি; কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি প্রথম থেকেই ভয় ছিল। যা হোক, ক্লাসে ভাল পরীক্ষা দেওয়া, ভদ্র আচরণ করা এবং বাড়ির সুনাম রক্ষা করার ব্যাপারে বাবা আমার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। পরীক্ষায় আমি মোটামুটি ভালই ফল পেয়েছি এবং নিয়মিত উপস্থিতি ও ভদ্র আচরণের জন্যে পুরস্কারও পেয়েছি।

ছাত্রজীবন থেকে পশুপাখির পরিচর্যা, বাগান করা এবং ছবি আঁকার অনুরাগের উৎস ছিলেন বাবা নিজে। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে জ্ঞানের জটিল তত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। মাঝে মাঝে আমাকেও সে আলোচনা শুনতে বলতেন। এভাবেই কলকাতার প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণিদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তৎকালীন 'রক্ষণশীল' এবং 'প্রগতিবাদীদের' বহু

সমস্যা সম্বন্ধেও আমার অস্ফুট ধারণা হয়। সে-আলোচনা সভায় আমাদের প্রচলিত শিক্ষা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহারিক সমন্বয় রেখে পাশ্চাত্য জ্ঞান ধারার মূল্যায়নের দিকটাই সাধারণত প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে সে বছরই জুন সাসে আমি সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হই। বলা বাহুল্য যে, আমি 'আর্টস' বেছে নিয়েছিলাম, যেহেতু গণিতশাস্ত্রে আমার ভয় ছিল। তর্ক আর দর্শনে আমার অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাবার ইচ্ছাতেই আই এ পর্যন্ত অঙ্ক, ন্যায়শাস্ত্র এবং সংস্কৃত নির্বাচন করতে হয়।

আমার ছাত্রাবস্থাতেই দেশে জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। দেশের ভাবীকালের 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার চেয়ে দু বছর এগিয়ে ছিলেন। বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ কিংবা সুভাষ বসুর মতো রাজনীতিবিদদের অগ্নিগর্ভ বাণী গোড়ার দিকে আমার মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু তাঁদের মতবাদে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। বরঞ্চ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোখলে বা আশুতোষ মুখার্জী মহোদয়দের উদারনৈতিক এবং গঠনমূলক ভাবধারার দিকেই বেশী ঝুঁকেছিলাম।

আমি যখন যুবক, প্রায় তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করেছি। কিন্তু তার দুটো দিক আছে। তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত আমার অপার আনন্দ এবং প্রেরণার উৎস। কিন্তু মনে হয়েছে যে, তাঁর অতি সংবেদনশীল কৃষ্টির প্রভাব সেকালে যুব সমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কারণ, তাঁরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ না করে শুধুই তাঁর অনুকরণ করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর চারপাশের ভিড়ে আবেগপ্রবণতাই প্রকাশ পেয়েছে, স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা প্রায় দেখা যায়নি।

স্মৃতিচারণ : 'মধ্য'

১৯১৬ সালে বাবার মৃত্যুতে আমাদের পরিবারে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব যে কত ব্যাপক ছিল তাঁকে হারিয়ে পরিবারের সকলেই তা অনুভব করেছিলেন। আমাদের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির সম-অংশীদারদের অবিরাম মনোমালিন্য এড়াতে গিয়ে বাবা ১৯০[illegible] সাল থেকে প্রায় একটানা ভাবে কলকাতাতেই বাস করেছেন। অবশেষে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে তিনি বাধ্য হয়ে ১৯১৬ সালে জুলাই মাসে সুসঙ্গে ফিরে যান।

মনে আছে প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ-র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাসে সেদিন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনছি, এমন সময় কেউ একজন এসে আমার হাতে ছোট এক

টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এস।' কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই খবর পেলাম যে বাবা খুব অসুস্থ। সপ্তাহখানেক আগেই তাঁর চিঠি পেয়েছি। কেন জানি না মনে হলো যে সেটাই বাবার শেষ চিঠি। মন অবসন্ন হয়ে গেল আর দুচোখে জলের ধারা নেমে এল। অশুভ সেই চিন্তা থেকে মুক্ত হতে গিয়ে তাঁর লেখা সব চিঠি আমি তখন ছিঁড়ে ফেললাম। বোধ হয়, বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কা আমার অবচেতন মনকে এভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। ফলে, যাঁকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করেছি, তাঁর সব মূল্যবান চিঠিগুলোই আমি হারালাম। আমার কাছে বাবা ছিলেন মহত্ত্ব, পবিত্রতা এবং মর্যাদার আদর্শ প্রতিমূর্তি।

আমাকে সেদিনই সুসঙ্গ যাত্রা করতে হবে। তখন কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে সুসঙ্গ যেতে প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা সময় লাগত। সোজাপথে যে দূরত্ব মাত্র তিনশ মাইলের মতো, সেটা পাড়ি দিতে সেকালে আমাকে রেল, স্টিমার, ঘোড়াগাড়ি খেয়ানৌকো, হাতি সব রকম যান ব্যবহার করতে হয়েছে; আর একালে আমার ছোট ছেলে বিমানপথে দিল্লী হয়ে মস্কো গিয়েছিল মাত্র ন' ঘণ্টায়, কালে কালে কতো পার্থক্য!

তৃতীয় দিনে রাত প্রায় নটায় সুসঙ্গে পেঁছেই মনে হলো যেন সারা বাড়ি জুড়ে আসন্ন মৃত্যুর এক ছায়া পড়েছে। বাবার কাছে যেতে অনেক দেরি হয়েছিল। তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম যে, ব্যাকুল হয়ে তিনি আমাকেই খুঁজেছেন, উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। অস্ফুট স্বরে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। আমাকে তিনি চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তিনি সাধ্যমতো আমাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কারণ, আগামী কালের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে আমাকে দাঁড়াতে হবে। তাই আসন্ন বিদায়ক্ষণে তাঁর একমাত্র ভাবনা ছিল মা আর আমাকে নিয়ে। আমরা তখন এক অনিশ্চিত অবস্থায় ছিলাম, আগামী পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হইনি। তবুও তিনি আমাকে শেষ অমূল্য উপদেশ দিয়ে বললেন, 'কখনও উদ্ধত হয়ো না; গুরুজনকে সম্মান করো।' একজন আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর মতোই বাবার প্রতি মায়ের ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। মাকে বল্লেন, 'ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে সব সহ্য করবে।' তাঁর রোগজীর্ণ নশ্বর সত্তা আর সজাগ মনের ছবি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

পরদিন রোগ আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর অন্তিম সময় সম্বন্ধে চিকিৎসকগণও নিঃসন্দেহ। সে অবস্থায় সেই মৃত্যুশয্যায় থেকেই বাবা খবর পেলেন যে, সুসঙ্গের যৌথ স্টেট ভাগ হয়ে অংশীদারদের যার যার অংশ কালেক্টরিতে পৃথক স্টেট হিসাবে রেজিস্ট্রি করার অনুমতি হয়েছে। সে সংবাদে বাবা মর্মান্তিক আঘাত পান। কারণ, স্টেটকে সমবায় ভিত্তিতে বাঁচিয়ে রাখার সব চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু পরিবারে শক্ত মানুষ, তাঁর খুড়তুতো ভাই প্রমোদচন্দ্র, কোন

আপোস মীমাংসার বিপক্ষে ছিলেন। শেষ রক্ষার চেষ্টায় বাবা তাঁর সঙ্গে আর একবার কথা বলতে চান এবং প্রমোদচন্দ্র মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালে প্রায় ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে বললেন, "ঝগড়া করে পরিবারের মর্যাদা নষ্ট করবেন না।" কূটনীতিজ্ঞ হলেও প্রমোদচন্দ্র তখন বিচলিত হয়েছিলেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়কে 'মায়ে'র স্তুতি পড়ে শোনাতে বললেন। বাগচী মহাশয় উত্তরজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট Honoris Causa উপাধি পান এবং তৎকালে বড়লাট বাহাদুর প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৯১৬ সালের ১৬ই অক্টোবর রাত প্রায় দশটায় এক শুভক্ষণে দেবী দুর্গার বোধন শুরু হলো। ঠিক তখনই গীতার কিছু শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ছশো বছরের উপর সুসঙ্গ রাজপরিবারের সেই অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির আলোর ধারা তিনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বে রক্ষা করে চলেছিলেন। অবশেষে সুসঙ্গ তাঁকে হারাল। সে খবর পেয়ে পরগণার দূরদূরান্তের মানুষ সে রাত্রে দলে দলে এসে রঙমহলের সামনে নীরবে ভিড় করেছিলেন। ইতিমধ্যে প্রবল বাতাসের সাথে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হলো। তবু যথারীতি ঊষাকালের আগেই, সৎকারের জন্য মৃতদেহ চিতায় সাজিয়ে ভোরের আগেই সুসঙ্গের শেষ মহান মহারাজাকে সোমেশ্বরী নদীতটে ভস্মীভূত করা হলো। সেদিন পরগণার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং বিভিন্ন উপজাতির মানুষ ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একত্রে মিলেমিশে তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয় মহারাজার আত্মার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় মনোবেদনা জানিয়েছিলেন, তা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। কারণ, সেযুগে প্রচার বা আড়ম্বর দেখানোর কোন রীতি ছিল না।

কুমুদচন্দ্রের অন্তঃকরণ এবং পাণ্ডিত্য নিকট ও দূর লোকসমাজে যে অপরিমেয় স্বীকৃতি পেয়েছিল তার আভাস কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। পরলোকগত মহানুভব ব্যক্তির গুণাবলী সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত প্রশংসা এবং শোকসন্তপ্ত পরিজনদের উদ্দেশ্যে দেশের গভর্নর থেকে শুরু করে অপরিচিত সাধারণ লোক সমবেদনা জানিয়ে যে হার্দ ভাষায় তারবার্তা আর চিঠি পাঠান তাতে সুসঙ্গের ডাকঘর ছেয়ে যায়।

কলকাতা এবং স্থানীয় ইংরেজি ও বাঙলা পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ তথ্যবহুল দীর্ঘ সপ্রশংস সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হয়। ভাবাবেগের সেই বিশিষ্ট প্রকাশ যথার্থই অনুপম। প্রায় সারা জীবনই তাঁর কেটেছে আর্থিক অসুবিধায়, তথাপি কলকাতার যা কিছু ভালো তার সর্বক্ষেত্রেই সহযোগী হিসাবে তাঁর নৈতিক চরিত্রের দীপ্তি এবং সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁর ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রয়োজনে তাঁর প্রশান্ত উপদেশ পেয়েছেন।

বাবার মৃত্যুর আঘাত আমাকে বড় কঠিন হয়ে বেজেছে। উপরন্তু বিক্ষুব্ধ

এক প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সংসারে দুরূহ বাস্তবের মধ্যে আমি পড়েছিলাম একা। তবু বাবার স্মৃতির উৎসই কর্মজীবনে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। মহৎ চরিত্র পিতার পাদমূলে বসে জীবনের পথনির্দেশ পাওয়া অল্প সন্তানের ভাগ্যেই ঘটে। কোন ব্যাপারে তাঁর নজর ছোট হতে দেখিনি। তাঁর কাছে সামন্ততন্ত্রযুগের জন্মগত আভিজাত্যের চেয়ে পরবর্তীকালে মানুষের ব্যক্তিত্ব শ্রেয়রূপে মর্যাদা পেয়েছে। সে আদর্শের প্রতিফলন তাঁর মধ্যে দেখেছি। সনাতন ধর্মের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সম্মান বজায় রেখে সক্রিয়ভাবে এই নতুন যুগকে স্বীকার করে চলার শিক্ষা বাবার কাছে পেয়েছি।

সহায়ক ও হিতৈষী শ্রদ্ধেয় পিতৃব্যগণের পরামর্শ ও পরিচালনায় বাবার ঐহিক ও পারত্রিক কাজ শেষ করে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলাম। বাবার বিয়োগব্যথায় মা একেবারে ভেঙে পড়েন। তাঁর মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউ খেলানো চুল ছিল। তার তুলনা মেলা ভার। তিনি সেই অনুপম কেশরাশি কেটে ফেলেন। শুধু তাই নয়, একজন বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলার স্বাভাবিক পালনীয় যা নিয়ম তিনি তা ছাড়িয়েও কঠোর সংযম আর আত্মকৃচ্ছ্রতার জীবনব্রত গ্রহণ করলেন। হিন্দু পঞ্জিকা মতে ছোট বড় প্রত্যেক পর্বে তিনি উপবাস করেছেন। পরবর্তী সাতাশ বছরের জীবনকালে মার একান্ত অনাড়ম্বর ব্রত পালনের সে-আদর্শ একদিনের জন্যেও শিথিল হয়নি। বারো বছর বয়সে মার বিয়ে হয়। বাবার বয়স তখন বাইশ বছর। তার আগে শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেবীর সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এক শিশুকন্যার জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সৎ মেয়েকে মা এমন ভাবে আপন করে নেন যে, ষোল বছর বয়সের আগে আমি জানতেই পারিনি যে আমার বড় বোনের আর-এক মা ছিলেন।

আমার স্নেহময়ী পিতামহী মহারানী সুখদাসুন্দরী দেবীও এই সময় মাকে আগলে নিয়ে কলকাতায় ছিলেন। মাত্র ছয় মাসের কিছু ঊর্ধ্বকাল পরে তিনিও ৺বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে ৺গঙ্গালাভ করেন। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে কন্যা ৺সৌদামিনীর চিতার স্থানেই তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়; ছোট কাকাই এই সময়ে তাঁর সব কর্তব্য পালন করেন।

সুসঙ্গের ঐতিহ্যকে বাবা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেছেন। তবু সেই জমিদারী পরিবেশ থেকে তিনি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। কেবল গ্রীষ্মের ছুটিতেই আমি বাড়ি গিয়েছি। তাছাড়া আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে কলকাতাতেই কাটিয়েছি। তখন দেখেছি যে, রাজকীয় অনুষ্ঠানে আমাকে পরিচয় করাবার কাজটা তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন; অথচ কোন কোন সাংস্কৃতিক সভা বা সামাজিক উৎসবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। হয়তো তিনি মনে করতেন যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অনেক বেশী। অসার আত্মতুষ্টিতে মগ্ন হয়ে আমি অনিশ্চিত ভিত্তি নির্ভর করে থাকি তা তিনি চাননি। অন্যান্য রাজন্যবর্গ, এমন কি ছোটখাটো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও

তাঁদের উত্তরপুরুষদের 'মহারাজকুমার' বা 'কুমার' হিসাবে সরকারী নামের তালিকাভুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বাবা কিন্তু সে রীতি অনুসরণ করেননি।

তাই বাবার মৃত্যুর পর সরকারী মহলে প্রথম দিকে আমি প্রায় অপরিচিতই ছিলাম। কিন্তু তার আগেই দেশের সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং খ্যাতনামা গুণিদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুন্দর সুযোগ হয়েছে। আগেই বলেছি যে, আমাদের কলকাতার বাড়িতে তাঁরা প্রায়ই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু আলোচনা করেছেন। কিছু নামের উল্লেখ করলে এর যাথার্থ পরিস্ফুট হবে। যেমন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাক্ষ্যা তর্ক-বাগীশ, অজিত ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন, যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার, লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মতো সংস্কৃত পণ্ডিত; স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বোস, জাস্টিস্ সারদা মিত্রের মতো স্বনামধন্য আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ্; রাজা বিনয়-কৃষ্ণ, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব, মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মতো সংস্কৃতির ধারক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মতো সাহিত্যরথী ও বিজ্ঞানী।

সে যুগের তরুণ এবং মনীষী দেশপ্রেমীরাও বাবার কাছে এসে তাঁদের উদ্বুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনঃসমীক্ষক ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এবং আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে।

কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম যে, সুসঙ্গের মহারাজা হিসাবে আমার গুরুত্ব হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। মহারাজা উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেয়েছি সে খবর সরকারী ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করা হয়। এতদিন আমার কলেজের সমবয়সীদের মধ্যে নিজেকেও এক সাধারণ ছাত্র হিসাবেই মনে করে এসেছি। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাবা যুক্ত ছিলেন এবার তারা সদস্য করার জন্য আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেন। কারণ, তাঁদের চোখে আমি অতি বিশিষ্ট এক নাগরিকের সন্তান এবং মহারাজা, যদিও সুসঙ্গরাজের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া উপাধির বাস্তব অসচ্ছল অবস্থাটা ছিল তাঁদের ধারণার বাইরে।

অতএব আমার উপর যে সম্মান ও নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে তা প্রায় অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য আমি প্রস্তুত তো ছিলামই না, উপরন্তু আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের পথে সে দায়িত্ব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কলেজের অনেক অধ্যাপক এবং প্রাক্তন বন্ধুবর্গ হঠাৎ

যেন আমার প্রতি অতিরিক্ত সৌজন্য দেখাতে লাগলেন। আমার উপর এ ধরনের কৃত্রিম মূল্য আরোপণের চেষ্টা আমার পক্ষে যে যৎপরোনাস্তি পীড়াদায়ক হতো তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাবু শ্যামলাল দে 'কলিকাতা সাহিত্য সোসাইটি' (বেঙ্গলি লিটারেরি সোসাইটি ?) নামে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি একবার তাঁদের কোন এক সভায় আমাকে সভাপতি হতে অনুরোধ করেন। সে সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার ল্যান্সেলট স্যান্ডারসন। উপরন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের চোখধাঁধানো পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় মহামান্য ভারতসম্রাট থেকে শুরু করে দেশের প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট নাগরিকের নামও দেখেছি। তাই প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারে প্রহসন বলেই মনে হয়েছে। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার অভিভাবক কাকা নীরদচন্দ্রের কথায় আমি সে সম্মান গ্রহণ করতে রাজী হলাম। কারণ, তখন আমি আঠার বছরের এক যুবক। মনে আছে, একেবারে তৈরি না হয়েই আমি ইংরেজিতে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলাম। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সেদিন আমার বক্তব্য তেমন অর্থবহ হয়নি। তবুও বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসায় আমি অবাক হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়. মাননীয় বিচারপতিও আমাকে অভিনন্দিত করেন। যে প্রতিষ্ঠানে বাবা সভাপতি বা সহ-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন, ছাত্রাবস্থাতেই আমি সেখানে সহ-সভাপতি হয়েছি। এভাবেই আমি প্রলোভনের ফাঁদে পড়ি।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা ছিল সে-ধরনেরই এক প্রতিষ্ঠান। মৈমনসিংহে ১৯১৮-১৯ সালে বাঙলার ব্রাহ্মণদের এক অধিবেশন হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে আমি সেখানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হই। সেখানে সভাপতি ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর। প্রথমদিকে আমার স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণসভায় এক সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন আমার ১৮ কি ১৯ বছর বয়েস। কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শে আমার গভীর অনুরাগ। তাই কেউ আমাকে প্রাচীনপন্থী বললে মনে মনে আমি খুশিই হয়েছি। এ কালের সংস্কৃতি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি চঞ্চল, বহুমুখী এবং অনির্দিষ্ট। তাই আমার বিশ্বাস যে, বাঙলায় আজও শুভ এবং রক্ষণশীল এক গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা আছে। আমার অল্প বয়েস ও সীমিত আর্থিক সঙ্গতি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সভা আমাকে অভূতপূর্ব জন সমর্থনে গ্রহণ করে। আমার স্বর্গীয় পিতার ব্যক্তিত্ব এবং সুসঙ্গ রাজবংশের খ্যাতিই যে তার মূল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রধানত কিছু বিত্তবান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সভার ব্যয়ভার বহন করতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক সুসঙ্গের নেতৃত্ব অপছন্দ করতেন। সুতরাং যাঁদের অর্থানুকূল্যে সেই প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছিল তাঁদের একজনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উদ্যোগী হন। তা সত্ত্বেও নেতৃত্বের দায়িত্ব কিন্তু আমার উপরই ছিল। কিন্তু

ব্রাহ্মণ সভার কাজে ক্রমে আমার শ্রদ্ধা নষ্ট হয় এবং বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করি। ফলে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত হই।

সেকালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুগ্রহ বা সম্মান লাভের আশায় পূর্ববঙ্গের ভূস্বামী এবং কলকাতার বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি লক্ষ্য করেছি। ক্ষমতা আর খ্যাতির এই লালসাকে ইংরেজ শাসকরা যে সযত্নে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এটা বিশ্বাস করার কারণ ছিল বলে আমি মনে করি। হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স অব ওয়েলস (পরে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড) একবার কলকাতায় আসেন। সেবার বাঙলা দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে সর্বকনিষ্ঠ মহারাজা হিসাবে সম্মানিত সেই অতিথিকে আমার মালা দেওয়ার কথা; কিন্তু 'কলকাতা গোষ্ঠী'র চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত শুধু এক 'দণ্ডধারী'র পর্যায়ে আমি স্থান পেয়েছি। ছোট বড় কতো দ্বন্দ্ব বৈপরীত্যের বোঝাই না আমার উপর এসে পড়তো! বিগত সেই দিনগুলোর দিকে তাকালে সত্যিই কৌতুক বোধ হয়। উত্তর জীবনে যতদূর সম্ভব সৌজন্যের সঙ্গে সে জাতীয় অনুষ্ঠান সাধ্য মতো বর্জন করেছি।

১৯২০ সালে উত্তরবঙ্গের এক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ জমিদারের এগারো বছর বয়সের এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তখন আমার বয়স বাইশ বছর। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ছিলেন আমার স্ত্রীর মাতামহ। তাঁর ছেলে কুমার তুলসীচরণ গোস্বামী ছিলেন আমার সহপাঠী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে শিক্ষার জন্য তিনি অক্সফোর্ডে যান। পরবর্তী কালে আইনসভায় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তখন তাঁর পথভ্রষ্ট সামাজিক জীবন আমাদের যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে। তখনও আমি ব্রাহ্মণ সভার সঙ্গে যুক্ত। বিদেশ যাত্রা সে প্রতিষ্ঠানের বিচারে নিন্দনীয় কাজ। কোন ব্রাহ্মণ সে জন্যে প্রকৃতপক্ষে জাতিচ্যুত হতেন। কাজেই যে পরিবারে বিদেশযাত্রী রয়েছেন ব্রাহ্মণ সভার উগ্ররক্ষণশীল এক গোষ্ঠীর বিবেচনায় সেখানে আমার বিয়ে করা একেবারেই অবাঞ্ছিত কাজ। অথচ অনুমোদিত সনাতন আদর্শের বিচারে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে নিয়ে কোনও যুক্তিসঙ্গত আপত্তির কারণ ছিল না, এবং কুমার তুলসী তখনও বিলেতে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের কিছু সদস্য সে অজুহাতে আমার পরিবর্তে তাঁদের পছন্দমতো নেতাকে সভাপতি করার চেষ্টা করেছেন। যাহোক, যুক্তি যেখানে নিষ্ফল, প্রতিপক্ষ সেখানে নোংরামির আশ্রয় নিয়ে মেয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী পিতাকে অকারণে অপমান করার চেষ্টাও করেছেন। অবশ্য আমার পিতৃব্যগণ তার বিরোধিতা করেছেন এবং যথারীতি বিবাহ উৎসবও হয়েছে।

এই বিবাহকে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিবেক বিভ্রান্তি আমার মনে প্রবল আঘাত দিয়েছে। আমাদের সুস্থ জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথে এই 'সভা' যে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে আর সন্দেহ ছিল না। যে ব্রাহ্মণ সভা

নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের পথে জনসাধারণের রক্ষণশীল অংশে যথানুপাতে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করতে পারত, অতিদ্রুত সে এক কূপমণ্ডুককে পরিণত হলো ; শুধুমাত্র আইনসভায় সদস্যপদ প্রার্থীর প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিক্রিয়াশীল একগোষ্ঠী বিফল চেষ্টা করেছিলেন।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সুসঙ্গের সামন্ততন্ত্র কিভাবে মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে আমার অভিজ্ঞতা থেকে তার কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন দুর্বার গতিতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে ইংরেজ সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। আমাদের মহকুমা অফিসারের দপ্তর এবং আবাস ছিল নেত্রকোণায়। সেকালে নতুন কোন সিবিলিয়ন বা প্রবীণ কোন ব্যক্তি মহকুমা শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হতেন। একবার প্রদেশ-গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে (পরে ভারতসচিব মার্কুইস অব জেটল্যান্ড) মহকুমা পরিদর্শনে আসেন। মহকুমা শাসক রায়-বাহাদুর নিরঞ্জন রায় তখন প্রায় বিব্রত হয়েই নেত্রকোণায় আমার উপস্থিতির জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমাদের মহকুমা অঞ্চল পরিদর্শনে তার আগে কোন প্রাদেশিক গভর্নর আসেননি। প্রথমদিকে আমার যাওয়ার কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ, তখন নেত্রকোণায় যাওয়ার ব্যাপারটাই ছিল যেমন ক্লান্তিকর তেমনই ব্যয়সাধ্য। পরে কিছুটা দোমনা হয়েই নেত্রকোণা যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে বিনা আড়ম্বরে সাধারণ একটা পান্‌সি নৌকোয় যাত্রা করে দ্বিতীয় দিনে আমার নেত্রকোণা থেকে চার মাইল দূরে এক জায়গায় গিয়ে পেঁছিলাম। সেখানে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মহারাজাকে দেখতে, শ্রদ্ধা জানাতে কাছের এবং দূরের বহু লোক এসে জড়ো হয়েছিলেন। বিশিষ্ট ভারতীয় প্রথায় সমবেত মহিলারা উলুধ্বনি করে পথে ফুল আর খই ছিটিয়ে দিয়েছেন। পুরুষরা যার যার পদমর্যাদা এবং জাতিগত রীতি অনুযায়ী মহারাজাকে সম্মান জানান এবং নেত্রকোণা পর্যন্ত সমস্ত পথ মহারাজার অনুগমন করেন। মহারাজাকে দেখার আগ্রহে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে যায়। মহারাজার জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রামস্থানের পথে তোরণ দিয়ে সাজানো ছিল। সে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা লাটসাহেব না মহারাজাকে উপলক্ষ করে করা হয়েছে তা বুঝে উঠতে আমি বেশ বিভ্রান্তিতে পড়েছি। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই উপলক্ষটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যে মহারাজার ঐতিহ্যগত প্রভাবের সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছেন আমি পরে সেটা টের পেয়েছি। সরকারী কর্মচারীরা দূর দূর গ্রামবাসীদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইংরেজ লাটসাহেব এই প্রথম মহকুমা সদর দেখতে আসছেন ; সুতরাং প্রজারা যেমন করে জমিদারকে সম্মান দেখান, সেভাবে বড় বড় জমিদারদের সঙ্গে সুসঙ্গের মহারাজাও নিজে লাটসাহেবকে সম্মান দেখিয়ে নজর দিতে আসছেন।

অন্যদিকে নিরীহ গ্রামবাসীদের কাছে কংগ্রেসদল প্রচার করেন যে, এই অঞ্চলের

প্রকৃত মালিক সুসঙ্গের মহারাজা। নেত্রকোণায় তিনি প্রথম আসছেন। কাজেই মহারাজা যেখানে বিশ্রাম করেছেন সকলেই সেখানে গিয়ে তাঁকে যেন শ্রদ্ধা জানায়। সময়টা ঠিক করা হয় গভর্নর আসার ঠিক দু ঘন্টা আগে। কংগ্রেসের সে চালটা দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রেলস্টেশন থেকে দরবার স্থানের সামিয়ানা পর্যন্ত রাস্তার পাশ থেকে লোক সমাবেশ সরিয়ে রাখা। তার আঁচ পেয়ে তখন ইতিকর্তব্য স্থির করা আমার পক্ষে বেশ জটিল হয়ে উঠল। আমাদের পুরনো ও বিশ্বস্ত ম্যানেজার গোপী চক্রবর্তী মহাশয় বললেন যে, ভাবপ্রবণ জন সাধারণের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে সরকারের সম্মান বজায় রেখে চলার চেষ্টাই যুক্তিযুক্ত। এর মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবহারজীবী নেতাদের পক্ষ থেকে মহারাজাকে বিশেষ অভ্যর্থনার প্রস্তাবও আসে। শহর থেকে গভর্নর সাহেব চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাবে যাঁরা রাজী হলেন না আমি তাঁদের এড়িয়ে গেলাম। আমার বিশ্রামস্থানের চারপাশেই দর্শনাকাঙ্ক্ষী মানুষের বিরাট সমাবেশ হয়েছে। অগত্যা এক বার্তাবহ মারফত তাঁদের বলে পাঠালাম যে, আপাতত তাঁরা যেন চলে যান, বিকেলে তাঁদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। কিন্তু আমি নিজে দেখা দিয়ে কিছু না বলা পর্যন্ত তাঁরা যেতে রাজী হলেন না। চেহারায় আমি একটু খাটো। তাই সকলেই যাতে আমাকে দেখতে পান সেভাবে একটা উঁচু টেবিলের উপর একটা চেয়ার রেখে কিছুটা নাটকীয় ঢংয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের অনুরোধ করে বললাম যে, নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত একঘণ্টা আগে তাঁরা যেন আমাকে স্টেশনে যেতে দেন। কারণ আমি লাটসাহেবের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই এবং শোভাযাত্রার সঙ্গে যেতে চাই। সে প্রস্তাব তাঁরা সহজেই মেনে নেন।

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে যে, তখন আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা, আমার ব্যক্তিগত চরিত্র বা নিরপেক্ষতা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মেজাজ তাঁদের ছিল না। বস্তুতপক্ষে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে যে, কংগ্রেস দল সাম্য ও গণতন্ত্রের কথা প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তখনও প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটাই যেন আঁকড়ে ধরে ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বহু শতাব্দী ধরে সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে স্থানীয় জনসাধারণ অনেক বেশী সম্মান দিয়েছেন।

বড়বাড়ি আর মধ্যমবাড়ির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যে ভালো ছিল না সেটা খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। ম্যমলা মকদ্দমা তো লেগেই ছিল, তার উপর সে সুযোগে আইনজীবিদের প্রভাবও বেড়ে যায়। ফলে রাজপরিবারের বৃহৎ টলমলে কাঠামোর মধ্যে অবক্ষয় দেখা দিল। জনসাধারণও শ্রদ্ধা হারাতে লাগলেন এবং সেই পরিবেশে পরগণায় কোন গঠনমূলক কাজ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে সরকারী জমি জরিপের কাজ শুরু হয়ে যায়। জমির উপর আপন স্বত্ব সম্বন্ধে প্রজাদের মধ্যে স্বাভাবিক কিংবা আরোপিত সচেতনতার সুযোগ নিয়ে জরিপ বিভাগ এবং আমাদের স্টেটের কিছু অসৎ কর্মচারী ও আইনজীবী নিজেদের

স্বার্থে প্রজাদের জমিদারের বিরুদ্ধে এমনভাবে উস্কে দিচ্ছিলেন যাতে তাঁরা আইনের আশ্রয় নিয়ে স্বত্বের দাবি জানান। খ্রীষ্টান মিশনারীরাও ধর্ম প্রসারের স্বার্থে সে সুযোগে প্রজাদের সুহৃৎ সেজে অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারের বিরুদ্ধে তাঁদের দাবি সমর্থন করেন। মুখ্যত প্রজার দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার যেভাবে জরিপের কাজ করান তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুধু আগামীকালে চাষী বিদ্রোহের ক্ষেত্রই তৈরি হয়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সৎ উদ্দেশ্যে সংস্কার সাধক আইনের মাধ্যমে যখনই কোন পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে, তখনই কিছু অসৎ, কলহপরায়ণ, স্বার্থপর ও নীতিহীন ব্যক্তির হাতে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গিয়েছে। ফলে প্রচলিত নীতি ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সেটা যেন সাময়িক উদ্দেশ্যে টাঙানো এক বিজ্ঞাপন অর্থাৎ অপ্রস্তুত জনসমষ্টির উপর জোর করে চাপানো এক ব্যবস্থা! পরিণামে ন্যায়-বিচার অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। সে ধরনের প্রয়াসে লাভ বা লোকসান যাই হোক, আমার বিশ্বাস, বহু ক্ষেত্রেই আমরা খাঁটি জিনিস যাচাই না করে শুধু মার্কা দেখেই অভিভূত হয়ে পড়ি। তাতে তাড়াহুড়ো করে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুসঙ্গবাসীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল সে প্রসঙ্গে কিছু বলছি। ব্রিটিশ সরকার স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছেন যে, আমি সে আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হব। তাঁরা সে সম্বন্ধে আমার উপর কিন্তু সরাসরি কোন চাপ সৃষ্টি করেননি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী। তাঁর বাণী মর্মস্পর্শী এবং গুরুত্বে সুদূরপ্রসারী। তাই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তবু সে আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হওয়ার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম। কারণ, পরিণাম সম্বন্ধে মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া সংশয় নিয়ে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে তখনকার মতো স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলাই ছিল আমার পক্ষে শ্রেয় পথ।

অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে দু'একটা ঘটনা মনে পড়ছে। 'খেদা'র কাজে আমি তখন গারো পাহাড়ে ছিলাম। সেই নির্জন অরণ্যপ্রদেশের অধিবাসী এক গারো 'গান্ধী' আন্দোলন সম্বন্ধে একদিন আমাকে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্ন করেন। গারো পাহাড়ে আমার ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা ইংরেজ সরকার সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাই প্রথমে আমার ধারণা হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয়ত সরকারী গুপ্তচর। কিন্তু পরে বুঝলাম যে, আমার সন্দেহ অমূলক। তখন খোলা মনেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। দেখেছি যে সুদূর অরণ্যবাসী সেই গারোর মধ্যেও সে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ক্রমশ ফুটে উঠছে।

নাজিরপুর সুসঙ্গের এক সমতল অঞ্চল। ১৯২৬ সাল বা তার কাছাকাছি কোন সময় একবার আমি সেখানে ক্যাম্প করি। স্থানীয় এক মুসলমান

তাঁর স্বাভাবিক মুসলমানী টুপির বদলে একদিন গান্ধীটুপি মাথায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম, 'গান্ধী মহারাজ আমাদের খাদির ধুতি আর টুপি পড়তে আদেশ করেছেন।' তাঁর কথায় বেশ বোঝা গেল যে, তাঁদের দৃষ্টিতে সুসঙ্গের মহারাজার চেয়ে গান্ধী মহারাজার ক্ষমতা অনেক বেশী। এমন কি থানার দারোগা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজেও তিনি কর্তৃত্ব করতে পারেন।

১৯২৮ সালে আমি আর একবার নাজিরপুরে ক্যাম্প করি। একদিন ভোরে ক্যাম্পরক্ষী একটা তাজা কার্তুজ কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে দিল। তাঁবুর ঘেরের বাইরে সেটা পড়েছিল। জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করতেই নজরে পড়ল একজোড়া বুটজুতোর ছাপ। তাঁবুর মধ্যে একটা স্ট্যান্ডে কয়েকটা বন্দুক আর রাইফেল ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো যে, সেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর কাছাকাছি তাঁবুর বাইরে কেউ এসেছিল। স্বাভাবিক কারণেই তখন মনে হয়েছে যে, সে ইংরেজ বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদী দলের কেউ অথবা কোন ডাকাত। সেকালে মুখ্যত হিন্দু যুবকদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদীরা ছোট ছোট দলে গারো পাহাড়ের সানুদেশ অঞ্চলে আত্মগোপন করে সম্ভাব্য উপায়ে আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাগুলি সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন।

বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ সর্বভারতীয় গণমানসে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। গারো পাহাড়ে এবং সুসঙ্গ পরগণার সমতটে শিকার করতে গিয়ে তার আভাস পেয়েছি। আমাদের এই প্রান্তদেশেও গান্ধীজী, সন্ত্রাসবাদী এবং শেষে কমিউনিস্ট দলের সক্রিয় প্রভাব দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমদিকে গান্ধী আন্দোলনকে বাদ দিলে পরগণার চাষী ও আদিবাসীদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাবই যে শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রধানত সরকারী কর্মচারী, খ্রীষ্টান ধর্মযাজক, নেতৃস্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক এবং জমিদার শ্রেণী সাময়িক আংশিক লাভের আশায় সেকালের ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার অপব্যবহার করে অলক্ষ্যে এবং ধীরে ধীরে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন। পরগণাবাসী মুসলমানদের মধ্যে তাঁরা কিন্তু তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। গারো পাহাড়ের সানুদেশে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলই তাঁদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র হয়েছিল। হিন্দু-ভাবাপন্ন হাজংরা তাঁদের মতবাদে অতি দ্রুত সাড়া দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে তাঁদের আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। কারণ, ফ্যাসীবাদী জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ শক্তিশালী করে তোলার অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট নেতাদের অবাধে কাজ করার অধিকার দিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট মতবাদের অর্থনৈতিক আবেদন হাজং এবং অন্যান্য প্রজা সম্প্রদায়ের উপর প্রবল হলেও তার ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মবিরোধী প্রচার অধিকাংশ মানুষের মনেই আঘাত দিয়েছে। আমার ধারণা যে, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ জনকল্যাণমূলক বিকল্প কর্মনীতি এবং প্রচেষ্টার অভাবেই সাধারণ মানুষ গণসাম্যবাদ যাদুমন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

যা হোক কিছু অক্লান্তকর্মী কমিউনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য চেষ্টার ফলে হাজংরা তাঁদের দলে ভিড়েছিলেন। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এ অঞ্চলে সাড়া জাগায়নি। পক্ষান্তরে সেই নেতাদের নিঃস্বার্থ কাজের নৈতিক আবেদন বহুলাংশে ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রতিপক্ষের কোন নেতাই তেমন আদর্শ নিষ্ঠা নিয়ে এ অঞ্চলে কাজ করেননি। আমাদের এই নিষ্ক্রিয়তার পরিণামে গুরুমূল্য দিতে হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সমস্যা এবং ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে অলীক 'মহারাজা' উপাধির গুরুভার নিয়ে জনসমাজে কাজ করা আমার পক্ষে বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ সভার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত্যাগের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। আর একবার জমিদারদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আইনসভায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে অনেকের উৎসাহে প্রলুব্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত আমার অর্থ সংকটের কথা ভেবে সেই প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়েছি। যদি এই উপাধির বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারতাম তবে আমার জন্মার্জিত সামাজিক প্রেরণা এবং নৈতিক বল সম্বল করে সক্রিয়ভাবে, আরও কাজ হয়ত করা যেত।

সম্ভবত সে সংকট এড়াতে গিয়ে আমি শিকার এবং অরণ্য জীবনের দিকে বেশী করে ঝুঁকেছি। শিকারের উদ্দেশ্যে বনে পাহাড়ে পর্যটনের সময় আমার দৃষ্টিতে আর এক ভুবন যেন ধীরে ধীরে তার রূপ উদ্ঘাটন করেছে। আমি অনুভব করেছি অরণ্যের প্রশান্তি, দেখেছি তার বিচিত্র বর্ণসমারোহ, শুনেছি তার ভাষা এবং পেয়েছি আদিবাসীদের সরল বিশ্বাস। সাধারণত বহু অনুচর, শিকারী আর হাতির দল নিয়ে আমি রাজকীয় মর্যাদায় শিকারে গিয়েছি। তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। তাই নিঃসঙ্গ ভ্রমণের মাধ্যমে আনন্দ পেয়েছি বেশী।

আমার ভ্রমণের কিছু বিক্ষিপ্ত স্মৃতি মনে আসছে। ১৯২৬ সালে অক্টোবরের এক দুপুরে স্থানীয় এক কোঁদা নৌকোয় যাত্রা করে আমরা ভাটির দিকে কচুয়াডহর নামে এক জায়গায় এসে পেঁছিলাম। ক্ষেতের ধান কাটা যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন আমাদের হাতিগুলো জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাধারণত সেখানেই পিলখানায় থাকত। আমাদের যাত্রা করতে কিছু দেরী হয়েছিল। তাই দেখতে পেলাম যে, চাষীরা দিনের কাজ শেষ করে ফিরে আসছে। কেউ কেউ আবার গরুমোষগুলোকে নদীর জলে স্নান করাচ্ছে। নদীর ঘাটে মেয়েরা বাসন মাজছে, কাপড় ধুচ্ছে আবার ছোট ছেলেমেয়েদের স্নানও করিয়ে দিচ্ছে। ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে থেকেও তারা অবস্থা নির্বিশেষে যে প্রবহমান সোমেশ্বরীর স্পর্শসুখ অনুভব করছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বকের দল

গরুমোষের চারপাশে ভিড় করেছে। আর একদিকে টিট্টিভ পাখিগুলো অপূর্ব ভঙ্গিতে পিঠের উপর মাথা ঘুরিয়ে পালকে ঠোঁট গুঁজে এক পায়ে সার করে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে। কোন কোন পাখি আবার দল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। বিপদের সামান্য আভাস পেলেই তারা সংকেত ধ্বনি করে জানাবে। এই পাখির দল হঠাৎ সচকিত হয়ে ডানা মেলে বিশেষ ভঙ্গিতে একসাথে টি-টি-টি শব্দে ডাকতে ডাকতে যখন ধাপে ধাপে উড়ে এসে কোন নিরাপদ বেলাভূমিতে নামে এবং কিছুক্ষণের জন্য সবাই একত্রে ব্যস্ত হয়ে কীটপতঙ্গের সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়, তখন সে দৃশ্য মন মাতিয়ে তোলে। হয়ত দেখা যাবে যে, বাঁশের ছাঁচায় ভিজে কাপড় মেলে ছাউনির তলায় কোন ঠিকেদার দুপুরের রান্না করছে, নয়ত আঁটি বাঁধা বাঁশের বোঝার উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে সে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে; অথবা ছোট কোঁদা নৌকোয় বসে কোন জেলে মাছ ধরার আশায় তার হাতজাল ছুঁড়ে দিচ্ছে কিংবা কোন ডিঙি নৌকো ছোট পালের হাওয়ায় স্রোত ঠেলে ছুটে চলেছে। সোমেশ্বরীর তটে এবং বালির চরে এমন বিচিত্র দৃশ্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মূল্যহীন কোলাহল আর বিশৃঙ্খল ভিড়ের গ্লানিকে দূরে ঠেলে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে টেনে নিয়েছে। আমাদের এই অভিজাত পরিবারের ক্রমবর্ধমান আর্থিক ও নৈতিক সংকটের চাপেও কেন যে আমি ভেঙে পড়িনি ভেবে অবাক হই। মনে হয় প্রবহমান প্রশান্ত সোমেশ্বরী অথবা গারো পাহাড়ের অরণ্যলোকে ভ্রমণের সুযোগে আমার সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি।

আমরা হাতি বা নৌকোয় যখন বেড়াতে যেতাম, তখন ভৃত্যরা আমাদের মাথার উপর মস্ত বড় বড় সাদা ছাতা ধরে রাখত। সেগুলো অনেক দূর থেকেই সহজে নজরে পড়ত। রাস্তায় আমাদের দেখা পেলেই মুসলমান ও হিন্দু রমণীরা আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। মুসলমান মেয়েরা যথারীতি ত্রস্তপদে আশেপাশে কোন গোপন স্থানের আড়ালে চলে যেতেন। কারণ তাঁদের সমাজে বংশমর্যাদা অনুসারে অতি কঠিন পর্দাপ্রথা ছিল। তাই তাঁরা ছিলেন স্বভাবভীরু। তখন তাঁদের আচরণে সেটা এতই প্রকট হয়ে উঠত যে, স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা যেন তাঁদের মধ্যে থেকে লোপ পেত। হিন্দু মেয়েদের আচরণ কিন্তু সেরকম ছিল না। তাঁরা পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ঢেকে ফেলতেন আর যুবতী মেয়েরা জলে গা ডুবিয়ে হয়ত হাতের কলসীটা উল্টো করে ভাসিয়ে ধরে রাখতেন, সে অবস্থায় আধো ঢাকা ঘোমটার ফাঁকে তাঁদের সেই কৌতুকের লাজুক চাহনি তাঁদের যেন আরও রমণীয় করে তুলত। উচ্চবর্ণ হিন্দু থেকে আদিবাসী সমাজের স্ত্রীলোকদের ব্যবহারিক আচরণে অল্প-বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়েছে। উচ্চতর সমাজে যেমন ছিল নিয়মের কড়াকড়ি, আদিবাসীদের মধ্যে তেমনই ছিল অবাধ স্বাধীনতা। গারো মেয়েরা তো আপন

বক্ষস্থলটুকু আবৃত করার ব্যাপারে এতটুকুও উদ্বেগ দেখাতেন না। তাঁদের বন্য পরিবেশে সেটা সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছে।

সুসঙ্গে সেকালের হোলি উৎসবের কথা মনে পড়ছে। সেদিন সকালে আমাদের স্নান করা নিয়ে মা কতই-না তাড়াহুড়ো করেছেন! স্নানের শেষে আমরা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকতাম। কারণ, সেলাইকরা পোষাক পরে দেব-মন্দিরে যাওয়ার রীতি ছিল না। বাহিরমহলের আঙিনায় এসে দেখতাম যে, বাবা, কাকা এবং বয়স্ক সকলেই আমাদের মতো স্নান সেরে চাদর গায়ে দিয়ে অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে ন'বাড়ি থেকে বয়স্করা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং আমরা একসঙ্গে দশভূজা মন্দির প্রাঙ্গনে চলে যেতাম। দেখতাম দোল উৎসব উপলক্ষে প্রাঙ্গনে একটা চতুষ্কোণ বড় বেদীর উপর আর এক থাক ছোট বেদী তৈরি হয়েছে। তার মাথায় সুন্দর চাঁদোয়া। চারদিকে চারটে পতাকা আর লম্বা মাছের আকৃতির শুঁড়ওয়ালা একজোড়া মকরমূর্তি ছোট বেদীর উপর দুপাশে তোরণের মতো টাঙানো হয়েছে। তার নীচে ঝোলানো আছে আমাদের পারিবারিক বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের দোলনা। থালায় আবীর, চন্দন, ফুল নিয়ে পুরোহিত মহাশয়ও তৈরি হয়ে আছেন। প্রথমে প্রবীণ বয়স্করা এক এক দলে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বেদী প্রদক্ষিণ করতে করতে বিগ্রহে আবীর দিয়ে শেষে দোলনাটা দুলিয়ে দিতেন। শেষে আসে আমাদের পালা। তখন একজন ব্রাহ্মণ কর্মচারীর সাহায্যে আমরাও বড়দের অনুকরণে বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করে, আবীর দিয়ে, দোলনা দুলিয়ে কত আনন্দই না পেয়েছি। দোলবেদীর অনুষ্ঠান শেষে আমরা সবাই সেই বিখ্যাত অশোক গাছ, দেবী দশভূজা, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে আবীর দিতাম। এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিগ্রহের প্রতি আমাদের অনুভূতির বন্ধন যে দৃঢ় হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর আমরা অধীর আগ্রহে বিকেল, সন্ধ্যা আর রাত্রির উৎসবের অপেক্ষা করেছি। সারা বাড়িতে তখন উৎসবের আমেজ আর হাসিখুশির রাজত্ব। হোলির বেশ কিছুদিন আগেই সুসঙ্গবাসী উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রবাসী হিন্দুস্থানীরা ঢোলের বাজনার সঙ্গে উচ্চরোলের গানে রাতটাকে মুখর করে রাখতেন। তাঁদের অনেকেই রাজবাড়ির বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী এবং কান্যকুব্জের প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারও ছিলেন। তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাঙালি সমাজে মিলেমিশে বাস করেছেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব মিটে গেলে আমরা প্রত্যেকে দু থলে বা বালিশের খোলভর্তি আবীর নিয়ে চলে যেতাম রঙমহলে। সেখান থেকে আমাদের আর ন' বাড়ির সবাই মিলে যাত্রা করি দশভূজা মন্দিরে। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আগেই দোলবেদীর সামনে আঙিনায় রাখা হয়েছে। চারপাশে মানুষের ভিড়ে আদিবাসী থেকে শুরু করে বর্ণনির্বিশেষে স্থানীয় হিন্দু, এমনকি কিছু

মুসলমান ও খ্রীষ্টানকেও দেখা যায়। ছেলেবেলায় দেখেছি যে, পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তি বাবার খুল্লতাত রাজা কমলকৃষ্ণ প্রথমে বিগ্রহকে আবীর দেওয়ার পরে রাজপরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে একে একে সবার আবীর দেওয়া হলে সমবেত দর্শকদের প্রত্যেকেই সেই সুযোগ পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে এবার সকলের গন্তব্যস্থল হচ্ছে সোমেশ্বরী তীরে পুণ্যাহবাড়ি ঘাটে। দশভূজা মন্দির প্রাঙ্গন থেকে মস্ত এক মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। সে মিছিলে দেখা যায় বাঙালি ব্রাহ্মণের মাথায় বিগ্রহ, সার সার পতাকাবাহক, আদিবাসীদল, রাজ-পরিবারের লোক, আত্মীয়স্বজন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্টেটের কর্মচারী, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারী ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়।

শোভাযাত্রা শুরু হলে রাজা কমলকৃষ্ণ বাড়ি ফিরে যেতেন। এদিকে ধীর গতি সেই মিছিলের মধ্যে হিন্দুস্থানীদের উচ্চরোলে গানবাজনা, গ্রামবাসী মনিপুরী, হাজং এবং বাঙালিদের সুমধুর কীর্তন আর ধূলিরাশির মতো আবীর চারদিক আচ্ছন্ন করে সবার প্রাণে যেন আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ইতিমধ্যে রাজপরিবারের দু'আনী বাড়ির বিগ্রহের মিছিলও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। শোভাযাত্রার পথ টৌরিবাজারের পাশ দিয়ে। প্রধানত সেখানে ঢাকার কিছু মুসলমান ব্যবসায়ীর বাস। সুসঙ্গরাজারা সেখানে একটা মসজিদ তৈরির অনুমতি দিয়ে প্রয়োজনীয় জমিও দান করেন। সেকালে সেই মসজিদের পাশ দিয়ে গানবাজনা করে মিছিল নিয়ে যেতে স্থানীয় মুসলমানরা কোনও আপত্তি করেননি। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ গ্রাম্য-জীবন যেভাবে আচ্ছন্ন করেছে ১৯৪৭ সালের শেষেও সুসঙ্গে সেটা গুরু সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি।

সেদিন পূর্ণিমার আলোর অপরূপ শোভার মধ্যে মিছিল সোমেশ্বরীর দিকে এগিয়ে যায়। দূরে গারো পাহাড়ের অস্পষ্ট রূপ সেই জ্যোৎস্নালোকে পটে আঁকা ছবির মতো ফুটে উঠে যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের এক অনুভূতি জাগায়। সেই পরিবেশে শ্রুতিমধুর না হলেও কানে তালা লাগানো মিছিলের গান বাজনা হয়ত আপন গুণেই সকলকে মুগ্ধ করে। সেদিন শোভাযাত্রা এসে শেষ হয় নদীর ঘাটে। সেখানে সে উপলক্ষে তৈরি একটা কুঁড়েঘরে বিগ্রহ রেখে সবাই সেই জায়গাটা ঘিরে দাঁড়ায়। সেই কুঁড়েতে বাঁধা একটা ভেড়াকে দেখে আমাদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। কোন ফাঁকে এক সময় সেই কুঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দিলে অনতিবিলম্বে বিগ্রহ নিরাপদে সরিয়ে রাখা হয় আর ভেড়া বেচারা পুড়ে মরার হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে যায়। ঠিক তখনই আমরা প্রবল উত্তেজনায় সেই জ্বলন্ত কুঁড়ে লক্ষ্য করে ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করি। মাঝে মাঝে আগুন লাগা বাঁশ বিকট শব্দে ফাটে। আমাদের উল্লাস আরও বাড়ে। কুঁড়ে ঘরটা দেখতে দেখতে পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সুসঙ্গবাসী বিভিন্ন পরিবারের বিগ্রহকে এনে

বাজারের এক নির্দিষ্ট স্থানে সবাই অপেক্ষা করতেন এবং প্রচলিত পূর্বাধিকার অনুসারে তাঁরা আপন আপন বিগ্রহ নিয়ে রাজবাড়ির দোলনাবাহিত বিগ্রহ-শোভাযাত্রার অনুগমন করতেন। ১৯৩২ সালে রাজবাড়ির পূজা বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে রীতি বজায় ছিল। তার মধ্যেও ব্যতিক্রম ঘটে। আমাদের কোন ক্ষুব্ধ নিকট আত্মীয় স্টেটের অধীনে এক তালুকদার ছিলেন। শক্তি সঞ্চয় পার্টি নামে তিনি এক দল সংগঠন করেন। তাঁর পৃথক শোভাযাত্রা বের হতো কিন্তু বেশী লোক হতো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, সুসঙ্গ রাজপরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক, সরকারী কর্মচারী, বিশেষ করে পুলিশমহল তাঁকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বড় করতে চেষ্টা করেছিলেন।

যা হোক নদীর ঘাটে অনুষ্ঠান শেষে মিছিল আগের পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করে। এবার রাজবাড়ির বিগ্রহদের ব্রাহ্মণ পরিচারকগণ অন্দরমহলে নিয়ে আসে এবং অন্তঃপুরবাসী মহিলারা বিগ্রহদের আবীর দেন। অন্তে বিগ্রহদের আবার মন্দিরে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়।

অতঃপর প্রণম্য গুরুজনদের প্যায়ে আবীর দিয়ে একে একে সকলেই প্রণাম করে যান। প্রচলিত প্রথা অনুসারে হোলি উপলক্ষে সম্পর্কসূত্রে নিকট আত্মীয়রা সেদিন অন্তঃপুরে এসে আবীর দিয়ে প্রণাম করেন। সিকদার সম্প্রদায়ের পুরুষরা একে একে প্রত্যেক রানীর ঘরের দরজার সামনে এসে মাটিতে একটু আবীর রেখে নিজের নাম বলে প্রণাম করে যান।

অন্দরমহলের অনুষ্ঠান শেষ হলে রাজারা বাহিরবাড়ির আঙিনায় চলে আসেন। ইতিপূর্বেই সেখানে চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদি সার করে সাজানো হয়েছে। তাঁরা বসলে প্রথামত স্থানীয় জনসাধারণের প্রত্যেকেই প্রথমে তাঁদের হাতে একটু আবীর দিয়ে পরে মুখেও মাখিয়ে দেন। রাজারাও সেই সৌজন্যের প্রতিদান জানান। অবশেষে হয় মহারাজা কিংবা পরিবারের কোন প্রবীণ লোক সমবেত পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের পান বিতরণ করেন। রাজবাড়ির সংহতি পরে নষ্ট হয়ে গেলেও সে রীতি দীর্ঘকাল বজায় ছিল।

পরদিন সকালে প্রথমে জলে গোলা আবীর দিয়ে আবার খেলা শুরু হয় আর তার সমাপ্তি হয় কাদা দিয়ে খেলার মধ্যে। অন্দরমহলে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হোলি খেলেছেন। পুরুষরা সে খেলায় কখনও যোগ দেননি। ১৯৩০ সালের পরে পর্দাপ্রথার আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরিবারের উঠতি বয়সের যুবকরা হোলিখেলায় মেয়েদের বাদ দিয়ে চলার সেই পুরাতন রীতি ক্রমে বর্জন করেন। শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবেই যে অলক্ষ্যে এই বিচ্যুতি দেখা দেয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে যুবক-যুবতীদের কিছুটা অবাধ মেলামেশার প্রভাব রাজপরিবারের উপরও এসে পড়েছে।

দুআনী বাড়ি অর্থাৎ রাজা জগৎকৃষ্ণের উত্তরপুরুষরা গ্রামের সীমিত পরিবেশে নিজেদের স্বতন্ত্র করে রাজপরিবারের স্বাভাবিক আদর্শ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে

নিম্নস্তরের তথাকথিত এক সংস্কৃতির প্রভাবে পড়েন। হোলি উৎসবের দ্বিতীয় দিন সুসঙ্গরাজারা প্রচলিত রীতিতে স্থানীয় সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মর্যাদা বজায় রেখে মিলেমিশে খেলেছেন। শুধু কাদা দিয়ে খেলা নির্দোষ বলেই গণ্য ছিল। কিন্তু সেদিন দুআনী বাড়ির কোন কোন ব্যক্তি কাদা খেলার নামে তাবৎ ময়লা মিশ্রিত কাদা দিয়ে খেলেছেন। তাতে নিঃসন্দেহে কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্যে সমবেত জনতার মধ্যে সাধারণত কোন হাস্যরসের পাত্রকে বেছে নিয়ে 'রাজা' করা হয়। রাজবেশ ছাড়া রাজাকে মানায় না। তাই পরিত্যক্ত একটা ঝুড়ির মাথায় মুড়ো ঝাঁটার চুড়ো বসিয়ে তাঁর মুকুট তৈরি হয় আর তিনি গলায় পরেন ছেঁড়া জুতোর মালা। এভাবে তিনি সঙ্ সাজেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার কিছু কমতি ছিল না। কারণ, হোলির দলের নিয়ম ভঙ্গের জন্যে তিনি যে কোন লোককে, এমনকি মহারাজা বা রাজাদেরও, জরিমানা করতে পারতেন।

হোলি উৎসব আগে রাজবাড়ির সীমানার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলার শেষ পর্বে সকলের কাদামাখা বিচিত্র চেহারা উপভোগ্য দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবার আমাদের যাত্রা সোমেশ্বরী নদীতে। সেখানে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। হোলির রাজা কিন্তু এরমধ্যেই নিয়মভাঙার অপরাধে বেশ কিছু লোককে জরিমানা করেন। হোলির দল সন্ধ্যাবেলায় রাজবাড়ির সামনে এসে জড়ো হন। ইতিমধ্যে সেই নিয়মভাঙা অপরাধীদের জরিমানার খেসারত স্টেট থেকে পাওয়া যায় এবং সেই টাকায় প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন এনে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে যথারীতি হোলি উৎসব শেষ হয়।

১৯৩২ সালে হোলি উৎসবের এক ঘটনা মনে পড়ছে। সুসঙ্গরাজস্টেটের অংশীদারদের মনোমালিন্য তখন এমন এক পর্যায়ে এসে পেঁছেছে যে, তার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হোলি উৎসব এড়িয়ে যেতে লাগলেন। জনতার সঙ্গে এই বিচ্ছেদের মূলে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাব আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তাই সেবার আমাদের মানসিক সংকীর্ণতা পরিহার করে হোলির শোভাযাত্রা বাজার, সরকারী আপিস এবং তথাকথিত শক্তি সঞ্চয় দলের এলাকা বাদ দিয়ে, রাজবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে গ্রামের অন্যান্য স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। আমার পরিকল্পনায় হোলি উৎসবের মেজাজ আবার ফিরে আসে। কিন্তু সেবার সেই শোভাযাত্রা কোন এক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কোন এক ঘটনায় আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সে অঞ্চলে কিছু স্ত্রীলোক সরকারী তালিকাভুক্ত না হলেও বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। গোলগাল গড়নের এক যুবতী সম্ভবত আপন দেহসৌষ্ঠব দেখানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। শোভাযাত্রা থেকে পশ্চিমদেশীয় এক যুবক হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে রঙ

মাখিয়ে দেয় এবং অশ্লীল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে। আমাদের ভাল করে কিছু বোঝার আগেই ঘটনাটা ঘটে। আমার প্রস্তাবে হোলির রাজা তখনই তাকে শোভাযাত্রা থেকে বের করে দেন এবং বিকেল পাঁচটায় মহারাজার সামনে হাজির হতে আদেশ দেন।

যুবক তার ভাইকে নিয়ে যথা সময়ে আসে। সকালবেলায় তার সেই অশোভন আচরণের হেতু সম্বন্ধে তার ভাই বলে, 'ধর্মাবতার! সুসঙ্গে সে প্রথম এসেছে। হোলি উৎসবেও প্রথম যোগ দিয়েছে। আমাদের দেশে হোলিখেলায় মেয়েরা সাধারণত বাইরে আসে না। যদি বাইরে আসে তবে তাদের আমরা গালমন্দ করে রঙ মাখিয়ে দেই। এটাই রীতি। এখানকার রীতি আমার ভাই জানত না। এবার আপনার যেমন ইচ্ছে বিচার করুন।' তারা ছিল যুক্ত প্রদেশের বৈশ্য। সুসঙ্গে মাধ্যমিক ইংরেজি স্কুলে তার ভাই আমার সহপাঠী ছিল। যতদূর খবর জানি তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় তারা ভদ্র পরিবারের সন্তান। তবু ঠাট বজায় রাখতে হোলির রাজা তাকে পঁচিশ টাকা জরিমানা করেন। আমরা এক মনুষ্য পরিবারভুক্ত। তবু এক ধর্মের মানুষ একই দেশের পৃথক আঞ্চলিক রীতি মেনে চলে। প্রাচীন ভারতের আর্ষদৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়েছিল। তাই শাস্ত্রীয় রীতি থেকে পৃথক হলেও তাঁরা আঞ্চলিক লোকাচারের অনুকূলেই মত দিয়েছেন।

সুসঙ্গে দেবী দুর্গার পূজা গুরুত্বে হোলি উৎসবের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তিন রাজবাড়ি একসাথে মিলে খুব জমকালো ভাবে এই পূজা করে এসেছেন। শাশ্বত সনাতন ধর্মীয় পরিধির মধ্যে সুসঙ্গে যত অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে প্রতীক-মূলক এই পূজাই পরগণাবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে সক্রিয় ভাবে আকর্ষণ করেছে। এই শক্তি পূজার উল্লেখযোগ্য অঙ্গই ছিল মোষ, পাঁঠা আর পায়রা উৎসর্গ। প্রাকৃত শক্তির উপাসক গারো, এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানরাও মাঝে মাঝে যথারীতি বলিদানের জন্য প্রাণী মানত করে এসেছেন। বিশেষ অধিকারে বলিদান করা মোষ গারোরা পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছেন। প্রাণী উৎসর্গের মধ্যেই যে অনুষ্ঠান শেষ হতো তাই নয়, তার পরেও প্রথামতো হাতির শোভাযাত্রা, খেলোয়াড়দের মল্লযুদ্ধ আর ভেড়ার লড়াইও হয়েছে। আগে প্রতি বছর যেভাবে খেদা করে হাতি ধরা হয়েছে তার সূচনা নির্দেশ হিসাবে বিজয়া-দশমীর দিন আমাদের হাতিগুলো গারোপাহাড়ের দিকে চলে যেত। মুসলমান পাইকরাও তখন রাজত্বের মর্যাদাব্যাঞ্জক তকমা পরেছে।

সব অনুষ্ঠান উৎসবে রানীদের সম্মান জানাতে হাজং, বানাই আর মনিপুরী মেয়েরা এসে অন্দরমহল চত্বরে ভিড় করেছেন। তাঁদের মধ্যে রানীরা সধবা মেয়েদের কপালে, হাতের শাঁখায় সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং সকলকে পানসুপারি বিতরণ করেছেন। তাঁরাও প্রতিদানে রানীদের আনুগত্য জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে কিছু গারো মেয়েও পানসুপারি নিয়ে রানীদের সম্মান করেছেন।

কমিউনিস্ট কর্মীরা হাজং অঞ্চলে ব্যাপক হিংসাত্মক প্রচার করে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে হাজং মেয়েদের যোগ দিতে বাধা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে তার প্রভাব পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুসঙ্গবাসীর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সে ঐতিহ্যকেও রক্ষা করা সম্ভব হলো না। মধ্যমবাড়ির মামলাপ্রিয় আর আপোস বিরোধী মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সম্ভবত 'মধ্যম' বলেই তাঁরা বড় বাড়ির প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁরা এক মামলা দায়ের করার ফলে ১৯৩২ সালে পূজা ভাগ হয়ে যায় এবং মন্দিরে পূজার সময় বড় আর ন'বাড়ির যুক্ত প্রতিমা এবং মধ্যম বাড়ির একক প্রতিমা পূজার প্রচলন হয়। এই ব্যাপারে জনসাধারণও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। সে পরিবেশ আমার কাছে এতই অস্বস্তিকর হলো যে, রাজবাড়ির পূজামণ্ডপ বর্জন করে আমি এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাড়ির পূজায় যোগ দিয়েছি।

দশভূজা মন্দির প্রাঙ্গনে চারদিক খোলা প্রকাণ্ড নাট মণ্ডপটা ১৯৪৩ সালে ভেঙে ফেলা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা এই ঘটনায় যে কত ব্যথিত হয়েছেন সেকথা না বললে তার স্বরূপ বোঝা যাবে না। সেবার কয়েকজন হাজং খারনৈ থেকে স্বজনদের দেখতে নলিতাবাড়ি যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তাঁরা যথারীতি মন্দিরে দেবী দশভূজাকে প্রণাম করে যান। প্রায় দু মাস পরে ফিরে এসে মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন যে, তাঁদের এত সাধের সেই নাট মণ্ডপটা আর নেই। তাঁরা দুঃখ করে বললেন, "ঝগড়ুটে রাজারা এটা কি করেছে? আমাদের নাট মন্দিরটাও তারা ভেঙে দিয়েছে?" এ উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, রাজারা শুধু নন, সুসঙ্গের জনগণও দেবী আর মন্দিরকে কত আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, সুসঙ্গ পরগণার প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন দশভূজা, রাজারা তাঁর হয়েই রাজ্য চালান। পুরুষানুক্রমে সযত্নে লালিত এই লৌকিক প্রীতিবন্ধন আমাদের সমকালীন অবিবেচক, আত্মপরায়ণ এবং খেয়ালী তথাকথিত শিক্ষিত উত্তর পুরুষদের কল্পনা শক্তির অভাবে শিথিল হয়ে যায়। আমাদের গ্রাম্যজীবনের নৈতিকমান এতকাল যার প্রভাবে অর্থবহ হয়ে ছিল তার সঙ্গে সমতালে চলার যোগ্যতা এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের একেবারেই ছিল না।

একবার পৌষ মেলার সময় আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সে উৎসব জমকালো বিজলী আলো, পণ্যবীথি, উচ্চাঙ্গের বাউলগান, আর দেশী যাত্রাভিনয় বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে সুসঙ্গের অষ্টমী মেলার কথা মনে পড়ছে। অষ্টমী মেলা আরো প্রাণবন্ত ছিল। তিন রাজবাড়ি আর বড় বাগানের মাঝামাঝি হাতির পিলখানার কাছে মস্ত মাঠে এই মেলা বসত। মেলায় কৃষিভিত্তিক এবং আদিবাসী সমাজ ঘেঁষা গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় তাঁত, কাঁসা, পিতল, কাঠ, বেত ইত্যাদির তৈরি শিল্পদ্রব্যের সমাদর ক্রমেই বাড়ছিল, তাছাড়া গারো, হাজং আর স্থানীয় হস্তশিল্পের পণ্যসম্ভার, মৈমনসিংহ,

কলকাতা থেকে আমদানী করা আধুনিকতম বিদেশী খেলনা আর প্রসাধন দ্রব্যের কী বিচিত্র সমাবেশই না দেখা যেত! এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরি জোড়া মাটির খেলনার জন্যে ছেলেবেলায় আমাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। স্থানীয় ফল, আনাজ, কচ্ছপ, মাছ, হরিণের বাচ্চা, ভালুকের বাচ্চা, উল্লুক, বানর, শুকমাশুল, প্রকাণ্ড ময়াল সাপ, তিত্তির, মুনিয়া, দুর্গাপাখি, ধনেশপাখি, উল্লাময়ূর, বুনোহাঁস বুনো মুরগী, বেতের লাঠি ইত্যাদি : প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে আয়না, সাবান, বিশেষ করে ঢাকাই শাঁখা, চুড়ি, টর্চলাইট, মিলের ধুতি, শাড়ি ইত্যাদির সমাবেশ মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। মিষ্টির দোকানও বসত। পরবর্তী কালে ছোটখাটো হোটেল আর রেস্টুরেন্টগুলো মেলা যাত্রীদের খাবার সরবরাহ করে সমাজে অস্পৃশ্যতার কড়াকড়ি শিথিল করে দিয়েছে। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ১৯৪০ সালের কাছাকাছি নাগর দোলা, এমন কি সার্কাস দলও এসেছে। একবার এক ছায়াছবির অনুষ্ঠান বেশ ভালো পয়সা উপার্জন করেছে। সুসঙ্গের গ্রাম্য পরিবেশে মনোরঞ্জনের জন্যে শহর থেকে আমদানী করা সেসব অনুষ্ঠান বড় বেশী বেমানান মনে হয়েছে।

শ্রীহট্ট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ আর সেরপুর থেকে মেয়েরা গরুগাড়ি চড়ে এসেছেন। আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে সার করে গাড়িগুলো যেত। গাড়িতে বাঁশের চাটাইয়ের ছাউনী, প্রবেশপথ পরদা ঢাকা। সেই পরদার ফাঁকে উঁকি দিয়ে মেয়েরা বাইরের জগৎটা দেখতে দেখতে যেতেন। যতদূর মনে হয় মুসলমান মেয়েরা মেলা দেখতে আসেননি। গারো পাহাড়ের দূর দূর অঞ্চল থেকে গারো মেয়ে পুরুষ দলে দলে মেলায় এসেছেন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেলা যাত্রী হিন্দুরা সাধারণত সোমেশ্বরীতে স্নান করে প্রথমে দশভুজা মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন। পরে মেয়েরা রাজবাড়ির অন্তঃপুরে গিয়েও প্রণাম করেছেন।

মেলার তৃতীয় দিন একটু বেশী রাত অবধি দোকান খোলা থাকত। সেদিন শুধু মেয়েরা মেলা দেখতেন এবং পছন্দ মতো জিনিস কিনতেন। বিক্রেতারা স্বাভাবিক কারণেই কিছু লাভের আশায় এই দিনটার জন্যে অনেক প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতেন।

১৯২৫ সালের পর থেকে রানীরা এবং রাজকুমারীরা মেলায় যাওয়ার অনুমতি পান। পালকি করে যাওয়ার সময় তাঁরা আর্দালি, কর্মচারী আর পাহারাওয়ালা পরিবৃত হয়ে গিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, দোকানীরা পরম আগ্রহে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন। পালকি দোকানের সামনে এলে রানীদের দেখার জন্যে দরজা যতখানি না খুললে নয় ঠিক ততটুকুই খোলা হয়েছে। তখন থেকেই পর্দা-প্রথা শিথিল হতে থাকে। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। কারণ, মেলায় যাওয়ার দাবিটা একেবারে অন্তঃপুরের কেন্দ্র থেকেই উঠেছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে পরিবারের প্রগতিপন্থী আর রক্ষণশীলদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। কিন্তু প্রবীণরা শেষ

পর্যন্ত পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। প্রায় এক দশক পরে রাজপরিবারের কোন কোন মহিলা হাতি চড়ে বেড়িয়েছেন। ১৯৪২ সালে প্রথম আর শেষবারের মতো আমি সুসঙ্গের মহারানীকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাতি চড়ে পাহাড়ে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছি।

মেলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মুসলমান ক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে গারো মেয়েদের কাছে সওদার জন্যে দল ভারী করে যেতেন তাই নয়, তাঁরা সে সুযোগে মেয়েদের আবরণশূন্য নিটোল বক্ষদেশটুকু কাছে থেকে দেখার প্রলোভন সংযত করতে পারতেন না। শহুরে মানুষদেরও সে দুর্বলতা ছিল। অবশ্য অপ্রীতিকর কোন ঘটনার জন্যে রাজারা কঠিন ব্যবস্থা নিয়েছেন। সে দায়িত্ব পরে সরকারী পুলিশের হাতে চলে যায়। কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার দায়িত্ব স্থানীয় কোন সজ্জন মুসলমান 'গাঁওবুড়া' বা 'মাতব্বর' এগিয়ে এসে গ্রহণ করেছেন। বাংলা-দেশে বহু স্থানে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠুরতা ঘটেছে। পরগণাবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু সৎ লোকের প্রভাবে সুসঙ্গে কিন্তু তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ভাগ্য বিপর্যয়ে রাজপরিবারের অবস্থা পরিবর্তিত হলেও মেলা যথারীতি পরিমিত আকারে বসেছে। আমি শুনেছি পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশে) ১৯৫৮ সালেও মেলা হয়েছে। অবশ্য দর্শনীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাহাড়ী গারোরা আর মেলায় যোগ দেননি। পুলিশী সন্ত্রাস আর কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় হাজংরাও মেলায় আসা বন্ধ করে দেন। বর্ণাঢ্য মনিপুরীরাও ইতিপূর্বে সুসঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

আমাদের ছেলেবেলায় দেখা অধুনা বিলুপ্ত সুসঙ্গের ভূপ্রাকৃতিক কিছু ছবি মনে আসছে। সাধারণত জানুয়ারি মাসে ফসল কাটা শেষ হলে প্রায় তিন চার মাস ধরে খরার প্রকোপ চলে। মে মাসের মাঝামাঝি বর্ষার স্নিগ্ধ বারিবর্ষণে উত্তপ্ত প্রকৃতি শীতল হয়। সুসঙ্গ আর শ্রীহট্টের বিস্তীর্ণ 'প্যাম্পাস' বা তৃণভূমিগুলো ধীরে ধীরে তাদের অপূর্ব শ্যামসমারোহ মেলে ধরে। তখন দেখেছি যে, সোমেশ্বরী নদী পার হয়ে পশুপালকদের সঙ্গে মোষের দলগুলো পূবে সেই তৃণভূমির দিকে চলেছে। তারা ভ্রাম্যমাণ সেই পশুগুলোকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় বিশ্রাম করেছে এবং যাযাবর জীবনের আস্তানা গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। সে সুযোগে আঞ্চলিক পশুপালকরা মোষ কিনে নিজের পশুসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বড় বাগানের উত্তর পূর্বে পাহাড়তলীর কাটা ফসলের ক্ষেতে সেই মোষের দল নিয়ে পশুপালকরা তাদের যাত্রাপথে কিছুকাল থেকে যেত। আমাদের পরিচিত এই দৃশ্যপটে হঠাৎ এতগুলো পশু আর পশুপালকের সমাবেশবৈচিত্র্যে আমরা কত আনন্দই না পেয়েছি! সুদূর বিহারের হরিহরছত্রের মেলা বিশেষ করে গৃহপালিত পশুর জন্যে বিখ্যাত। এই মেলার সূত্রে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক ছোট ছোট মেলা হয়। ছত্রের মেলা থেকে সেই পশু দেশের সর্বত্র যায়। পশু-পালকেরা যে মোষের দল নিয়ে এদিকে আসত তাদের যাত্রা শুরু হতো সেই মেলা

থেকে। আমি শুনেছি যে, তারা সুদূর চট্টগ্রামেও যেত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা অসংখ্য ছোট বড় নদী সাঁতার দিয়ে পার হতো। পথশ্রমে বা রোগাক্রান্ত হয়ে কত মোষ যে মৃত বা অর্ধমৃত অবস্থায় পরিত্যক্ত হতো তার ইয়ত্তা নেই। সে-সুযোগে চর্মকাররা প্রচুর চামড়া সংগ্রহ করত।

উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে কিছু ব্যবসায়ী গৃহপালিত পশু নিয়ে মাঝে মাঝে সুসঙ্গে আসতেন। স্থানীয় লোকদের কাছে তাঁরা 'কুরপান আলি সদাগর' নামে পরিচিত। বিক্রির জন্যে তাঁরা সুদর্শন টাট্টু ঘোড়া, উট, এমনকি হাতি পর্যন্ত আনতেন। সুসঙ্গে তাঁদের হাতি আমদানির ব্যাপারে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'র সেই প্রবাদ বাক্যই যেন বাস্তব প্রহসনে রূপান্তরিত হতো। কারণ, সুসঙ্গের অরণ্যে স্থলচর জন্তুর মধ্যে সর্ববৃহৎ এই প্রাণীর সংখ্যা তখনও প্রচুর এবং মুঘল আমলে যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎকৃষ্টতম হাতি সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে সুসঙ্গের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে আমার পূর্বপুরুষগণ গারো পাহাড়ে তাঁদের অধিকার হারান। তারপর থেকে ইংরেজ সরকার আসাম ছাড়া বাইরের লোকের ক্ষেত্রে হাতি ধরার ব্যাপারে কঠোর নীতি অনুসরণ করেছেন। ১৯০৫ সালে আমার বাবা একবার সরাসরি হাতি ধরার সরকারী অনুমতি পেয়েছিলেন। আর একবার ১৯১৪-১৫ সালে খেদার ব্যাপারে তাঁকেও ইজারা নিতে হয়েছিল। আসামে এক শিল্পপতির অধীনে ১৯২৩-২৪ এবং ১৯২৪-২৫ সালে আমি দুবার হাতি খেদা দেখার সুযোগ পেয়েছি। সুসঙ্গ রাজপরিবারের উদ্যোগে সেই দুই খেদার পরে আর হাতি ধরা হয়নি।

১৯৩৩ সালের এক ঘটনা। দেবালয়ের কর্মচারী শ্রীরমাপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয় একদিন ভোরে এমন এক দুঃসংবাদ বহন করে আনেন যাতে আমাদের ধর্মভীরু পরিবারই শুধু নয় গোটা পরগণার মানুষও হতবাক হয়ে যান। সে রাত্রে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবী দশভূজার সঙ্গে অন্যান্য কিছু বিগ্রহও অপহৃত হলো। সে সংবাদ অতি দ্রুত সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়। বাড়ির মেয়েরা কাঁদতে শুরু করেন। আমাদের অনেকেই হতবিহ্বল হয়ে প্রায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু দেবী মূর্তি উদ্ধারের সব চেষ্টাই বিফল হয়। সবাই মনে করলেন যে, এই অশুভ ঘটনা কোন আকস্মিক দুর্যোগের ইঙ্গিত।

কিছুকাল পরে, হয়ত সেই দৈব ঘটনাক্রমেই, এক জুলাই মাসে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। অন্ধকার আকাশ তিন দিন ধরে এক ভয়ালরূপ ধারণ করে। চতুর্থ দিন সোমেশ্বরীতে অভূতপূর্ব বন্যা দেখা দেয়। বন্যার জলে ক্রমে রঙমহলের কতগুলো সিঁড়ি ডুবে যায়। নদীর ধারে যারা বাস করত তাদের ঘরদোর সব ভেসে যায়। তারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেবালয় প্রাঙ্গনে আর স্টেটের কাছারি বাড়িগুলোতে আশ্রয় নেয়। এদিকে বন্যা-স্ফীত নদী কুঁড়েঘর, বড় বড় গাছ আর পশুর শবগুলো তার তীব্র ঘূর্ণিপাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে দৃশ্য বড়ই ভয়াবহ! আমি তখন প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। সে অবস্থার মধ্যেই কাকা

নীরদচন্দ্র পরিবারের সমস্ত সক্ষম লোক, কর্মচারী আর গ্রামের উৎসাহী যুবকদের সাহায্যে সম্ভবপর সাহায্যের সব ব্যবস্থা করেন। বন্যার প্রথম ধাক্কাতেই মৈমনসিংহের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডাক ও তার সংযোগও বিপর্যস্ত হয়। নদীর ঘাটে বাঁধা অধিকাংশ নৌকোও বন্যায় ভেসে যায়। তাই জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্যের সংবাদ পাঠাতেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। অবশেষে বহু চেষ্টায় একটা নৌকো পাওয়া মাত্র অবস্থার বিবরণ দিয়ে মৈমনসিংহ এবং নেত্রকোনায় সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্য চেয়ে পাঠাই। এই দুই অঞ্চলের জমিদার, ব্যবসায়ী আর আইনজীবিরা মুক্তহস্তে আমাদের বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। বন্যাত্রাণের দায়িত্ব নিয়ে আমি স্থানীয় যুবকদের প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যম দেখেছি। উপযুক্ত নেতৃত্বে কোন সাংগঠনিক কাজে তাদের অপরিমেয় সাহায্য পাওয়া যায়। কোঁদা নৌকোয় করে স্বেচ্ছাসেবকদল পরগণার দূরদূর গ্রামেও গিয়েছে। প্রথম দল ফিরে এসে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিয়েছে। বহু সমৃদ্ধ গ্রাম আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়। সেবার বন্যায় পুরোনো একটা জলের খাত শুকিয়ে গিয়ে তার পাশাপাশি আর একটা প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি আর খেয়াল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মঙ্গলময় রূপও প্রকট হয়। যেখানে ফসল বেশী হতো না বন্যার পলিমাটিতে সেই জমিগুলো অস্বাভাবিক ভাবে উর্বর হয়ে যায়। সুসঙ্গবাসীর বিশ্বাস দেশের রক্ষাকর্ত্রী দেবী দশভূজার অন্তর্ধানে আকস্মিকভাবে এই দুর্যোগ দেখা দেয়। তাঁদের সে বিশ্বাসের সঙ্গে, কোন দ্বিধা না করে, আমি নিজেকেও যুক্ত করেছি।

আমাদের গ্রাম্য জীবনে কলেরা বা বসন্তের মতো ব্যাপক মহামারীর স্মৃতি আজও ক্ষীণ হয়নি। পূর্বে ধর্মীয় নীতিবোধের প্রভাবে হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণত মলাদিদ্বারা নদীর জল দূষিত করতেন না। এতে কলেরা রোগের প্রসার ব্যাহত হতো। কালক্রমে এই সংস্কারের প্রভাব লোপ পেয়েছে। ফলে গ্রামে গ্রামে মহামারীর তাণ্ডব ঘটে গিয়েছে। গ্রামবাসীর সেই দুর্দিনে নোয়াখালী বা অন্যান্য অঞ্চলের কিছু ফকির এসে তাদের অদ্ভুত যাদুবিদ্যাবলে কলেরা অপদেবতাকে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে তাড়িয়ে বেড়াতেন। আমাদের পরগণায় এই বিদ্যা 'চালান' নামে পরিচিত। একটা বাঁশের ডগায় মাটির সরা বেঁধে তাঁরা কলেরা অপদেবতার গন্তব্য পথ নির্দেশ করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন গ্রামের কয়েকজন মুসলমান এক ফকিরকে প্রায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার কাছে নিয়ে আসেন। ব্যাপার দেখে আমি তো অবাক! তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, কোনও এক গ্রামে মহামারী কমে এসেছে। সে সুযোগে এই ফকির সে গ্রামের এক কলেরা রোগীর মল এনে তাদের একমাত্র পানীয় জলের পুকুরটা অন্ধকারে নষ্ট করতে যাচ্ছিল। তাকে দেখে একটা কুকুর চীৎকার করে উঠে। তখন একজন লোকের ঘুম ভেঙে যায় আর ফকিরও হাতেনাতে ধরা পড়ে। সেই গ্রাম থেকে কলেরা-অপদেবতাকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে

কদিন থেকে ফকির যে ক্রিয়াকাণ্ড করে পরিণামে এভাবে তার দুষ্কর্ম প্রকাশ হয়ে যায়। এই ঘটনায় 'চালান' ক্রিয়া রহস্যের কিছু আভাস পেয়েছি। কিন্তু সেকালে এক হিন্দু জমিদারের পক্ষে সে ধরনের কোন বিচারের দায়িত্ব নেওয়া কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত হতো না; তাই অপরাধীকে পুলিশের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেই।

১৯১৮ সাল, এপ্রিল মাস। সেদিন বিকেলবেলায় আমি ঘোড়ায় চড়ে গারো পাহাড়ের সানুদেশ অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলাম। ছোট এক পাহাড়ী নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে অদূরে কিছু নরকঙ্কাল নজরে পড়ল। মাত্র কয়েক গজ দূরেই ফান্দা গ্রাম। সেখানে গারো আর হাজং দু'সম্প্রদায় লোকের বাস। হাজংরা সেই নদীর জল ব্যবহার করে এসেছেন। ফলে কলেরা জীবাণু দ্বারা দূষিত সেই পানীয় জলে প্রায় পঞ্চাশটা হাজং পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অথচ গারোদের তেমন ক্ষতি হয়নি। আমার ধারণা গারোদের পানীয় জল সংগ্রহের বিশেষ পদ্ধতি তাঁদের রক্ষা করেছে। তাঁদের উদ্ভাবিত রীতিতে তাঁরা বাঁশের নলের সাহায্যে পাহাড়ী ঝর্ণার বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন।

১৯৩২ সালে এক সন্ধ্যায় আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। পথে হঠাৎ পদ্মু বানাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার প্রিয় এবং অভিজ্ঞ পাঙ্গালীদের মধ্যে সেও ছিল একজন।

সোমেশ্বরীর ধারে, ফারং পাড়ার শেষে এক শিমুল গাছের কাছেই তার বাসা। পদ্মু তখন পাগলের মতো টলছে আর অবান্তর কথা বলে যাচ্ছে। ভাবলাম সে নেশায় বিভোর হয়ে আছে। তাই না বুঝে প্রথমেই বেশ একচোট বকুনি দিলাম। কিন্তু একটু পরেই আমার আচরণে আমি লজ্জা পেলাম। কারণ, একটু আগেই সে তার বৌ আর দু'তিনজন ছেলেমেয়েকে আধপোড়া অবস্থায় মাটিতে পুঁতে এসেছে। শুধু তাই নয়, তার পরিবারের অন্য সবাই তখনও কলেরায় ভুগছে। সর্বনাশের কবলে পড়ে মানুষটা যে পাগলের মতো হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কি? শুনেছি যে, ফারং পাড়া গ্রামে ইতিমধ্যেই প্রায় তিরিশ জন লোক মারা গিয়েছে, আরও তিরিশ জনের মতো লোক তখনও ভুগছে। কালবিলম্ব না করে গ্রামের গারো, হাজং আর বানাই সম্প্রদায়-প্রধানদের ডেকে বললাম যে, আগামীকাল সকালে আমি ডাক্তার এবং কলেরার ওষুধ নিয়ে আসব। গ্রামের সবাইকে নিয়ে তাঁরা যেন সেই গাছতলায় অপেক্ষা করেন। পরে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়িতে এসেই সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর এবং একজন বেসরকারী ডাক্তারকে ডেকে ফারং পাড়ায় রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে বললাম। পরদিন সকালে কলেরার ওষুধ সংগ্রহ করে চিকিৎসক শ্রীপ্রমোদচরণ রায় মহাশয় একজন সহকারী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সেই শিমুল গাছতলায় হাজির হলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। তাঁরা বিশ্রাম না নিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেদিন প্রায় পাঁচশ লোককে টীকা দিয়েছেন। দায়িত্বসম্পন্ন লোক যথাসময়ে সজাগ

হলে রোগ প্রতিরোধক আধুনিক ওষুধ সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞ আদিবাসীদের কাছ থেকেও সহযোগিতা পাওয়া যায়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। নাজির-পুরের পূর্বদিকে তখনও বেশ জঙ্গল ছিল। খবর পেলাম যে, একটা বড় বাঘ সেখানে আস্তানা নিয়ে প্রায়ই গৃহস্থদের গরু, মোষ মারছে। ১৯৩০ সালের মে মাসে যেদিন আমরা বাঘশিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি সেদিন বেশ গরম পড়েছে। হাতি চড়ে যেতে যেতে পথে অনেকেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও বিশুদ্ধ পানীয় জল দেখা গেল না। ছোট ছোট পাহাড়ী নদীনালা বা ঘোলাটে ডোবা যা নজরে পড়ল সেই সংক্রামক রোগাক্রান্ত গবাদি পশুর অর্ধমৃত বা মৃত গলিত শবে দূষিত হয়ে আছে। অবশেষে একটা জলের ডোবা পাওয়া গেল। তার ধারেকাছে কোন পশুর মৃতদেহ দেখা গেল না বটে, কিন্তু অনতিদূরেই ক্রুশ চিহ্নিত কতগুলো নতুন কবর দেখে আমি বেশ ভয় পেলাম। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে খড়ে ছাওয়া একটা কুটিরের দাওয়ায় একজন লোক বসেছিল। মাছির উপদ্রবে সে তার মুখটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেই কবরগুলোর কথা এবং সর্বশেষ মৃত ব্যক্তির রোগের খবর সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের জবাবে সে গম্ভীর স্বরে ছোট উত্তর দিয়ে বলে, 'বসন্ত রোগ'। আর কোন রোগী আছে কিনা জানতে চাইলে সে বলল, 'আজ্ঞে, আছে। আমি নিজেই রোগে ভুগছি।' ছাওয়ায় বসে সে শুধু তার প্রিয়জনদের কবর দেওয়া দেখে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনও চিত্তবিকার দেখিনি। আমি অবাক হয়ে শুধু ভেবেছি যে, 'মৃত্যু'কে কেন্দ্র করে আমাদের চিরন্তন জিজ্ঞাসা আর মৃত্যু এদের কাছে এতই মামুলি ব্যাপার যে, সে সম্বন্ধে এরা একেবারে নির্বিকার।

সুসঙ্গ পরগণায় জনসমষ্টির চাপ আগে বেশ কম ছিল। তখন প্রয়োজনমতো কোন স্রোতস্বিনী বা গভীর জলাশয়ের ধারে মানুষের আবাস গড়ে উঠেছে; তাই পানীয় জলের অভাব তেমন ছিল না। ক্রমে আগন্তুক লোক-সংখ্যা বাড়তে থাকে, বসতিও বিশৃঙ্খল ভাবে তৈরি হতে থাকে। ফলে পানীয় জলের অভাব এবং তার অনুষঙ্গ হয়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে। সে অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ তাঁদের মধ্যে অবাধ বিবাহরীতি প্রচলিত; উপরন্তু বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে তাঁদের স্বজাতিগণ রুজি রোজগারের আশায় ক্রমেই এখানে আসতে থাকেন। তুলনামূলক ভাবে হিন্দু সমাজে বহু বিধবা যুবতী হওয়া সত্ত্বেও বৈবাহিক বাধা নিষেধের ফলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। পাহাড়তলী অঞ্চলে আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক কারণে মাঝে মাঝে মানুষ যে শুধু মহামারীর প্রকোপে পড়েছে তাই নয়, তারা বন্যপ্রাণীর আক্রমণেও প্রাণ হারিয়েছে। জেলেদের মধ্যে দশঘর 'ঝালো' আমাদের এক জঙ্গল মহালে বসতি করেন। তাঁদের কাছ থেকে কোন 'নজর' নেওয়া হয়নি, প্রথম তিন বছর তাঁরা খাজনাও দেননি। অথচ মুসলমান সম্প্রদায়

একর পিছু জমির জন্যে একশ থেকে দুশ টাকা পর্যন্ত নজর দিয়ে সে অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। প্রথম বছর থেকেই তাঁরা নির্দিষ্ট হারে খাজনাও দিয়ে এসেছেন। যা হোক, প্রায় দশ বছর পরে একবার সেখানে গিয়ে সেই ঝালোদের খোঁজ করেছি। তাদের মধ্যে মাত্র একজন রোগগ্রস্ত পুরুষ আর দু-একজন বিধবা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। কিছু লোক জ্বরে ভুগে মরেছেন, বুনো মোষের আক্রমণে একজন প্রাণ দিয়েছেন, দুজনকে গোখরো সাপ ছোবল দিয়ে মেরেছে, একজন বাঘের পেটে গিয়েছে এবং আর একজন মুসলমানের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ভাবলে বিস্ময় হয় যে, এই জেলে সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ একসময় জীবনসংগ্রামে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, বংশবৃদ্ধি করে সৌভাগ্যের অধিকারীও হয়েছেন। পববর্তী কালে তাঁরা মুসলমানদের কাছে কেন অসমকক্ষ প্রতিপন্ন হন সে প্রশ্ন সমাজতাত্ত্বিকগণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। অবশ্য দেশবিভাগেব পরে সে অঞ্চলে এই সমস্যার অস্তিত্ব আর নেই।

আমার পরিচিত কিছু লোকের মধ্যে বহুলাংশে সুসঙ্গের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রভাব দেখেছি। সংক্ষেপে কয়েকজনের কথা বলছি।

আমার ছেলেবেলায় একদিন রাজবাড়িতে একজন গারোকে দেখেছি। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর মাথায় ছিল পাগড়ি, গায়ে কোট, কানের লতিতে কয়েকটা আংটি আর পরনে একটা ছোট ধুতি। তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। তবু তাঁর মধ্যে শক্তি সামর্থ্য আর মর্যাদার এক ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি একটা বেঞ্চে বসেছিলেন। বাবার সামনে কোন গারোকে কখনও বেঞ্চিতে বসতে দেখিনি। বাবা অর্থাৎ মহারাজকে দেখতে এলে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী কোন কোন বিশিষ্ট তালুকদার আর কয়েক শ্রেণীর কর্মচারী এলে বেঞ্চিতে বসেছেন। বাবা সেই গারোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিও সম্ভ্রমে আনত হয়ে পাহাড় থেকে আনা একটা হরিণের বাচ্চা আর একটা কালো উল্লুক আমাকে উপহার দেন। সেগুলো দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হলেও তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিনি। প্রতিদানে বাবাও তাঁকে চীনে মাটির একটা বিলিতি কুঁজো আর রুপোর একটা গেলাস দিলেন। তিনি ছিলেন গারো পাহাড়ের বিখ্যাত বং লস্কর। তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তির অনেক কাল্পনিক গল্প আমরা শুনেছি।

গারো পাহাড়ে কোন কোন অঞ্চলে আইনত যাঁরা জমির মালিক বা সর্দার অর্থাৎ নক্‌মা, তাঁরাই লস্কর নির্বাচন করেন। আসামের চীফ কমিশনার সাহেবের অনুমোদন ক্রমে সেকালে নির্বাচনের পরে যথারীতি তাঁর অনুষ্ঠান হয়েছে। পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন অনেকটা পুলিশের কর্মকর্তা আর জেলা শাসকের ছোটখাটো প্রতিনিধির মতো। গারো পাহাড়ে সুসঙ্গ রাজপরিবারের প্রভাব রোধ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার বং-কে গারো পাহাড়ের প্রধান লস্কর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হলেও গারোদের সঙ্গে সুসঙ্গ

রাজাদের চিরাচরিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বং লস্কর যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। পুরুষানুক্রমে সুসঙ্গের মহারাজাকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কখনও ত্রুটি হয়নি। বং অথবা তাঁর সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লস্করদের প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্মান সম্বন্ধে বাবা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। আমরাও সে রীতি অনুসরণ করে চলেছি।

ধীবর বা জেলে সম্প্রদায় আমাদের আদিপুরুষ সোমেশ্বরকে সুসঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। দয়া মণ্ডল সরাসরি তাঁদের উত্তর-পুরুষ ছিলেন। ঐতিহ্য সূত্রে সুসঙ্গের জেলে সম্প্রদায় কিছু সুবিধে আর বিশেষ অধিকার ভোগ করে এসেছেন। সুসঙ্গ স্টেট ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও এজমালি স্টেটের শরিকরা যখন তিক্ত কলহে লিপ্ত তখনও কোন অজ্ঞাত কারণে দয়া মণ্ডল রাজপরিবারের পদবীভূষিত প্রধানের প্রতি অনুরক্তি দেখিয়েছেন। ঈর্ষা-পরায়ণ শরিকরা প্রায়ই অবাঞ্ছিত রূপে তাঁকে অপমান করেছেন। তৎসত্ত্বেও রাজপরিবারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি অবিচল ছিল। জেলেদের সর্দার হিসাবে পরগণা জুড়ে তাঁর প্রভূত ক্ষমতা আর প্রভাব ছিল। তবু বং লস্করদের চেয়ে তিনি অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন।

দয়া মণ্ডলের সঙ্গে আগাগোড়াই আমার প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রথমদিকে গারো পাহাড়ে যেতে তাঁকে বন্ধু আর পথনির্দেশক হিসাবে পেয়েছি। শিজু পাহাড়ের উত্তরে জাংখে পর্যন্ত সোমেশ্বরীর দুধারে সমস্ত গ্রামের নকমা আর লস্কররা তাঁকে যে কত প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা দেখেছি। গারো পাহাড়ের একেবারে অন্তর্বর্তী অঞ্চলবাসী গারোদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে দয়ার কাছে বহু নির্দেশ পেয়েছি। ইতিহাসের যাত্রাপথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐতিহ্যসূত্রে রাজপরিবারের ভাগ্য নিবিড় বন্ধনে বাঁধা ছিল। মানুষের সমাজে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে; কঠিন আঘাতে সে সম্পর্ক বিপর্যস্ত হলে তার মোড় ফেরানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে রাজপরিবার পরগণার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাপ্য সম্মান আর বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের ঐতিহ্যগত কর্তব্যবোধকে উপেক্ষা করেছেন। পরিবারের নৈতিক অবক্ষয় এভাবেই সূচিত হয়।

পলুকে আমি প্রথম দেখি ১৯০৩ বা ১৯০৪ সালে। তখন তাঁর বয়স সম্ভবত সত্তর বছরেরও বেশী। আন্তরিকতাপূর্ণ বেঁটেখাটো গড়নের মানুষটির মধ্যে ছিল অন্তরস্পর্শী দৃষ্টি। প্রথম সারির একজন 'খুঁজি' এবং নির্ভীক কৌশলী শিকারী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৮৯০ সালে সুসঙ্গরাজার বিরুদ্ধে হাজংরা যখন বিদ্রোহ করেন, তখন পলু হাজং একা তাঁর স্বজাতির বিপক্ষে রাজাদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, রাজারা পরগণায় হাজংদের এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আগাগোড়া সমর্থন করেছেন; তাই হাজংদের প্রতি তাঁরা কোন অন্যায় বা অবিচার করতে পারেন না। শোনা যায় যে, হাজংরা পলুর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাঁকে জ্যান্ত অবস্থায় পুড়িয়ে

মারার চেষ্টাও করেছেন। সেসব ঘটনার দীর্ঘকাল পরে পলুর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়েছে, তখন তাকে একজন সুযোগ্য খুঁজি আর অরণ্যজগতের শিক্ষক রূপে পেয়েছি।

আশী বৎসর অতিক্রান্ত হলে পলুর দেহে চর্মরোগ দেখা দেয়। সেটা কুষ্ঠ-ব্যাধি বলেই সন্দেহ হয়েছে। যা হোক, অন্তিম জীবনে পলু স্বেচ্ছায় যেভাবে মৃত্যুবরণ করেন, সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পলু একদিন রাজবাড়িতে এসে তাঁর শেষ অভিলাষ জানান। পরে দশভূজা মন্দিরে গিয়ে দেবী বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে চোখের জলে মনের অবরুদ্ধ নিদারুণ বেদনা উজাড় করে দেন। মন্দির থেকে ফিরে তিনি আবার প্রত্যেক রাজবাড়িতে যান এবং প্রত্যেকের পায়ে কপাল ঠেকিয়ে অশ্রুজলে শেষ সম্মান জানান। অবশেষে দেবী এবং রাজার প্রসাদ গ্রহণ করে বলেন যে, আগামীকাল ভোরে তিনি গুণেশ্বর শিখরে চলে যাবেন এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবেন। তাঁর সেই অচিন্তনীয় অন্তিম ইচ্ছা সকলকেই বিচলিত করে।

পরদিন ভোরে তিনি অভীষ্ট স্থানের উদ্দেশে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তাঁর দুই ছেলে এক মাসের মতো খাদ্য নিয়ে বালপাক্রাম শিখরে যম বা মৃত্যুদেবের মুখ নামে পরিচিত এক গুহায় তাঁকে পেঁাছে দিয়ে আসে। পলু আর ফিরে আসেননি। কয়েক বছর পরে আমি সেখানে গিয়ে পলুর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করেছি।

১৯১৫ সালের ঘটনা। তখন বড় জন্তু শিকারের প্রবল আকর্ষণে আমি প্রায় প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পাহাড়তলীর দিকে চলে যেতাম। একদিন সকালে প্রথমে একটা 'হগ্‌রা' হরিণ এবং খানিক বাদে একটা চিতাবাঘকে আয়ত্তে পেয়েও মারতে পারিনি। সঙ্গে স্টেটের এক কর্মচারী ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন "ঐতো বড় শিকারী জুঙ্গা ; সে থাকতে এত সুন্দর শিকার নষ্ট হল!" তাঁর কথা শুনে আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম অদূরে একজন গারো দুটো বলদ নিয়ে জমি চাষ করছে। সঙ্গী-কর্মচারী শ্রীনগেন্দ্র বাবু তাকে ডাকলেন। সে এসে সামনে দাঁড়াল। তার খেলোয়াড়সুলভ দৈহিক গঠন আর শিকারীর তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি দেখে আমি আকৃষ্ট হলাম, এবং মনে পড়ল বাবা ১৯০৫ সালে তাঁর খেদা-নোট বইতে জুঙ্গা নামে অসাধারণ সম্ভাবনাময় একজন মানুষের উল্লেখ করেছিলেন। একজন উৎকৃষ্ট পাঞ্জালী, আগ্নেয়াস্ত্র বাহক আর ক্যাম্পরক্ষী হিসাবেই তিনি তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই জুঙ্গা বনে-জঙ্গলে আমার সঙ্গী হয়ে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করেছে এবং বন্ধুর মতো আমাকে পরিচালনা করেছে। জঙ্গলে সে অলৌকিক কাজ করতে পারত। ছোট বড় যে কোন প্রাণীর চলাফেরার গোপন তথ্য সহজেই বলে দিতে পারত। তার বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। সেনাবাহিনীতে শিক্ষার সুযোগ পেলে সে নিঃসন্দেহে সুনাম অর্জন করতে পারত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৩৪ সালে শেষবারের মতো শিকারের উদ্দেশে আমি একবার গারো পাহাড়ে গিয়েছি। রাজবাড়ি থেকে দল বেঁধে যাঁরা আমার সঙ্গে যান, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন যুবক ; কেউ কেউ আবার বয়সে আমার চেয়ে দশ-পনেরো বছরের ছোট। একদিন শিকার থেকে ফিরে এসে সকলেই গল্পগুজবে মেতে আছেন, একটু দূরে আমিও আমার তাঁবুতে বসে বিশ্রাম করছি, ঠিক তখন কি মনে করে জুঙ্গা আমার কাছে এলো, তাকে বেশ বিরত মনে হলো। তাই একটু উদগ্রীব হয়েই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন রে ?" সে বলল, "তুই কলকাতায় চলে গেলে আমিও বাদামবাড়ি ছেড়ে চলে যাব!" অনুসন্ধিৎসু হয়ে আমি তার কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল, "তোর ওপর আমার এই টান স্টেটের অন্য মালিকরা ভালো নজরে দেখে না। তারা আগেই আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। তুই দেশের মালিক ; তোকে ছাড়া আর কোন মালিককে মানতে মন চায় না। তুই যে রাজাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তাদের বয়স কম। এরা পরিবারের রীতিনীতি ছেড়ে দিচ্ছে। এটা আমার ভালো লাগে না। এরা মতলব করেছে যে, আজ তোকে মুরগী খাওয়াবে। তারা বলবে যে, এগুলো শিকার করা বুনো মুরগী। আসলে তারা গারোদের পোষা মুরগী কিনে এনেছে। আজ রাত্রে কিছু খাস না।" জুঙ্গা নিজে গরু বা শুয়োর খেতে অভ্যস্ত ; তবু খাদ্যাখাদ্য নিয়ে আমাদের পরিবারে প্রচলিত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে তার এই সচেতনতা দেখে আমি সেদিন বিস্ময় বোধ করেছি।

আমি কলকাতায় আসার পরেই জুঙ্গা খাসিয়া পাহাড়ে চলে যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার মতো খাঁটি বন্ধু আমি আর পাইনি।

বয়োবৃদ্ধ, লম্বা চওড়া এবং সবল চেহারার আবাদি শেখকে দেখে সহজেই মনে হতো যে, তিনি এক চাষী পরিবারের কর্তা। উপরন্তু তিনি তখনও গ্রামের 'মণ্ডল'। তাঁর প্রাণখোলা হাসি দিয়ে তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ঘটনা আজও মনে আছে। আমার ছোট দাদামনি শিবকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে পোষা দোয়েল পাখি দিয়ে বুনো দোয়েল পাখি ধরতেন। একবার ছোট দাদামনির সঙ্গে আমিও দোয়েল শিকার দেখতে গিয়েছি। তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

বুনো দোয়েল ধরা একাধারে চিত্তাকর্ষক ও নির্দোষ শিকার। দাদামনির দোয়েল শিকারে কখনও পাখি মারা পড়েনি। সাধারণত বসন্তকালে প্রজননের সময় তিনি তাঁর পোষা মর্দা দোয়েলের সঙ্গে বুনো মর্দা দোয়েলের লড়াই বাধিয়ে দিতেন। জাপটাজাপটি করে দুটো পাখি যখন যুদ্ধে মত্ত, তখন বুনো পাখিটা ধরা পড়ত। এভাবে যতগুলো বুনো পাখি বন্দী হতো পরদিন তাদের লেজের কিছুটা কেটে আবার সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো।*

*'বন জঙ্গল ও শিকারের কথা' দ্রষ্টব্য।

দোয়েল শিকারের উদ্দেশ্যে সেদিন আমরা আবাদির বাড়ির কাছে যেতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঠিক হিন্দু প্রথামতো দাদামনির পায়ের ধুলো নেন আর আমাকে দেখে এতই অভিভূত হন যে, আমায় একেবারে কাঁধে তুলে আদর করে আমার দুপায়ের পাতা দুটো আবেগভরে তাঁর কপালে ঘষতে থাকেন। এই ঘটনা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার। কিন্তু সে স্মৃতি আজও মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রাজপরিবারের অনুগত ছিলেন। রাজপরিবারও একান্তভাবে তাঁর উপর নির্ভর করেছেন।

কথাটা কৌতূহলোদ্দীপক। তাই উল্লেখ করছি। পাকিস্তান হবার পরে একবার আমি সুসঙ্গে যাই। সেবার আবাদির এক ছোট ভাই একদিন এসে আমাকে বলেন, "হুজুর, হালের মানুষ সম্বন্ধে সাবধান হবেন। তারা ইস্কুলে পড়ে। তাছাড়া নতুন মৌলবীরাও তাদের মাথা নষ্ট করছে। আমাদের তারা আর মানতে চায় না। সাবেক আমলের যে কজন মানুষ আমরা আজও আছি প্রয়োজনে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো। আপনার জন্যে জান দেব। কিন্তু হালআমলের লোকদের বিশ্বাস করবেন না। তারা বিশ্বাসঘাতক। হয়ত আপনাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে বন্ধু সেজে আসবে। হায় আল্লা! এ দুনিয়া থেকে আজও আমাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?"

রাজপরিবারের প্রতি অনুরক্ত আর একজন সুসঙ্গবাসীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

১৯২৬ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ের ঘটনা। সুসঙ্গ সমতট থেকে গারো পাহাড়ের যে শিখর সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে, সেবার আমি সেখানেই উঠতে যাচ্ছি। সেই শিখরের পাদদেশে আগামপাল নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে পৌঁছতে রাত প্রায় ন'টা হয়ে গেল। মালবাহকরা গ্রামের নক্‌মাকে আমাদের আগমন বার্তা জানাল। খবর পেয়ে আমাদের সকলের জন্যে তিনি সে গ্রামের নক্‌পান্থে অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষদের নৈশাবাসে থাকার অনুমতি দিলেন। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট এক পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। নকপান্থের চেয়ে সেই স্রোতস্বিনীর নুড়ি বিছানো চরের আকর্ষণে আমি সেখানেই আমার তাঁবু খাটালাম। যথা সময়ে নক্‌মা সুসঙ্গ রাজপ্রধানকে সম্মান জানাতে এলেন। গোটা দুই মুরগীর ডিম আর মস্ত বড় দুটো কুমড়ো তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন। পরম শ্রদ্ধায় আমার পা ছুঁয়ে তিনি আমাকে সেগুলো গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললেন যে, 'দেলগাব্বা' অর্থাৎ প্রধান রাজা কখনও তাঁদের গ্রামে আসেননি। এমন কি, সেই অঞ্চলটা যখন রাজার ছিল তখনও নয়। দেশের প্রকৃত মালিককে এভাবে একেবারে তাঁদের গ্রামে দেখতে পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার। সুসঙ্গ রাজার প্রতি তাঁর আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ পরে তিনি একটা রূপোর টাকাও নজর দেন। ডিম দুটো কুলীদের দিয়ে কুমড়ো দুটো আমি গ্রহণ করলাম আর টাকাটা তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম। কারণ, তাঁর কাছ থেকে নজর নেবার কোনও অধিকার আমার ছিল না। নকমা মনে খুব আঘাত পেলেন। বিষয়টা তাঁকে আরও স্পষ্ট করে

বুঝিয়ে বললাম। তবু তিনি বললেন যে, এখনও তাঁদের বিশ্বাস, দুর্গাপুরের দেলগাম্বা রাজাই তাঁদের মালিক, আর কেউ নয়। ১৮৬৯ সালে "গারো হিলস এ্যাক্ট" প্রবর্তনের পরে গারো পাহাড়ে আমাদের স্থান যে কোথায় সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। তথাপি এমন ঘটনায় অহমিকার কারণ থাকতে পারে বইকি! নক্‌মার মঙ্গল কামনা করে প্রতীক হিসাবে জরির নকশা করা একটা চাদর সেদিন তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। আমরা যে তাঁর এলাকা দেখতে গিয়েছি সেই উপলক্ষকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি গুণেশ্বর শিখরে মস্ত বড় একটা 'লোনা'র* নামকরণ করেন 'রাজা দেখা হাসিম্‌'।

সারাদিনের পায়ে হাঁটা ক্লান্তি নিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় আমি তাঁবুতে ফিরে আসি। সে রাত্রে কেবলই মনে হয়েছে যে, বেশ কিছুকালের প্রশাসনিক পরিবর্তনও কিভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যকে একেবারে বিলীন করতে ব্যর্থ হয়।

এবার আমার মেজো দাদামনি কমলকৃষ্ণের কথা কিছু বলছি। প্রাচীন এক সংস্কৃতির ধারাবাহিক স্রোত যখন প্রায় অবলুপ্তির পথে, তার শেষ ধারক হিসাবে আমি তখন তাঁকে দেখেছি। জীবনের বেশীর ভাগ কাল অবিচ্ছিন্নভাবে সুসঙ্গে কাটালেও শুনেছি যে, যৌবনে তিনি উত্তরাখণ্ডের নানা তীর্থ আর দর্শনীয় স্থানে একবার ঘুরে এসেছেন। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

মহারাজা রাজকৃষ্ণের যে কজন ভাই তখনও বেঁচেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের বড় এবং রাজপরিবারের মধ্যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার বাবা তখন মহারাজা। কিন্তু সুসঙ্গের 'রাজা' হিসাবে মেজো দাদামনির বেশ অহমিকা ছিল। তাঁর আচরণে সে ভাব ফুটে উঠত। তেমন এক পরিবেশে সুসঙ্গের স্থানীয় কোন ব্যাপারে বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাবা খুব সতর্ক হয়ে মেজো দাদামনির সম্মান রেখে পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু সুসঙ্গের বাইরে ঢাকা, কলকাতা বা মৈমনসিংহের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনে নিজেই গিয়েছেন।

মধ্যমবাড়ির অন্দর আর বাহিরমহলের মাঝামাঝি তাঁর একটা বাংলো বাড়ি ছিল। সেখান থেকে বাইরে আসার সময় তাঁর সঙ্গে দুজন কর্মচারী আর একজন দেহরক্ষী তো থাকতই উপরন্তু একজন ভৃত্য তাঁর মাথায় মস্ত এক সাদা ছাতা ধরে রাখত। এমনি এক রাশভারী পরিবেশে উপযুক্ত সমারোহ করে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহদের প্রণাম করে আসতেন। তিনি মন্দির প্রাঙ্গনে গেলে দেবালয়ের সমস্ত কর্মচারীর মনে উদ্বেগের সীমা থাকত না। কারণ, বিশৃঙ্খল পরিবেশ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গন দেখলে দায়ী ব্যক্তিদের তিনি কঠিন শাসন করতেন। তাই তাঁকে উপযুক্তভাবে সম্মান দেখাতে সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন। মন্দির থেকে তিনি আসতেন দরবার গৃহে। দরবার গৃহের কথা আগেই বলেছি। কর্মচারী, আর্দালি, প্রহরী সবাই যথারীতি

* sandy salt-lick

সেখানে প্রস্তুত হয়ে থাকত। আমার বাবা প্রতিদিন দরবার গৃহে গিয়ে কমলকৃষ্ণকে নিয়মমতো প্রণাম করে তাঁর পাশে নিজের আসনে বসতেন। মাঝে মাঝে তিনি আমাকেও নিয়ে গিয়েছেন। তখন আমার বয়স ছ'সাত বছর। মেজো দাদামনির চালচলনে সর্বময় কর্তৃত্বের ছাপ তখনি আমার চোখে পড়েছে। তিনি বেশী কথা বলতেন না। যখনই কিছু বলতেন সেটা বিধান বলেই মানতে হতো। আদব-কায়দায় কোথাও কোন ত্রুটি তিনি মোটেও সহ্য করতেন না।

তাঁর খাস বাংলো বাড়িটা বেড়া দিয়ে অন্দরমহল থেকে আলাদা করা ছিল। সেখানে তাঁর নিজস্ব দাসদাসীর দল তো ছিলই, উপরন্তু একজন বয়স্যও ছিল।

যেমন সুন্দর ছিল তাঁর গায়ের রঙ, তেমনি ছিল তাঁর টিকালো নাক। চালচলনে আভিজাত্য দেখে তাঁকে খুব রাশভারী, কঠোর, বদরাগী আর কিছুটা বেরসিক মানুষ বলে মনে হতো। তাঁর পছন্দের লোক ছাড়া তাঁর কাছে সহজে কেউ যেতে পারতেন না। তাঁর পছন্দের মানুষের দলে বাবাও ছিলেন। তাঁর বাংলো বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে বাবার কোন অসুবিধা হয়নি। আমিও সোজাসুজি তাঁর কাছে যেতে পারতাম।

বাহ্যিক আচরণে সর্বময় কর্তৃত্বের কঠোরতা সত্ত্বেও কমলকৃষ্ণ প্রকৃতই স্থানীয় জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শিল্পে ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে স্থানীয় গুণিদের তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি যথার্থই সুরসিক ছিলেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। তিনি সেতার বাজাতে পারতেন। তাঁর বহু আকর্ষণীয় সখের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি আর পাণ্ডুলিপির মূল্যবান সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। আয়ুতত্ত্ব, অশ্ব-পালন এবং তবলা-বাদন সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান পুস্তিকা লিখে প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া হস্তী এবং গো-পালন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অপ্রকাশিত রচনাদিও ছিল।

আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট এক প্রতিষ্ঠানের ক্রম অবক্ষয় পরিক্রমা করে তার শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছি। আমার বাবার আমলেই রূপান্তরের মূল গভীরে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তবু আমার ধারণা ছিল যে, তাঁর যুগটাও অতীতের বহু উপাদানকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে সুসঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় আসার সময়ই দেখেছি যে, অবশিষ্ট ভিত্তিভূমিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সুসঙ্গ রাজপরিবারের এই ক্রম অবক্ষয় সম্বন্ধে যে ছবি আমার মনে আসছে সে কথা কিছু বলছি।

জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার প্রথার মাধ্যমে রাজপরিবারের সংহতি টিকে ছিল। ব্রিটিশ সরকারের আদালত ১৮৫৬ সালে সে প্রথা বাতিল করেন। ফলে, বিভক্ত যৌথ পরিবারের শরিকগণ নিরবচ্ছিন্ন মামলা মকদ্দমার পাকে জড়িয়ে পড়েন। সুসঙ্গবাসীদের সামনে পরিবারের প্রাচীন আদর্শ রক্ষা করে চলার দায়িত্বও তারা বিস্মৃত হন। ১৯১০ সালে রাজা কমলকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। কিছুকাল পরে ১৯১৬ সালে মহারাজা কুমুদচন্দ্রও দেহত্যাগ করেন। মহারাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই

পরিবারকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। তাঁর অভাবে মনান্তর আর ভাগবাটোয়ারা পরস্পরের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে।

১৯১৫ সালের জরিপের পরে সুসঙ্গরাজের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু ধারণাই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তিত অবস্থায় 'অধিকার' প্রসঙ্গে নতুন করে যে ধারণার উদ্ভব হয়, তাতে অনেক প্রজাই রাজানুরক্তির সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র হারান। ব্যবহারজীবিদের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। এতকাল যে নৈতিকধারা সক্রিয় ছিল হয়তো অভিজাততন্ত্রের অনুকূলেই তার প্রভাব দেখা গিয়েছে। ক্রমে তা এক চুক্তিবন্ধ প্রথায় রূপান্তরিত হয়।

বহু আদিবাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিকবাহিনীতে যোগ দিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রবাসজীবনে অভিজ্ঞতালব্ধ অপরাধ-প্রবণ বৃত্তি অর্জন করে আবার অরণ্যভূমিতে ফিরে আসেন। গারোদের সমাজজীবনে অজ্ঞাতপূর্ব সেসব বৃত্তি এঁদের প্রভাবে ক্রমে প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

১৯১৮ সালের কাছাকাছি মৈমনসিংহ থেকে জারিয়া-ঝাঞ্জাইল পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত হয়। সুসঙ্গ থেকে তার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। সুসঙ্গের নিভৃত পরিবেশ এতকাল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। সেটা এই রেলরাস্তার কল্যাণে বাইরের জগতের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে জনসমাগমের চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বাণিজ্যে সুসঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। গ্রাম প্রায় শহরের রূপ নিতে থাকে। কিন্তু সুসঙ্গের সুশৃঙ্খল জীবনে অশান্তি দেখা দেয়। কারণ, নবাগত মানুষদের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির কোন যোগ ছিল না। অন্নদাত্রী ভূমিকে আশ্রয় করে মানুষের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে আর ধর্মনিরপেক্ষ আচার অনুষ্ঠান তাকে স্থায়ী বন্ধনে বাঁধে। বহু প্রচলিত এক সক্রিয় সংস্কার এতকাল সুসঙ্গের সমাজ-জীবনকে বেঁধে রেখেছিল। এবার জমি জরিপের ফলে এবং আনুষঙ্গিক নানা কারণে সে নীতিবোধ লোপ পায়। অবলম্বনের উৎস হিসাবে যে মাটিকে একদা পবিত্র জ্ঞান করা হতো, নগদ অর্থে তার মূল্যায়নের প্রতি তীব্র এক সচেতনতা দেখা দেয়। ভূম্যধিকারীরা উচ্চমূল্যে খাসমহলগুলো পত্তন করতে থাকেন এবং যাঁরা পত্তন নেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন ঢাকা, ত্রিপুরা আর নোয়াখালির মানুষ। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে সেই আগন্তুকদের দল সুসঙ্গের সুপরিচিত বিস্তীর্ণ তৃণভূমিগুলো একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেন। তাঁরা প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই খাজনা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উগ্রস্বভাবসম্পন্ন। রাজপরিবারের প্রতি তাঁদের কোনও নৈতিক অনুরক্তির প্রকাশ দেখা যায়নি।

নতুন গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনে সুসঙ্গের জনজীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং অদূরদর্শী সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেন তাতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনভার এমন সব লোকের হাতে পড়ে যাঁরা স্বার্থপ্রণোদিত কর্মের মাধ্যমে জনপ্রীতি অর্জন করেছেন। সেটা দুর্ভাগ্য আজে

সন্দেহ নেই। এর পরিণাম কি হয়েছে? এধরনের শাসনব্যবস্থা সুস্থ ও স্বনির্ভর গ্রাম্য সমাজ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে ; উপরন্তু জনজীবনের নৈতিক মান কলুষিত করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

রাজনীতির আবর্তে সুদূর এই পরগণাবাসীদের প্রতিক্রিয়ার কথা আগে কিছু বলেছি। এ অঞ্চলে মুষ্টিমেয় যুবক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হলেও তার প্রভাব ব্যাপক হয়নি। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে মানুষ গভীর ভাবে সাড়া দিয়েছে। অন্তত তখন সকলের মনেই অস্পষ্ট এক ধারণা হয়েছে যে, ইংরেজ-শাসন শেষ হবে এবং ভারতবাসী এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হবে। ১৯৪০ সালের পর থেকে স্থানীয় মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব দেখা যায়। মৌলবী বা লীগ নেতারা কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করে কখনও সফল হননি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অবশ্যই তখন বহু পরিবর্তনের হেতু হয়েছে। গারো পাহাড়ের পাদদেশে পার্টির নেতারা প্রায় এক যুগ ধরে হাজংদের মধ্যে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। হাজংদের তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, ভূম্যধিকারীরা তাঁদের শ্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছেন। তাই বর্ধিত হারে টংক প্রথামতো ধান দিতে অস্বীকার করে জমির উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'জনযুদ্ধের' সমর্থক হিসাবে সরকার ভারতীয় কমিউনিস্টদের অবাধে কাজ করতে দিয়েছেন। সে সুযোগে পার্টির নেতারা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে হাজংদের মধ্যে 'প্রতিরোধ' গেরিলা দল তৈরি করেন। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৪৬ সালে হাজং গেরিলাদের সঙ্গে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর একাধিক সংঘর্ষ হয়। তারা হাজংদের অনেক গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়, ধানের গোলা লুঠ করে, এমন কি মেয়েদের সম্মানও নষ্ট করে। এই অঞ্চল পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পরে পাকিস্তানী সামরিক টহলদার বাহিনী আরও নির্মম দমন কার্য চালায়। আমি শুনেছি যে, গারো পাহাড়ের পাদদেশে একদা শান্ত হাজং বস্তিগুলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্রায় উৎসন্নে গিয়েছে। কমিউনিস্ট নেতাদের বিবেক তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছে কি? তাঁদের মতে শ্রেণী সংগ্রামের মতো এতোবড় আদর্শের জন্যে কিছু জীবনের ক্ষতি অনুশোচনার গণ্ডির মধ্যেই আসে না! আপাতদৃষ্টিতে সমাজ সংস্কারের কল্পনায় অবাস্তব যুক্তির উত্তেজনা ভিত্তি করে একক বা ছোট ছোট দলের প্রাণ কত সহজে মরণের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় এটা তার এক দৃষ্টান্ত।

১৯৪১ সালে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে, কলকাতা অচিরেই এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং পরিস্থিতি ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় বাংলা দেশের তদানীন্তন গভর্নর আমাকে সুসঙ্গে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং সুসঙ্গে প্রত্যাবর্তনের পথে আমি সপরিবারে কয়েকমাস মৈমনসিংহ শহরে থেকে যাই। সাত বছর আগে সুসঙ্গে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর শাসন প্রবর্তিত হয়। তাতে আমাদের প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস প্রায়।

অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্যেও সুসঙ্গে এসে আমি আবার পাহাড় ভ্রমণ, শিকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। হিন্দু, মুসলমান এবং আদিবাসী সকলেই আগের মতো বেসরকারী ভাবে তাঁদের সামাজিক বিরোধ মীমাংসার আশায় আবার আসতে শুরু করেন। কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত অতীত জীবনধারার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সবই তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের সেই দোল-দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়িতে তখন দুজন পাহারাদার আর একটা হাতি শুধু সম্বল। ঘোড়া আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সুসঙ্গে বাইরের জীবন আমাকে আনন্দ দিয়েছে; তবু স্বস্তি পাইনি। কারণ, সুসঙ্গের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় না ছিল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগ অথবা কোন ভবিষ্যৎ! তাই আমার বড় ছেলে সুরজিৎকে কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে পাবনায় তার মামার বাড়িতে দাদামশায়ের কাছে পাঠাতে হয়েছে।

যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গের উৎসাহে আমি বঙ্গীয় আইন সভার উপনির্বাচনে ভূস্বামীদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে আমার স্টেট পাঁচ হাজার টাকা দেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে তখন বহু বিত্তবান পরিবার ছিলেন। তবু সুসঙ্গের ঐতিহ্যগত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। অতএব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি নির্বাচিত হয়েছি।

অবশ্য নির্বাচনের এক বছর পর গভর্নরের আদেশে আইনসভা মুলতুবী হয়ে যায়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সেই অবস্থার মধ্যেই ইংরেজ সরকার পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ভারতের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। শেষ পর্যায়ে সরকারী 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন' পশ্চিমবঙ্গ, আসাম আর পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নির্দিষ্ট করার কাজে নিযুক্ত হয়। আমাদের শেষ ভরসা ছিল যে, সেই কমিশন অন্তত সুসঙ্গ পরগণার উপজাতি এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলো আসাম রাজ্যভুক্ত করবেন। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো; কিন্তু সুসঙ্গ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে গেল।

ভারত বিভাগে এত লোকের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে যে, তার তিক্ত প্রতিক্রিয়া নিয়ে নিরর্থক দুর্ভাবনা করার অবকাশ ছিল না। সামনে কঠিন বাস্তব প্রশ্ন! পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে যাব না সুসঙ্গেই বাস করব? কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেরী হয়নি। কারণ, পাকিস্তানে স্পষ্টতই এক সাম্প্রদায়িক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে শুধু পৈতৃক সম্পত্তির মোহে সেই শাসনব্যবস্থার সাথে আপস করে বাস করার প্রশ্ন আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। বরঞ্চ ভারতে এক সাধারণ নাগরিকের স্থান বেছে নেওয়াই ছিল আমার শ্রেয় পথ; অতএব আমার আর্থিক অবলম্বনের একমাত্র আশ্রয় সুসঙ্গ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়।

পরবর্তী দশ-এগার বছর আমার জীবনের কঠিনতম সময়। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছেলেদের শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা। আমার পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কর্মচারী হওয়া বা ছোটখাটো কোন ব্যবসায় করাও সম্ভব হয়নি। কারণ, মহারাজা উপাধির বোঝা আর আত্মসম্মানের অতিরঞ্জিত ধারণা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক, ১৯৫৮ সালে আমার ছোট ছেলে কারিগরি ধাতুবিদ্যায় স্নাতক হয়। পাঠ্যজীবনে এবং উত্তরকালে ছেলেদের সাফল্যে তাদের প্রতি আমার কর্তব্য এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।

বিগত একযুগ আমি অনটনের মধ্যে কাটিয়েছি। আমার পরিচিত পরিবেশের রীতি ও মূল্যবোধ এতো দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে, বিনা মন্তব্যে এখন তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। যে শোভন সমাজ চেতনা আগে দেখেছি. আশা করি, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আবর্তে তা নিঃশেষে হারিয়ে যাবে না। আজ চারদিকেই বড় বেশী অমার্জিত কোলাহল। সব যেন নীরস আর যান্ত্রিক। স্বাভাবিক মাধুর্যের অভাবে জীবনের আনন্দ হারিয়ে যায়। জীবনের ভারসাম্য আবার ফিরে আসুক এই কামনা করি।

স্মৃতিচারণ : শেষ কথা

আমার বাবা বেঁচে থাকতেই স্টেটের সঙ্গতির উপর অসম্ভব চাপ পড়া সত্ত্বেও তাঁর খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে মাত্র একজনই সরকারী উচ্চ পদের কাজে যোগ দেন। আর সকলেই আপন পৈতৃক সম্পত্তির ছোট ছোট অংশ দেখাশোনা করে সময় কাটিয়েছেন। রাজপরিবারের অনুবৃত্তি করে সাধারণ পরগণাবাসীরাও কূপমণ্ডূকতার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আমার সমকালীন রাজপরিবারের অধিকাংশ যুবক ফরাসে গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটিয়েছেন। অথচ তখন তাঁদের মধ্যে অন্তত ছ'জন গ্রাজুয়েট, কয়েকজন এম. এ, এম. এস. সি, আর একজন বি. এল ছিলেন। তাছাড়া এডিনবার্গ থেকে একজন কৃষিবিদ্যায় স্নাতক হয়েও আসেন। কিন্তু শিক্ষিত এই যুবকের দল শুধু আইনজীবিদের উপজীব্য হওয়া ছাড়া স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে কোন সাংগঠনিক কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি।

আমার উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে কঠিন ধাক্কায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সুসঙ্গে অবশিষ্ট সম্পদের উপর নির্ভর করে যে শিক্ষিত যুবকদল কর্মদক্ষতার অপচয় করছিলেন সে ধাক্কায় তাঁরাও বাড়ির গণ্ডি ছেড়ে ক্রমে বাইরে চলে আসেন। নিরাপত্তার অভাব বোধ যেন তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সবাই নিজের পায়ে

দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। আমার নিজের পরিবারে এর সূচনা অন্যান্য পরিবারেও এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে পূর্বপুরুষের ভূসম্পত্তি থেকে আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসে, অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠে। পরিবারের সকলেই ক্রমে দেশত্যাগী হন এবং খণ্ডিত বাংলায় একটু স্থান করে নেওয়ার কঠোর চেষ্টায় ব্রতী হন। অভিজাত ভূস্বামীদের মধ্যে যে অধঃপতন দেখা গিয়েছিল, সেই সংকটের আবর্তে এক পরিবর্তনের ঢেউ এসে তাঁদের ছোট ছোট মধ্যবিত্ত পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যেভাবে সাহায্য করেছে তা অভূতপূর্ব। মোটের উপর বিক্ষিপ্ত এই জীবন সংগ্রামের মূল্যায়ন ভিত্তিক লিপিচিত্র দেওয়া বেশ কঠিন। শুধু কয়েকটি কথাই বলতে পারি।

১৯৩৫ সালে শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যা বিজ্ঞানে ডক্টরেট হন। মানসিক রোগীদের জন্য কলকাতার বিখ্যাত লুম্বিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর অবদান অপরিসীম। পরে তিনি ভারতের এক বিশিষ্ট মনঃসমীক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি পান। তিনি আমার এক খুড়তুতো ভাই এবং বয়সে আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট। শ্রীসুহৃদ সিংহ অস্ট্রিয়া থেকে মনোবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি. হয়ে দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং পরে অস্থায়ী প্রধান কর্মকর্তা হন। তিনিও আমার এক জ্যেঠতুতো ভাই। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে আর একজন খুড়তুতো ভাই জমিদারী তত্ত্বাবধান বিষয়ক একটি ছোট সরকারী কাজে যোগ দেন। আমার বড় ছেলে সুরজিৎ আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন য়ুনিভার্সিটি থেকে নৃবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি হয়েছে এবং দ্বিতীয় ছেলে দেবব্রত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে 'ডক্টরেট' পেয়েছে। তৃতীয় ছেলে প্রদোষ কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে স্নাতক এবং চতুর্থ ছেলে ধূর্জটি মেটালারজিস্ট। বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ভারত সরকার তাকে রুশ দেশে পাঠান। সুরজিৎ এবং দেবব্রত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু প্রদোষ আর ধূর্জটি যুগের চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করেছে। আমার আরও দুজন খুড়তুতো ভাই নিরঞ্জন এবং সমীর ভারতীয় সেনাবিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত।* চিকিৎসা বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমাদের পরিবারে কেউই বিশেষ উদ্যম দেখাননি।

আমাদের পরিবারে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কোন মেয়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়েনি। ১৯৪৪ সালে আমার এক খুড়তুতো বোন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম সফলতা অর্জন করে। আজকাল অবিবাহিত মেয়েরা কলেজেও পড়ে। অন্তত এর মধ্যে কয়েকজন গ্রাজুয়েট এবং এম.এ হয়েছে। ১৯২০ সালেও মেয়েদের

বিয়ের বয়স গড়পড়তা ছিল দশ থেকে বারো। ১৯৩৪ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় পনেরো থেকে ষোল। ১৯২০ সালেও পরিবারের পুত্রবধূরা ইংরেজিতে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীসুহৃদ সিংহের স্ত্রী একমাত্র ব্যতিক্রম। বিয়ের পর তিনি গ্র্যাজুয়েট হন এবং এম.এ পাশ করেন। পরে তিনি আমেরিকায় বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়েও এম এ (শিক্ষা বিষয়ে) ডিগ্রী পেয়েছেন। পরিবারের অন্যান্য বধূদের কিছু ব্যবহারিক ইংরেজি জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এভাবেই কেটেছে।

দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে পরিবারে প্রায় বারো জন পুত্রবধূ এসেছেন। তাঁরা সকলেই অন্তত প্রবেশিকা-উত্তীর্ণা। স্বাভাবিক অবস্থায় আমার বড় ছেলেই 'মহারাজা' হতো। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবারের ঐতিহ্য সে রক্ষা করতে পারেনি। কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই পূর্ববঙ্গের বৈদ্য শ্রেণীর বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সর্বকনিষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে করেছে। আমার এই পুত্রবধূ পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট। যা হোক, বড় ছেলে সুরজিতের অপ্রত্যাশিত স্খলন আমাকে এতই বিচলিত করে যে, বাধ্য হয়ে তখন তাকে তার সংসার পৃথক করে নিতে বলি। সুরজিৎ তার আচরণে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। পুত্রবধূও ভদ্র ব্যবহার করেছে। তবু আজও আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যবধান সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ।

আমার নিজের সংসারে অভাবনীয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধর্ম ও সংস্কারের দিকে আবার আমাকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। কারণ, ধর্ম ও সংস্কার সংসার ও সমাজজীবনের আশ্রয়ভূমি। সেখানে আঘাত এলে সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। পাঠ্য জীবনে এবং পরবর্তী কালে এমন অনেকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাননি। তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি জীবনদর্শনের একমাত্র অকাট্য রূপ। আমি খ্রীষ্টানদের কথা শুনেছি, সংস্কারপন্থী হিন্দু সমালোচকদের কথাও শুনেছি। তাঁদের মতে অস্পৃশ্যতা, পৌত্তলিকতা, গোজাতি এবং গঙ্গার প্রতি ভক্তি হচ্ছে জাজ্বল্যমান বিকৃত সংস্কার ; ফলে আধুনিক জগতে হিন্দু সমাজ একেবারে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমার চারপাশে পুঞ্জীভূত সন্দেহবাদ আজও আমাকে ঐশিক সত্তার বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেনি। সেই সর্বব্যাপক সত্তা কোন যুক্তি নির্ভর নয়। স্থূল জগতে নৈতিক শক্তিরূপে তার ক্রিয়াশীলরূপ সতত আমাদের অনুভবগোচর। প্রচলিত রীতিতে গায়ত্রীমন্ত্র, মূর্তিপূজা বা তীর্থ-দর্শনের মাধ্যমে বিশ্বরূপী সেই অরূপ সত্তার কাছে আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের চেষ্টাই আমার ধর্ম। প্রসঙ্গত কালীঘাটের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, উৎসর্গীত প্রাণীর রক্ত অথবা পূজারীদের লালসা কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। যুগে যুগে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তি অঞ্জলি এমন পীঠস্থানের পরিবেশ পবিত্র করে রেখেছে। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার সত্তা পুষ্ট হয়, অহমিকা সংযত হয়।

ঈশ্বরের উপাসনায় বাহ্যিক উপকরণ বাহুল্য মাত্র। তবু আমার নিজের বেলায় ভগবানের উপাসনায় উপকরণের মাধ্যম অস্বীকার করতে পারি না।

অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অবিচল আস্থা আছে। অথচ হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠিগণনা, ভ্রমণের শুভদিন দেখা ইত্যাদিতে আমার বিশ্বাস সুস্পষ্ট নয়। সে ক্ষেত্রে বিশ্বাসের চেয়ে আমার নিষ্ক্রিয়তাই আমাকে চালিয়ে নেয়।

আমার জীবনকালের যা কিছু ঘটনা বিবৃত করেছি তার মধ্যে স্থান ও কালের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করার চেষ্টা করিনি। হয়ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপেক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অথবা প্রকাশ্যে আমার নিজের কথা তেমন কিছু বলিনি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার সংস্কৃতির সঙ্গে একালের প্রগতির প্রবল সংঘাত ঘটেছে। আমি সে কথাই স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছি। রক্ষণশীলতা আমার সহজাত প্রবৃত্তি। তথাপি আধুনিক প্রগতির প্রবল শক্তি আমার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারব—আমার এই বিশ্বাস আছে।

ইতিপূর্বে আমার বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, ভগ্নদশায় এক রাজ-পরিবারের তাবৎ দায়দায়িত্ব চুকিয়ে দেওয়ার ভূমিকা যেন আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি বিভাগ এবং মামলা মকদ্দমার ধাক্কায় গোটা পরিবারের ভিত্তি যখন টলমল, তখন আমি জন্মেছি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে তার অস্তিত্ব বিলোপ হয়। একজন দ্রষ্টার মতো আমি শুধু তার ভাঙন দেখে গিয়েছি। আমার আঞ্চলিক এবং আর্থিক কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির দুটো উপাদানের সঙ্গে আজও আমার যোগ রয়ে গিয়েছে।

একটাকে বলা যায় খানদানী রীতি। রূপকথা আর প্রাচীন কাহিনী ভিত্তিক কল্পলোকের অনুভূতি আমার জীবনে এই রীতির উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং ক্রমে সুসঙ্গবাস ও ভ্রমণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ প্রিয় স্থানের সংস্কৃতি আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাকে দৃঢ়মূল করেছে। সে রীতি আজও আমার চোখে যেন একজন মানুষের সত্তার মতোই প্রাণবন্ত হয়ে আছে। আমার ছেলেদের মনের জগতে এর ব্যতিক্রম এত বেশী যে মনে হয় সুসঙ্গের কোন অঞ্চলই তাদের কাছে তেমন বিশুদ্ধ অনুভূতি আর জাগায় না! যা হোক, ঠিক এভাবেই সামাজিক উৎসব এবং যৌথ পরিবারের প্রভাবে কল্যাণধর্মী সক্রিয় এক প্রাণশক্তি নিরবচ্ছিন্নরূপে আমার স্বচ্ছন্দ জীবনধারাকে সুসঙ্গবাসী বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সমাজ জীবনের সাথে নিবিড় যোগসূত্রে মিলিত করেছিল।

অধুনা কলকাতায় মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মধ্যে আমি ছোট এক ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করি। দেখছি শুধু অর্থের আবর্তে এঁদের জীবন থেকে বৈচিত্র্য, আনন্দ এবং মর্যাদাবোধ যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বড়ই মর্মন্তুদ। আধুনিক শহুরে জীবন হয়ত এভাবেই গড়ে উঠছে। তাতে তাদের প্রাধান্য হয়ত আছে

কিন্তু সুরের মাধুর্য যেন হারিয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক গণ্ডিবদ্ধ আত্মকেন্দ্রিক এই জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার পক্ষে মাঝে মাঝে বেশ কঠিন মনে হয়।

বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে মানিয়ে নিয়ে চলার শিক্ষা আমরা ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি। সেটা যে অত্যন্ত যত্নে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের শেখানো হতো সে কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া বিশিষ্ট এক অভিজাত পরিবারের মানুষ হিসাবে সকলের কাছে সম্মান প্রত্যাশার প্রবণতা আমার মধ্যে আজও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছে। তা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারিনি। রাজ্যপাল বা উচ্চপদস্থ কোন সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আজকাল আমি কদাচিৎ তাঁদের কাছে গিয়েছি এবং আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, প্রথামতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক সৌজন্য দেখানোর রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। এতে আমি অস্বস্তি বোধ করেছি। হয়ত নব-গণতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যম্ভাবী। এর প্রতীক এবং পদ্ধতি অপরিহার্যরূপে ভিন্ন হলেও, মনে হয়, নির্দিষ্ট রীতি আর সংশ্লিষ্ট শোভনতা গণতন্ত্র থেকেও বাদ দেওয়া চলে না। বর্তমান শাসনযন্ত্রের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি যে, সেটা বড় বেশী অশোভন এবং অস্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যুগ উত্তরণ কালে যে নতুন রচনা প্রয়াস চলেছে তার মধ্যে অনিবার্য কারণেই কোন রূপের আত্মপ্রকাশ আজও ঘটেনি।

অভিজাত এক কুলে সর্বোচ্চ উপাধির অধিকারী এবং পরগণার প্রধান ব্যক্তি হিসাবে পদমর্যাদার সঙ্গে যথারীতি সামঞ্জস্য রেখে চলা আর কাজে আদর্শ পথে থাকার সম্বন্ধে খানদানী ঐতিহ্য তার দাবি নিয়ে উপস্থিত ছিল। উত্তরাধিকার-সূত্রে যে বোঝা আমি পেয়েছি এবং স্বীকার করছি তা আজও সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। যদি পারতাম, তবে আমার জীবনে আত্মবিকাশের স্বাভাবিক পথ হয়ত আরও প্রশস্ত হতো। সে সুযোগ পাইনি। উপরন্তু সেই টলমলে আর্থিক অবস্থার মধ্যেও আভিজাত্যের খাতিরে সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেভাবে আমাকে বৈভবের জলুস দেখাতে হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। সে জাঁকজমক প্রীতিপদ না হলেও, তার অভাব বোধ থেকে আমি আজও মুক্ত হতে পারিনি।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া খানদানী ঐতিহ্যের পাশাপাশি আমি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মৌল উপাদানগুলিও রাখার চেষ্টা করেছি। গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আগেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং গুরুজনদের রীতিনীতি অনুসরণ করে আমি বুঝেছিলাম যে, বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রাহ্মণের স্থান সর্বোচ্চ। কারণ, বহু নিয়ম আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সামাজিক মর্যাদায় যথার্থ আত্মসংযমের জীবন যাপন করতে হয়। যেমন খানদানী রীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেও আচার আচরণের কঠোরতা, পৌরোহিত্যের আনুষ্ঠানিকতা এবং বৈভব প্রদর্শন সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিগত কয়েক শতকে বিশিষ্ট আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণে সুসঙ্গ পরগণায় সমাজ বিন্যাস, তার প্রতীক এবং নৈতিক অনুরাগ যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পুনরুদ্ধার

আর সম্ভব নয়। পৃথিবীর চেহারা দ্রুত পালটাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গির সাথে আঞ্চলিক জনসমাজের যথাযথ সমন্বয় সাধনের পথ তাতে বিঘ্নিত হচ্ছে। আধুনিক যুগের মানুষ প্রকৃতির তথ্য এবং মৌলসূত্রগুলো আরও বেশী করে জানতে পারছে। সমাজের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারে সাম্যের অধিকার সম্বন্ধেও মানুষ সজাগ হচ্ছে। একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রগতির পথে এমন সুস্পষ্ট পদক্ষেপ সত্ত্বেও এটা সত্য যে, মনের জগতে মানুষের সম্পর্ক আজও অনেক পরিমাণে অবাস্তব, অসম্পূর্ণ এবং অস্বীকৃত। সুসঙ্গের মতো ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবেশে বেশ কিছুটা নিরাপত্তা আর প্রাচুর্যের মধ্যে যে কোন মানুষ সহজেই আত্মস্থ হতে পারতেন। কারণ, সেখানকার প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যেন সার্বিক অনুভূতির একই কেন্দ্রে অংশীদার হয়ে ছিল। মনে হয় এ যুগেও তার প্রয়োজন আছে। স্থানীয় নায়কদের সেই বিশ্বাসে ফিরে আসা সম্ভব না হলেও মানুষকে অন্তত ছোট ছোট পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব। বিজ্ঞান ও কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে এর সহ-অবস্থিতি অসঙ্গত হবে না ; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা মানুষের গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন উৎখাত করে যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রসার কাম্য হতে পারে না।

আমার শিক্ষার দ্বিবিধ প্রবণতার পরেও ছিল বাবার প্রভাব। এই দুই রকম ঝোঁক তাঁর মধ্যে তো ছিলই, তাছাড়া আরও কিছু ছিল। পারিবারিক সংস্কৃতির সাথে সার্বিক একাত্মতার চেয়েও তাঁর নৈতিক বিশুদ্ধতা এবং প্রজ্ঞার উৎকর্ষ আরও বেশী ভাস্বর ছিল। দৃঢ় আশ্রয়ের জন্যে পিতৃপুরুষের ভিত্তিমূল যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি অন্তর্লোকের পরিপুষ্টির ক্ষেত্রেও রয়েছে এই নিখিল বিশ্বের অনুদ্‌ঘাটিত অসীম সম্ভাবনা। মানুষের শেষ বিচার যে তার চারিত্রিক সততা আর সৃজনশীলতার কষ্টি পাথরেই করা হয় সে শিক্ষা তাঁর কাছেই পেয়েছি। সৃজনীশক্তির বাহুল্যে মানুষ যে সংস্কৃতিবিমুখ, স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ এবং কল্পনাবিলাসী হয়ে যায় একথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

আমার নগণ্য কর্মজীবন আপন সংস্কারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বেশী দূর প্রসারিত হয়নি, মুখ্যত আত্মরক্ষার ভূমিকাতেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। তবু এক প্রাচীন ঐতিহ্যকে নিয়মনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে থাকাই যে যথেষ্ট তাও মনে হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, আপন আপন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছেলেদের বিদেশ যাত্রায় আমি উৎসাহ দিয়েছি। ভদ্র জীবন যাপনের আদর্শে ছেলেদের প্রচেষ্টায় আমার পূর্ণ সম্মতি ছিল। কর্মজাগতিক প্রভাবে তারা স্পষ্টতই স্বতন্ত্র এবং কল্পনাপ্রবণ। তবু আশা করি তাদের সৃজনী প্রতিভা আরও স্থিতিশীল হবে এবং বিশিষ্ট এক ঐতিহ্যের উত্তরপুরুষ হিসাবে তার ভাবমূর্তির মাধ্যমে আপন আপন পরিচয় সূত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

টীকা

১। ঠাকুরদা মহারাজা রাজকৃষ্ণের চার ভাই চার বাড়ির কর্তা ছিলেন। বড়বাড়ির কর্তা রাজকৃষ্ণ, মধ্যমবাড়ির কর্তা কমলকৃষ্ণ, নয়াবাড়ির কর্তা সকলের ছোট শিবকৃষ্ণ আর দুআনী বাড়ির কর্তা ছিলেন তৃতীয় ভাই জগৎকৃষ্ণ।

২। উল্লেখ করা যায় যে, এখানে রাজকীয় ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব একসঙ্গে সক্রিয় ছিল।

৩। সর্বপ্রথম দশভূজা মন্দিরে শিকার করা মর্দা হরিণের শ্রেষ্ঠ অংশ যেত।

৪। মাধবপুরের টিলা নামে খ্যাত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুলুক সুসঙ্গের উপজাতি

সুসঙ্গের সীমিত অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা আশ্রয় করে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। সেটা নৃবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনুশীলনের দুর্লভ ক্ষেত্র ছিল। কারণ, এককালে সে-অঞ্চলে সর্বভুক নরমুণ্ড শিকারী উপজাতি থেকে শুরু করে অহিংস বৈষ্ণব-হিন্দু পর্যন্ত মনুষ্য সংস্কৃতির কল্পনাসাধ্য প্রায় সব নিদর্শনই একসাথে মিলেমিশে বাস করেছে। এ-যুগের সুসঙ্গ তার খণ্ডিত পরিধির মধ্যে নৃমুণ্ড শিকারী উপজাতির অস্তিত্ব নিয়ে আর গর্ব করতে পারে না। কিন্তু পূর্বের সাংস্কৃতিক তালিকার ভিড়ে কিছু শ্বেতকায় জাতির মানুষ এসে তাকে আরোও বিচিত্র করে তুলেছেন।

কালের প্রভাবে গারোদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা লোপ পেয়েছে। ১৯২৩ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে আমি গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাঘমারা-সংরক্ষিত অরণ্যের কাছে নিভৃত এক গ্রামে ক্যাম্প করি। সে-অঞ্চলে একদিন শিকার বেশ ভাল হয়। শিকারের শেষে আমার অরণ্য-বন্ধু জুঙ্গা সঙ্গী সব লোকদের ভরপেট 'মদ' খাওয়াবার আবদার করে বসে। সে অনুসারে ব্যবস্থাও হয়। বাদামবাড়ি গ্রামের সব মানুষ ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে সন্ধ্যায় ক্যাম্পের আগুন ঘিরে জড়ো হন। তাদের মধ্যে জুঙ্গা, বিশ্বনাথ এবং দুর্গাও ছিল। গারো পাহাড়ের সংরক্ষিত বনের কাছে 'রাঙ্গাঝোরা' গ্রাম থেকে দুর্গা তার বাবাকেও নিমন্ত্রণ করে আনে। দুর্গার বয়স তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ। আমার আগ্রহে দুর্গার বাবা বিভিন্ন রকম যুদ্ধের নাচ দেখান। তাছাড়া শিকার করে আনা মৃত অথবা মুণ্ডচ্ছেদ হবে এমন মানুষকে ঘিরে যে বিশেষ ধরনের নাচ হতো তিনি তাও দেখান। নাচের শেষে বিশ্রামের সময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি নিজে কখনও মানুষ মেরেছেন কিনা? খোলাখুলি ভাবেই তিনি বললেন, "আমি অনেক 'বাঙ্গাল' মেরেছি। তারা রাজাদের পরোয়ানা ছাড়াই এসেছিল।" গারোরা নরমুণ্ড শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ী উপজাতিদের মতো তাঁরাও সাদাসিধে মানুষ। দুর্গার বাবা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাই সেদিন সন্ধ্যায় তিনি 'চু' অর্থাৎ মদ খাননি, তাঁকে চা দিতে হয়েছে।

অন্যান্য উপজাতির মধ্যে মণিপুরী, হদি, বানাই, ডালু এবং হাজং এঁরা সকলেই কয়েকশ বছর সুসঙ্গবাসী ছিলেন। মহারাজা টিকেন্দ্রজিৎ ১৮৮১ সালের কাছাকাছি সিংহাসনচ্যুত হন। বহু মণিপুরী তখন সুসঙ্গে আশ্রয় নেন। অনেককাল পূর্বে তাঁরা বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন এবং সুসঙ্গবাসী হয়েও তাঁরা তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি অবিকৃত রেখেছিলেন। একমাত্র গারোরা ছাড়া অন্য সব উপজাতি সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা এবং সামাজিক সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। তাঁদের কাছে গোমাংস নিষিদ্ধ এবং প্রচলিত বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে গোজাতির পূজাও করে থাকেন। ব্রাহ্মণ সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

হিন্দুধর্মের চতুঃবর্ণ ব্যবস্থা মণিপুরীদের মধ্যেও ছিল। তাঁদের সমাজে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। এঁদের বাদ দিলে গোঁড়া হিন্দুর ক্ষেত্রে বর্জনীয় মাংসও হাজং সম্প্রদায় খেতেন। ব্যতিক্রম ছিল শুধু বুনো শুয়োরের মাংস। বানাই আর ডালুরা আগে শুয়োর এবং মুরগী পুষেছেন, সেই মাংসও খেয়েছেন। পরে তাঁদের মধ্যে শুয়োর বা মুরগী পোষার রীতি বন্ধ হয়ে যায়। ষাঁড় নির্বীর্য করার কাজ বানাইরা করেছেন, কিন্তু হাজংরা সে কাজ করেননি। হদিরা হিন্দু সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন অনেকটা তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যে, বিশেষ করে মেয়েদের বেশভূষায়। হদি সমাজে আগে তাঁদের স্বজাতির দৈবশক্তি উপাসক যাজক হতেন। কিন্তু পরে কোন এক কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এক হদি মেয়েকে নিয়ে ঘর করেন এবং তাঁদের প্রথম ব্রাহ্মণ যাজক হন। এভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকে হদি সমাজে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যায়। যে ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্য হিন্দু সমাজের ক্রিয়াকর্ম করেন, তাঁরাও তাঁদের মতোই বর্ণব্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ এক শ্রেণী হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

হাজং এবং অন্যান্য উপজাতির মানুষ ক্রমে উন্নত পর্যায়ের হিন্দু রীতিনীতির প্রভাবে এসেছেন এবং তার সঙ্গে তাঁদের স্বধর্ম ও প্রথার সমন্বয় রেখে চলার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ 'গোঁসাই' সবচেয়ে উদারপন্থী শাখা। বহুকাল থেকে তাঁরা উপজাতি সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মানুষকে বৈষ্ণবধর্মের গণ্ডিভুক্ত করে এসেছেন। বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত উপজাতিরা কোন মাংস খান না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার চেষ্টা করলেও তাঁরা কিন্তু তাঁদের স্বধর্মের নির্দেশে 'দেওসি' বা 'অধিকারী'র যাজকত্ব প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করে চলেছেন। তাঁরা দেওসিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক হিসাবেই গণ্য করেছেন। সুতরাং সেই পদাধিকার বলে দেওসিরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। উপজাতিদের বৈদ্য হিসাবেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা ছিল। মোঙ্গলীয় ধাঁচের অবয়বের জন্যে আমাদের অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষকে সহজেই চেনা যায়। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর বাচন-ভঙ্গি পৃথক। হাজং আর বানাই প্রায় একরকম ভাষায় কথা বলেন। হাজং, বানাই আর ডালুদের বেশভূষায় অনেক মিল আছে। তাঁদের বাস্তুভিটে সংলগ্ন

জমিতে কিছু কিছু তুলোগাছে লম্বা আঁশের তুলো হয়। সংসারে কাজের অবসরে আদিবাসী মেয়েরা সেই তুলো দিয়ে চরকায় সুতো কেটে তাঁতে কাপড় বোনেন। কাপড় রঙ করার জন্য তাঁরা সাধারণত দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপাদান ব্যবহার করেন। মেয়েরা রোজ আরও যে কাজ করেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধানভানা, হাঁস-ছাগল পোষা এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে কিছু কুঁচো মাছ ধরা। কারণ কুঁচো মাছ না হলে সধবাদের ভালো করে খাওয়াই হতো না।

তাঁদের প্রধান উপজীবিকা চাষ-আবাদ। বাছাই করা কিছু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান ফলানোর কাজে হাজংরা বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। হাজং নামটি বোধ হয় গারোদের দেওয়া। যেহেতু গারো ভাষায় 'হা' মানে 'মাটি' আর 'জং' হচ্ছে 'পোকা'। সুতরাং 'হাজং' মানে 'মাটির পোকা'। তাঁরা শিল্পের উপযোগী কাঠ-বাঁশ আর প্রয়োজনীয় জ্বালানি বন থেকে সংগ্রহ করেছেন। সুসঙ্গ রাজাদের অধীনে তাঁরা হাতি খেদায় এবং জাল ফেলে হিংস্র বন্যপ্রাণী শিকারে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া, তাঁরা রাজবাড়ির রক্ষী হয়েছেন, আবাসগৃহ এবং আঙ্গিনায় বেড়ার জন্যে বনজ উপকরণ সরবরাহ করেছেন।

সুসঙ্গবাসী মণিপুরীদের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। মণিপুর রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে মহারাজা টিকেন্দ্রজিতের শ্যালক শরণাগতদের নিয়ে সুসঙ্গরাজার আশ্রয়প্রার্থী হলে উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদায় তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়। যদিও সুসঙ্গরাজ্যের বাস্তবসত্তা আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শরণার্থিগণ যেখানে স্থায়ী আবাস রচনা করেন সে গ্রামে আগে সুসঙ্গরাজার মুসলমান সৈন্যরা বাস করতেন। সুসঙ্গ থেকে তার দূরত্ব বেশী নয়।

মণিপুরীরা অতি উন্নতমানের সৌন্দর্যপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণ-রাধার স্বর্গীয় প্রেম-কেন্দ্রিক মার্জিত ভক্তি-সঙ্গীত, সুসজ্জিত বেশে নৃত্য, নারী পুরুষের মুগ্ধকর বর্ণাঢ্য বেশভূষা, শান্ত দেহসৌষ্ঠব, এবং অমায়িক মধুর আচরণে সুসঙ্গের জনজীবনকে যেন রঙীন করে রেখেছিলেন। অন্য সমস্ত উপজাতির সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য অনেক বেশী ছিল। তাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র। বর্ণাশ্রম সমাজের রীতি অনুসারে পুরুষরা উপবীত ধারণ করেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতীক ব্যবহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। কুমারীদের মাথার চুল, যা কপালের উপর ঝুলে পড়ে, তা বিশেষ রীতিতে কাটা হয়। সেটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের নিজস্ব শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনোমুগ্ধকর ওড়না, কাঁচুলি, নকশা আঁকা রঙীন কাপড়, বিশেষ ধরনের ঝুড়ি, সাজি, ডালা, হাত-পাখা ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের আঙিনায় সাজানো ফুলের বাগান আবাসগৃহের পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল।

মণিপুরীদের সামাজিক উৎসবে রাসলীলানৃত্য উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। রাসলীলায় রাধা-কৃষ্ণের ভূমিকায় যে দুজন অংশগ্রহণ করে, বাগ্‌দত্ত হিসাবে পরে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়। যতদূর মনে হয় তাঁদের সমাজে বিধবাবিবাহ,

এমন কি বিবাহবিচ্ছেদ রীতিও সচল ছিল। মেয়েরা পচাই মদ খান, পুরুষরাও বিভিন্ন নেশায় আসক্ত। ফলে সুসঙ্গের মণিপুরী সমাজে ক্রমেই অবক্ষয় দেখা দেয়।

গারোদের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে। তাঁদের বাদ দিলে আঞ্চলিক অন্যান্য সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতৃ-শাসিত সমাজব্যবস্থা দেখা যায়। মেয়েরা একখণ্ড শাড়ি দিয়ে তাঁদের বুকের উপর থেকে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখেন। সে শাড়ির আঁচল খুব উজ্জ্বল রঙের। বিধবারা সাদা শাড়ি পড়েন। ওড়না বা কাঁচুলি কিন্তু মণিপুরী ছাড়া আর কোন উপজাতি মেয়ে ব্যবহার করেন না। হদি মেয়েরা বাইরের মানুষের সামনে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকেন। সেটা অবশ্য তাঁদের হিন্দু প্রতিবেশীদের অনুকরণ। হদি মেয়েরা স্থানীয় টিলা থেকে খড়িমাটি সংগ্রহ করে সেগুলো হাটে বিক্রি করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে সেই হাট থেকেই তাঁদের শখের জিনিস কিনে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁদের শখের জিনিস হচ্ছে শাঁখের চুড়ি, মাকড়ি, পাথর কিংবা কাঁচের মালা। হিন্দু মেয়েদের মতো তাঁরাও সিঁদুর পরেন।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভাবোচ্ছ্বল আনন্দ প্রকাশে আদিবাসী মেয়েদের স্বাভাবিকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েরা এ-ব্যাপারে অনেক পরিমাণে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেন। হদি মেয়েদের বেলায়ও কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

সব আদিবাসী সমাজে বিধবাবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ রীতি প্রকারভেদে প্রচলিত। ঘরে তৈরি মদ মেয়ে পুরুষ সকলেরই প্রিয়। সে মদের পুষ্টিগুণ থাকলেও উত্তেজক মাত্রার তারতম্য আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্থানীয় আদিবাসীরা বাজারের মদ কিনে আরও বেশী পানাসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁদের আর্থিক জীবন দৈন্যদশায় পড়ে। ফসল কাটার সময় তাঁদের দিনের কাজের শেষে আনুষঙ্গিক বিশেষ বিশেষ আনন্দোৎসবের উচ্ছ্বাস যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেসময় তাঁদের স্বজাতির মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগে বাইরের কোন মানুষ কদাচিৎ যোগ দেন। সংযম ও নীতি সম্বন্ধে তাঁদের আপন মূল্যবোধ আছে। মোটামুটি সকলেই তা মেনে চলেন। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের মধ্যে কোন পর্দাপ্রথা নেই।

হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতি এবং গারোদের আবাসগৃহ তৈরির রীতিতে পার্থক্য দেখা যায়। গারো ছাড়া অন্যান্য উপজাতিদের বাস্তু মাটির ভিতের উপর তৈরি হয়। এ-অঞ্চলে সাধারণত বন্যার সম্ভাব্য জলস্ফীতি দেখে বেশ উঁচু জায়গায় ভিতের স্থান নির্বাচন করে স্থানীয় বনজ উপকরণ দিয়ে আবাসগৃহ নির্মিত হয়। 'ইঁকড়' বা 'বাঁশের' চাটাই দিয়ে ঘরের দেয়াল তৈরি করে তার উপর কাদার প্রলেপ দেওয়া হয়। আবাসগৃহের বহিরাঙ্গন পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে হাজং এবং বানাইরা এত সতর্ক যে, সেখানে ঘাসের একটা ডগাও জন্মাতে পারে না। অথচ হদি বা ডালুরা পরিছন্নতার দিকে তেমন নজর দেন না। যা হোক, প্রতি

গৃহপ্রাঙ্গণ বাঁশের বেড়া দিয়ে সুন্দর করে ঘেরা আর ভিতর দিকে বেড়া ঘেঁসে দু-এক সার সুপারি গাছের শোভা অপরূপ দেখায়। আঙিনার বেড়ার কাছেই গৃহের অতিথিশালা। হাজংদের আতিথেয়তা প্রবাদতুল্য। যে কোন অতিথিকে তাঁরা পান সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। উপরন্তু প্রতি হাজং বাড়ির আঙিনায় হয় তুলসী নয়ত বেলগাছ নজরে পড়ে। প্রতি সন্ধ্যায় তাদের পুজোও হয়।

কোন ছোট নদী বা স্রোতস্বিনী পাহাড় থেকে নেমে যেখানে সমতলে আপন প্রবাহ পথ তৈরি করে বয়ে যাচ্ছে, সেখানে পাহাড়ের কাছে উঁচু জায়গায় হাজং, বানাই আর ডালুদের বাড়িগুলো গণ্ডিবদ্ধভাবে গ্রামের মতো গড়ে উঠেছে। কিন্তু বেড়াঘেরা আঙিনায় সুপারি গাছের সারি দিয়ে প্রত্যেকের বাস্তুভিটা পৃথক ভাবে চিহ্নিত। পাহাড়ী নদীর খেয়ালে তার পার ভেঙে গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে ; তাই সে সম্ভাবনা দূর করতে গ্রামবাসীরা নদীর দুপারে ঘন বাঁশ আর কেয়াবন সৃষ্টি করেন। আঙিনার চারপাশে কলাগাছ। তারা যে শুধু ফলই দেয় তাই নয়, সময় বিশেষে অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ি রক্ষা করা, বন্যায় ভেলা বা পালাপার্বণে পরিবেশনের পাত্র তৈরি ইত্যাদি কাজে কলাগাছ অপরিহার্য। প্রায় প্রতি গৃহস্থের আম, কাঁঠাল, পেঁপে, লেবুর বাগান আছে। স্থানীয় সব সবজি তাঁরা উৎপন্ন করেন। আঙিনায় লম্বা আশের তুলোগাছও আছে। মেয়েদের কাছে সেগুলোর বড় সমাদর। এক বা একাধিক বাড়ির সামনে গোশালা। কিন্তু গৃহপালিত এই গরুমোষের স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তাঁরা বড় উদাসীন। একগাদা প্রাণীকে ঠাসাঠাসি করে সেই গোয়ালে রাখা হয়। প্রত্যেক গোয়ালের সামনে এক গোবর গাদা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোথাও কোথাও সেই গোবর গাদার কাছেই তামাকের চাষ হয়। খরা ঋতুতে বিশেষ করে সরষে আর কলাই ক্ষেতে সেই গোবর সার ব্যবহার হয়।

কিছু হাঁস, পায়রা এবং ছাগল প্রত্যেক গৃহস্থের আছে। সেগুলো তাঁদের সম্পত্তির অংশ হিসাবে গণ্য। বানাই আর ডালুদের মধ্যে মুরগী এবং শুয়োর পোষার রীতি আছে। সমতলের আদিবাসীরা উন্মুক্ত স্থানে মোষ প্রতিপালন করেন।

তাঁদের আত্মরক্ষা বা আক্রমণের প্রধান অস্ত্র বল্লম, আর গৃহস্থালী কাজের উপকরণ—দা, কুড়ুল, কোদাল এবং লাঙ্গল। তাঁরা গারোদের মতো 'জুম' চাষ করেন না। সমতলের সাধারণ চাষীর মতোই বলদ বা মোষের সাহায্যে লাঙ্গল, মই ইত্যাদি কৃষির যন্ত্রে জমি চাষ করেন। চাষী হিসাবে নিষ্ঠা ও সততার জন্যে তাঁদের সুখ্যাতি আছে।

গ্রামে গ্রামে কোন ছোট টিলা বা মাটির ঢিবির উপর পিপুল বা শ্যাওড়া গাছের নীচে তাঁদের দেবস্থান। সাধারণত তাঁরা উইঢিবি ঘিরে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করেন এবং সেই ঢিবির উপর কামাক্ষ্যা দেবীকে স্থাপন করে পুজো করেন। অনেক গ্রামে কালী মন্দির আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপজাতিরা সার্বজনীন

দেবী হিসাবে কামাক্ষ্যার পুজো করেন। তাঁরা কিন্তু সেখানে কোন পশু বা পাখি উৎসর্গ করেন না : পরিবর্তে কুমড়ো এবং মানকচুর মূল বলি দেন। দেওসি বা অধিকারী সকলেরই যাজক। বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণ গোঁসাইদের সাহায্য নেন। স্থানীয় হাজং সম্প্রদায়ের কিছু লোক শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদের কাছে শাক্তধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হাজং সমাজে কিছু অবস্থান্তর ঘটে।

হাজংদের যাজক হতে হলে গোসাইরা আগে রাজবাড়ি থেকে 'আদেশনামা' সংগ্রহ করে নিতেন। শাক্ত সম্প্রদায়ের হাজংগণ রাজাদের অনুমতিক্রমে কালী, দুর্গা এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর পুজো করতেন। গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্যে সেই গৃহস্থের পুজোয় রাজা তাঁর নিজের ব্রাহ্মণদের পাঠাতেন, এবং তিনি নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় রীতিতে দেবদেবীর কাছে আপন অভীষ্ট মানত করতেন। দোলযাত্রা উৎসবে এভাবে রাজবাড়ির ব্রাহ্মণরা গিয়েছেন, পুজো করেছেন ; পুজোর শেষে গ্রামবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে লাল আবীর দিয়েছেন। সে উৎসবে রাজা নিজে কিংবা তাঁর পরিবারের কোন প্রতিভূ যোগ দিয়েছেন। হাজংরা তাঁকে দেবতার মতো পুজো করে তাঁকে আবীর মাখিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় অন্য কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের এমন বিশেষ অধিকার ছিল না।

অম্বুবাচীর সময় পৃথিবী তিনদিন রজস্বলা থাকেন। হিন্দু রীতিতে তাঁরাও তখন চাষের কাজ বন্ধ রাখেন। চাষের কাজে তাঁরা বলদ, ষাঁড় বা মোষের সাহায্য নেন। লাঙ্গলে কখনও গরু জোড়েন না। মোষের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ বিচার করেন না।

হাজংদের প্রতি সুসঙ্গরাজাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় সব গ্রামের হাজং সেজেগুজে দলে দলে রাজবাড়ির অন্দরমহল প্রাঙ্গনে অবাধে এসে নাচ গান আর অভিনয় করেছেন। অথচ সেকালে অন্তঃপুরে পর্দাপ্রথার এতই কড়াকড়ি ছিল যে, নিকট আত্মীয়েরাও নির্দিষ্ট রীতি ও অনুষ্ঠান রক্ষা করে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। যা হোক, দেওয়ালীতে হাজংদের সে উৎসব 'চরমাগন' নামে পরিচিত। সেই উৎসবে প্রাচীন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষ এবং সমসাময়িক স্থানীয় সংস্কৃতি অথবা বাইরের আমদানি করা হালচাল কিছু অদলবদল করে রূপকাভিনয়ের মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়েছেন। স্বদেশী বা গান্ধী আন্দোলনের প্রভাব কিংবা সুদূর বুয়র যুদ্ধের মতো ঘটনাও তাঁদের নাচে গানে লোকপ্রীতি অর্জন করেছে। মনে আছে, চরমাগনের 'ট্যাংলা' দল কী আনন্দই না পরিবেশন করেছে ! গান্ধী আন্দোলনকে উপলক্ষ করে, ইংরেজ কোম্পানীর ফৌজ নকল কাঠের বন্দুক নিয়ে সামরিক কায়দায় নেচে গান করছেন, "গান্ধী আর কোম্পানী / স্বরাজ লইয়া টানাটানি" ইত্যাদি। অভিনয়ে বাংলা ভাষায় সংলাপ, সাজসজ্জা আর অঙ্গবিন্যাসে তাঁদের নিজস্ব শৈলীর প্রকাশ সুস্পষ্ট।

দেওয়ালীতে নাচগান দেখিয়ে তাঁরা সরাসরি রানীদের কাছে গিয়ে আনুগত্য জানিয়েছেন এবং স্টেট থেকে নির্দিষ্ট হারে প্রাপ্য পেয়েছেন। রাজবাড়ি ছাড়াও

পরগণার বিভিন্ন গ্রামে অভিনয় করে তাঁরা টাকা পেয়েছেন। সেই উপার্জন দিয়ে ছেলের দল পরে বনভোজনের উৎসব করেছে।

বিজয়া দশমীর শেষে দূর দূর অঞ্চলের মেয়েরা রানীদের সম্মান দেখাতে এসেছেন এবং রানীরা তাঁদের তেল-সিঁদুর আর পান-সুপারি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সুসঙ্গের আদিবাসীরা ক্রমে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছেন। এর মধ্যে কোন প্রলোভন বা নাটকীয়তার প্রশ্ন নেই। উন্নত মানের এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে সভ্য জীবনযাত্রা-পথে স্বাভাবিকভাবে তাঁদের স্থান করে দেওয়ার মধ্যে সুসঙ্গ রাজাদের সহযোগিতা অবশ্যই ছিল। হদি, হাজং আর বানাইদের ক্ষেত্রে যা দেখা গিয়েছে, সেভাবেই সনাতম ধর্মের রূপরেখার মধ্যে অন্যান্য আদিবাসী সমাজে ক্রমবিকাশ সুসঙ্গ রাজের বা প্রকৃতপক্ষে সুসঙ্গের হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রমের ক্রমপর্যায়ে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে।

হাজংদের সম্বন্ধে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, রাজা রাজসিংহ প্রধানত উন্নত প্রথায় হাতি ধরার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গরাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল পরগণা করৈবাড়ি থেকে তাঁদের এনে বসতি করান। একজন 'গোটমণ্ডলের' অধীনে তাঁরা সংগঠিত হন। সোমেশ্বরী নদীর পূবে এবং পশ্চিমে গোটমণ্ডলের অধীনে দুজন 'সহমণ্ডল' ছিলেন। গারোরা আগে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে হানা দিতেন। তাই একরকম রক্ষাবেষ্টনী হিসাবে গারো পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর হাজংদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাতি খেদা ছাড়াও সুসঙ্গরাজ্যের সেনাবিভাগে এবং রাজবাড়ির রক্ষী হিসাবে তাঁরা কাজ করেছেন।

গোটমণ্ডল এবং সহমণ্ডল দুজনের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির উপর নির্ধারিত বিশেষ অধিকার ছিল। কর্তব্যে আনুগত্যের শর্তে তাঁরা সে জমি স্বাধীনভাবে ভোগ করেছেন। অন্য হাজংরা গোটমণ্ডলের সুপারিশে এসেছেন এবং নির্দিষ্ট কাজের শর্তে তাঁরাও কিছু জমি পেয়েছেন। হাজংদের কাজ বা সুখসুবিধার জন্যে গোটমণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে রাজার কাছে দায়ী ছিলেন। রাজার নির্দেশ সরাসরি গোটমণ্ডলের কাছে যেত। গোটমণ্ডল তাঁর সহমণ্ডলের মাধ্যমে গ্রামের মণ্ডল বা প্রধানদের রাজার নির্দেশ জানাতেন। ঊনবিংশ শতকের কয়েক দশক পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে চলেছে।

রাজার ঐশশক্তির সম্বন্ধে হাজংদের এত বেশী বিশ্বাস ছিল যে, কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে তাঁরা সোজা রাজার কাছে এসে তাঁর 'লিখন' নিয়ে যেতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, রাজা ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই লিখন পাঠিয়েছেন; তাই ঈশ্বর তার মর্যাদা রাখবেন। সাধারণত পঙ্গপালের উপদ্রবে তাঁরা 'লিখন' নিয়ে যেতেন। যা হোক রাজা আর হাজংদের মধ্যে সম্প্রীতির বাঁধনে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সে বাঁধন ছিল নিবিড় এবং আন্তরিক।

বানাই আর ডালুদের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। তাঁরা হিন্দু হলেও রাজাদের কাছে হাজংদের সমপর্যায়ে স্বীকৃতি পাননি। তাঁদের মধ্যে শাক্তমতের

প্রাধান্য থাকলেও ব্রাহ্মণ গোঁসাইরা অনেককেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু হাজং দেওসিরা বানাই আর ডালুদের যাজক হিসাবেও কাজ করেছেন।

হদি সমাজের গঠন স্বতন্ত্র। তাঁদের ভাষা এবং রীতিনীতিও পৃথক। আগেই বলেছি যে, সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁদের মতো আস্থা অন্য কোন উপজাতি সমাজে তেমন দেখা যায়নি। তাঁরা প্রধানত রাজাদের হাতির 'মাহুত' বৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। অতি সাম্প্রতিক কালেও 'পরতালার' বৃহদাকার বন্য হস্তি ধরার দক্ষ লোক তাঁদের মধ্যেই ছিলেন।

খ গারো

সুসঙ্গ পরগণাবাসী আদিবাসী সমাজে গারোদের কথা নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসীদের মধ্যে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; এবং হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতির প্রভাব তাঁদের উপর প্রায় দেখা যায় না। সম্ভবত তাঁরাই এ-অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। কালক্রমে সুসঙ্গরাজাদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ এক ব্যবহারিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গারো উপজাতি আসামের গারো পাহাড় জেলার অধিবাসী। অধুনা এই জেলা মেঘালয় রাজ্যভুক্ত। আসামের গোয়ালপাড়া জেলা এবং বাংলাদেশে (ভূতপূর্ব পাকিস্তান) ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাতেও কিছু গারো বসবাস করেছেন। আগরতলাতেও কিছু লোক থাকেন।

কালের প্রভাবে গারোদের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তাঁদের অতীত রীতিনীতির কথা কিছু বলার চেষ্টা করব। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কিছু প্রামাণ্য নথিপত্র ছাড়াও গারোদের মধ্যে যাঁরা গবেষণার কাজ করেছেন, তাঁদের প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী থেকে সীমিতভাবে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে কয়েকজন অতিবৃদ্ধ লোকের কাছে শোনা বিবরণ এ কাজে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

সুসঙ্গের ঠিক বিপরীত দিকে সোমেশ্বরী নদীর ধারে 'ডাকুমারা' নামে এক জায়গা আছে। বাংলার শেষ ইংরেজ গভর্নরদের মধ্যে একজন একবার সেই গ্রামে ক্যাম্প করেন। গ্রামের নাম সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে তখন তাঁকে বলি যে, 'ডাকু' মানে 'ডাকাত' আর 'মারা' মানে 'মেরে ফেলা'। অতএব ডাকুমারা বললে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে যে, ডাকাতের দল একবার সেখানে মানুষ মেরেছিল। এ সম্বন্ধে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। প্রসঙ্গক্রমে পরে আমি আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীনীরদচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে ডাকুমারা নামের উৎপত্তি সূত্র খুঁজে দেখতে অনুরোধ করি। স্থানীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক হিসাবে তখন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রেও মোটামুটি সুপণ্ডিত। সামাজিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে

পরগণাবাসী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারদের পারিবারিক তথ্য এবং গ্রাম্য লোককাহিনী তিনি পরম আগ্রহে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করেছেন।

একদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি এসে বললেন, "ডাকুমারা নামের সূত্র খুঁজে পেয়েছি। এর মধ্যে এক জেলে পরিবারে রোগী দেখতে গিয়ে অতি বৃদ্ধা এক মহিলাকে দেখেছি। লোকে বলে যে, তাঁর বয়স একশ বছরের উপর। সুসঙ্গের জেলে পরিবারে তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা। আমার অনুরোধে তিনি একটা গান গেয়ে শোনান। গানের সারাংশ হচ্ছে যে, এক রাত্রে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক জেলের দল সোমেশ্বরী নদীর উজানে একেবারে গারো পাহাড়ের ভেতরে জলের গভীর ডোবাগুলোতে মাছ ধরতে যায়। সে রাতেই গারোরা সেই দলের সাতশ লোককে মেরে ফেলে। শুধু একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। তাঁর কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে গ্রামের মেয়েরা তাঁদের বৈধব্যদশা সম্বন্ধে অবহিত হলেন এবং ভয়ে আর্তরব করতে করতে সে স্থান পরিত্যাগ করে সোমেশ্বরীর আরও দক্ষিণে নদীর দুই কূলে নতুন গ্রামে আবার বসতি শুরু করেন। এই ঘটনা থেকে ডাকুমারা নামের উৎপত্তি হয়েছে।" সোমেশ্বরীর উজানে পাহাড়ী ডোবাগুলোতে মাঝিরা মাছ ধরতে যেতেন। তখন জেলেদের ধরা মাছ লুঠ করতে এসে গারোরা মাঝে-মাঝে তাঁদেরও মেরে ফেলেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সে প্রবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইংরেজদের শাসনসংক্রান্ত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থেকে সরকারের গারো পাহাড় অধিগ্রহণ জনস্বার্থে প্রণোদিত। ধূর্ত ইংরেজ কূটনীতির এক চালেই দুটো বাজি মাত করেছেন। প্রথমত খনিজ ও বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ অনুদ্ঘাটিত এক বহুমূল্য অঞ্চল এবং দ্বিতীয়, হিন্দু কিংবা মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত এক পার্বত্য জাতি তাঁদের অধিকারে আসে। বিশেষত যে পার্বত্য আদিবাসী সম্প্রদায়কে কখনও ধর্ম, রাজনীতি বা অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা হয়নি সে সম্পদ সত্যিই লোভনীয়!

আমরা বিষয়ান্তরে চলে এসেছি। এবার গারোদের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

গারোদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা ছিল সেকথা আগে বলেছি। ইংরেজদের যুক্তি ছিল যে, গারোদের লুঠতরাজ করার প্রবৃত্তি তাঁরা যেভাবে দমন করেছেন, কোন জমিদার সেভাবে তাঁদের বশে আনতে পারতেন না। শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন[১] যে, তাঁর জীবিতকালেই তিনি গারোদের মধ্যে এক বিচিত্র রীতি দেখেছেন। শোনা যায় যে, গারো পাহাড়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের গারোরা তাঁদের 'ভুঁইয়া' বা দলপতির মৃতদেহের কাছে নরমুণ্ড উৎসর্গ করেন। উদ্দেশ্য, মৃত দলপতির ক্রীতদাস হয়ে সে লোকটাও তাঁর সঙ্গে 'মিমাং' বা মৃত্যু-দেবের রাজ্যে যাবে। তাই গারোরা গভীর রাত্রে সুযোগমতো সেরপুর সমতলে নেমে আসেন এবং নিদ্রামগ্ন মানুষের মাথা কেটে নিয়ে উধাও হয়ে যান। সুসঙ্গ রাজার অধীনে অনেক ভুঁইয়া ছিলেন; কিন্তু 'মুলুক সুসঙ্গে' এমন কোন ঘটনা

আমি শুনিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ডাকুমারা কাহিনী। সে জনশ্রুতি বহুকাল থেকে সুসঙ্গে প্রচলিত।[২]

সুসঙ্গ-সমতটের সীমান্তে যেসব গ্রাম ছিল, গারোরা মাঝে মাঝে সেখানে লুটপাট করেছেন। তাঁদের সে দুর্নাম ছিল। তখন দুপক্ষের লোকই হতাহত হয়েছেন। ইংরেজ সরকার যখন গারো পাহাড় দখল করেন, তখন প্রতিবাদে সুসঙ্গ স্টেট 'গারো হিল' মকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলার নথিভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে আমি তখন দেখেছি যে, সুসঙ্গরাজার অনুমতিপত্রকে অন্তর্বর্তী পাহাড়বাসী গারোরা যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। রাজার অনুমতি পত্রবলে ব্যবসায়ী, জেলে বা রাজকর্মচারিগণ গারো পাহাড়ে গেলে নিরাপদে ফিরে আসতে পারতেন। সুতরাং প্রাপ্তব্য সমস্ত সূত্র থেকেই জানা যায় যে, গারোরা আগে নরমুণ্ড শিকারী ছিলেন এবং গ্রামের দলপতিদের কাছে সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে গণ্য।

গারো পাহাড়ের যে অংশ এককালে মুলুক সুসঙ্গের অঙ্গ ছিল সেখানে হাতি-খেদা বা শিকারের উদ্দেশ্যে আমি প্রায় ব্যাপক ভাবেই ঘুরেছি। আমার খুড়তুতো ভাই তরুণচন্দ্র সিংহ মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গারোদের রীতিনীতি এবং স্বপ্নতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গারো পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গিয়েছেন।[৩] গারোদের মধ্যে অতিবৃদ্ধ মহিলা ও পুরুষ আমরা উভয়েই দেখেছি। তাঁদের জীবনযাত্রার আদিম বৈশিষ্ট্য তখনও অবিকৃত ছিল।

গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে দেখেছি যে, স্নানের সময় গারোরা সামান্য কৌপীনটুকুও খুলে ফেলেন এবং চোখের পলকে একডুব দিয়ে উঠেই আবার যথারীতি কৌপীন পরেন। স্নানের সেই বিচিত্র রীতি দেখে প্রথমে বেশ বিস্ময় বোধ করেছি। বলাবাহুল্য যে, সে রীতি তাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রাচীন সংস্কারের অবশেষ মাত্র। খাসিয়া সীমার কাছে বদরী গ্রামে অতিবৃদ্ধ এক গারোকে দেখেছি; তাঁর পরনে কৌপীনও ছিল না। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে, তাঁরা সপ্তাহে একদিন বাজারে যাওয়ার সময়ই শুধু কৌপীন পরেন।

গারোরা দৈর্ঘ্যে মাঝারি গড়নের, গায়ের রঙ কালচে বাদামী থেকে পীত-ধূসর। নাক আর মুখের আদল প্রায়ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোঙ্গলীয় মানুষদের মতো। বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁরা তিব্বত-ব্রহ্ম ভাষাভাষীর পর্যায়ভুক্ত। গারো পাহাড়ে আট রকমেরও বেশী কথ্যভাষার প্রচলন আছে। তা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। এমনও হতে পারে যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর রীতিনীতির বৈষম্য কালক্রমে সন্দেহাতীতরূপে এক সাধারণ আঞ্চলিক বিশেষত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এটা কিন্তু সম্ভাব্য অনুমান মাত্র। গারো সমাজে বিভিন্ন কথ্যভাষা এবং সংশিলষ্ট প্রথাগুলো সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় অনুশীলন হলে এই যুক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোন বড় আক্রমণকারী দলের কাছে সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা যে এক লোভনীয় ক্ষেত্র ছিল সে কথা আসামের কোন ইতিহাসে একটু মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে।

গারো পাহাড় এবং তার ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড় শ্রেণী আর জলাভূমি পরিবৃত সমতল। এই অঞ্চলে বর্ষাকালে পাহাড়ী নদীনালায় কিছুকালের জন্য জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয় এবং নৌকা চলাচলের উপযোগী হয়। অতীতে মৈমনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ, শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং রংপুর জেলার করৈবাড়ি পরগণার বাইরে পূর্ব গারো পাহাড় জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে আঁকাবাঁকা ঘোরানো পথ দিয়ে বাণিজ্য হতো। যা হোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ গারো পাহাড়ের সুরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁদের আবাস-ভূমি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সমতল অঞ্চলের সংস্কৃতি গারোদের তেমন প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতই লক্ষণীয়। গারোদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আজও প্রামাণ্য তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। অসম্বন্ধ প্রসঙ্গ যা আছে তাও প্রায়ই ভ্রমাত্মক এবং কাল্পনিক ইতিহাস।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গারো পাহাড় এবং গোয়ালপাড়া জেলার চার জায়গায় আগে গারোদের চারজন রাজা ছিলেন। তাঁরা ভূঁইয়া নামেও পরিচিত। অবশ্য সেটা অতীতের কথা। সেই রাজাদের নামমাত্র প্রতীক রূপে এখন যাঁদের দেখা যায়, তাঁরাই বোধহয় 'গানা নক্‌মা' নামে পরিচিত। ক্ষমতার পর্যায় ভেঙে তাঁদের অধীনে কিছু 'নকমা' আর 'আখিং নক্‌মা' আছেন। গারো সমাজে মাতৃশাসিত রীতি অনুসারে মা সম্পত্তির ওয়ারিশ হলেও স্বামী নক্‌মা হন। মায়ের অবর্তমানে সাধারণত তাঁর ছোট মেয়ে 'নক্‌না' অর্থাৎ স্থলবর্তী মালিক হন। এর ব্যতিক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের নির্বাচিত কন্যা সে অধিকার লাভ করেন অর্থাৎ স্বামী ঘরজামাতা হয়ে নক্‌মা হন। নক্‌মার প্রতি আনুগত্যের শর্তে গ্রামবাসীরা বসবাসের অনুমতি পান। নক্‌মারাও সেভাবেই ক্রমোচ্চ পদাধিকারীদের কাছে দায়ী থাকেন। গারোদের সমাজ ও ব্যবহারিক জীবন নক্‌মার কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত। গ্রামবাসীদের বিবাদ-বিসম্বাদে গানা নকমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। গানা নক্‌মাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে প্রথমে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে রক্তাক্ত হানাহানি অনিবার্য। নক্‌মারা ইচ্ছামতো প্রজা রাখতে পারেন। প্রজা তাঁর আপন নক্‌মার এলাকায় 'মাচাং' তৈরি করে বসবাস করেন এবং জমি চাষ করে ফসল ফলান। সেজন্য তাঁরা নক্‌মাকে কোন খাজনা দিতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু যুদ্ধ, শিকার, জঙ্গল কাটা, বড়বড় কাঠ বহন করে নামানো কিংবা গ্রামবাসীর স্বার্থে যে কোন কাজে এই প্রজারা নক্‌মার আদেশ পালন করেন। নক্‌মার প্রাপ্য শুধু শিকারের কিছু অংশ অথবা স্মারক হিসাবে শত্রুর বিচ্ছিন্ন মুণ্ড। নক্‌মা তাঁর স্ত্রীর খাস জমি নিজে চাষ করে পরিবার প্রতিপালন করেন।

পাহাড় ক্রমে ঢালু হয়ে যেখানে কোন নদী বা ঝর্ণার ধারে এসে মেশে, সেখানে জায়গা পছন্দ করে গারোরা প্রয়োজন মতো ঘর তৈরি করেন। কোন কোন বস্তিতে প্রায় একশ পরিবারের ঘর আছে। প্রত্যেক পরিবারের গরু, ছাগল, শুয়োর এবং হাঁস মুরগীর খোঁয়াড় আছে। গ্রামের কাছাকাছি কোন স্থানে তাঁরা ধানের গোলা তৈরি করেন। পৃথক পৃথক সেই গোলাঘরের মধ্যে বিশেষ একটি সম্ভবত সকলের জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেক গ্রামের বিশেষত্ব হচ্ছে একটা বড় বা ছোট 'নকপান্থে' অর্থাৎ পান্থশালা। গ্রামের অবিবাহিত যুবকরা সেখানে থাকেন। কোন পুরুষ অতিথি এলে সেখানে আশ্রয় নেন। কিন্তু অতিথি মহিলারা নকমা অথবা গ্রামের কোন লোকের অতিথি হিসাবে থাকেন।

গারোদের ঘর 'মাচাং' বা 'নক' নামে পরিচিত। গ্রামের লোক পারস্পরিক সহযোগিতায় সেগুলো বনজ উপকরণ দিয়ে তৈরি করেন। প্রত্যেক মাচাংয়ের ভেতরে যাওয়ার সংযোগ পথটুকু জমির উপর ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়। বিভিন্ন আকার ও আয়তনের উঁচু খুঁটির উপর মেঝে এবং প্রবেশপথের দরজা নিয়ে মাচাংয়ের প্রধান অংশ। খণ্ড কাঠের এক এক টুকরো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর সাজিয়ে, তার ওপর মজবুত করে বোনা বাঁশের চাটাই বিছিয়ে মাচাংয়ের মেঝে তৈরি হতো। ঘরগুলো প্রায়ই দৈর্ঘ্যে প্রস্থের তিন থেকে ছ'গুণ বড় হয়। পঞ্চাশ ফিটের উপর লম্বা মাচাং আমি দেখেছি। ডালপালা ছাঁটা এক একটা সোজা আর লম্বা গাছ দিয়ে এরকম মাচাং তৈরি হয়। সেসব গাছের বেড় অন্তত চব্বিশ ইঞ্চির কম নয়। খুব লম্বা মাচাংয়ের একপাশে এবং শেষপ্রান্তে প্রায়ই দুটো খোলা বারান্দা থাকে। বড় বড় গ্রামে এধরনের 'নকের' শেষপ্রান্তে সংযোগপথ নদীমুখো করে তৈরি হয়। কারণ, নদীপথে বাইরের আগন্তুক লোকদের তাতে সহজেই নজরে পড়ে। তাছাড়া শৌচাগার, পাহারা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজেও সেই খোলা বারান্দা ব্যবহার হয়। নকের মাঝামাঝি একস্থানে খুব পুরু মাটির বেদির উপর আগুন রাখার ব্যবস্থা আছে। কাজ শেষ হলে আগুন নিবিয়ে ফেলতে তাঁদের কখনও ভুল হয় না। প্রায় বাড়িতেই নিরাপদ স্থানে তাঁরা সর্বক্ষণের জন্যে কিছু কাঠকয়লা জ্বালিয়ে রাখেন। ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বালাবার আদিম প্রথা তাঁরা বিশেষ ভাবে জানেন।[৪]

কোন কোন গ্রামে বাঘের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গবাদি পশুর খোঁয়াড় মাচাং সংলগ্ন করে তৈরি করা হয়। শুয়োরের খোঁয়াড় অবশ্যই এক পাশের বারান্দা অথবা মাচাংয়ের নীচে থাকে। মাচাংয়ে ঢোকার পথে শুকনো জ্বালানী কাঠ জমা থাকে। সেজন্যে বর্ষায় সেগুলো ভেজে না। তাছাড়া ধান কোটার উদুখল, মুষল, ধান বিছাবার চাটাই, হাটে সওদার 'খক্' বা গারো ঝুড়ি রাখার জায়গাও সেখানেই। শ্রাদ্ধে উৎসর্গের জন্যে নকের মধ্যে এক উঁচু মাচায় তাঁরা একটা বাচ্চা ষাঁড় রাখেন এবং অবিরাম পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে সেটাকে

অস্বাভাবিক মোটা করে তোলেন। উৎসর্গ না হওয়া পর্যন্ত ষাঁড়টা সেখানেই থাকে। তাকে বলা হয় 'চাঙ রাখা ষাঁড়'।

নকপান্থেগুলো সাধারণত গ্রামের মাঝামাঝি সমতল স্থানে দেখা যায়। সেগুলো প্রকাণ্ড আর উঁচু খুঁটির উপর তৈরি হয়। সেগুলো প্রায়ই এত লম্বা হয় যে, প্রায় একশ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অনায়াসে তার মধ্যে শুয়ে ঘুমোতে পারে। নকপান্থের সামনের দিকে অনেকখানি আর পিছনদিকের অর্ধেক অংশ অনাচ্ছাদিত থাকে। একটা লম্বা এবং মোটা গাছের কাণ্ডে ধাপ কেটে মাচাংয়ে উঠবার সিঁড়ি তৈরি হয়। তাছাড়া সেই সিঁড়ির একপাশ বরাবর লম্বা একটা বেত টেনে বাঁধা থাকে। অধিকাংশ নকপান্থের মধ্যে কোন বারান্দা নেই। সেক্ষেত্রে যারা সেখানে রাত্রিযাপন করেন তাঁদের প্রয়োজনে মলমূত্র ত্যাগের সময় কি অবস্থা হয় সে কথা না ভাবাই ভাল। নকপান্থের প্রবেশপথে বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদি প্রাণীর প্রতীক আঁকা কিংবা কাঠে খোদাই করা হয়। কিন্তু হাতির প্রতীক নজরে পড়েনি। আগে নিয়ম অনুসারে গ্রামের মোড়ল কোন বিপদের সংকেত না দিলে সন্ধ্যার পরে গারোরা কখনও ঘরের বাইরে যেতেন না। উল্লেখযোগ্য, নকপান্থের মধ্যে একাধিক 'গারো ঢোল', কিছু 'ঝাঁঝর' আর শিঙের তৈরি শিঙা দেখা যায়। গারো ঢোলগুলো তিন ফুট থেকে ছ ফুট লম্বা এক একটা আস্ত কাঠের টুকরো। ভেতরটা কুঁদে ফাঁপা করে দুদিকের মুখ ফিতে টেনে চামড়ায় ঢেকে তৈরি।

গারো পুরুষের স্বাভাবিক বেশভূষা খুবই সাদাসিধে। তাঁদের লম্বা চুল প্রায় শিখদের মতোই মাথায় গিট পাকানো অবস্থায় দেখা যায়। দাড়ি, গোঁফ প্রায় হয় না। যা হয় তাও প্রায়ই উপড়ে ফেলেন। এক টুকরো সরু দড়ি তাঁদের কোমরে বেল্টের মতো বাঁধা থাকে। হিন্দু সাধুদের মতো এক ফালি কাপড় কৌপীনের ঢংয়ে পরে সামনে কিছুটা ঝুলিয়ে রাখেন। বাঁশের তৈরি চমৎকার ছোট একধরনের চোঙায় তাঁরা চুন আর তামাক পাতা রাখেন। সেটা প্রায়ই তাঁদের কোমর বন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো থাকে। গানা নকমার মাথায়, কানে এবং হাতে নানা রকম অলঙ্কার দেখা যায়। নকমাদের হাতে বিশেষ এক ধরনের বালা থাকে। নাচের অনুষ্ঠানে পুরুষদের নকশা করা পোষাকের সঙ্গে মোরগ ও পাখির পালকে সাজানো পাগড়ি পরতে দেখা যায়। উপরন্তু নিজেদের তৈরি নকশা আঁকা একধরনের ঢিলে চাদর তাঁরা কাঁধের উপর আর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রাখেন। অঙ্গসজ্জার উপকরণ হিসাবে রঙীন পাথর, ফলের কিংবা কোন ধাতুর তৈরি মালাও তাঁরা গলায় পরেন।

মেয়েরাও মালা পরেন, সুন্দর চুল রাখেন, বাইরে যেতে চুল গুছিয়ে মাথার পিছনে বাঁধেন এবং হাঁটুর উপর অবধি কাপড় পরেন। তাঁদের কাপড়ের রং সাধারণত গাঢ় নীল, সবুজ বা লাল। আর তার পাড়ও খুব উজ্জ্বল। তাঁরা ধাতুর তৈরি এক ধরনের কানবালা পরেন। ক্রমে কানবালার সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষে

এমন হয় যে, দু কানেরই লতি দু ভাগ হয়ে ছিঁড়ে যায়। একজন লেখক বলেছেন যে, কিছু বন্য ফলের বীজ দিয়েও কানবালা তৈরি হয় এবং তাঁরা সেগুলোও পরেন। ব্যবহার করে ক্ষয়ে যাওয়া কানবালা হাটে বিক্রি হয়। সমতলের মেয়েদের বিশ্বাস সেই কানবালা অতিপ্রাকৃত দ্রব্যগুণসম্পন্ন অথবা তার মধ্যে অপদেবতার প্রভাব রোধের শক্তি আছে। তাই তাঁরা খুব বেশী দামে সেগুলো কেনেন। যে কোন পরবে নাচের সময় মেয়েরা খুব জমকালো সাজে সাজেন।

গারো সমাজে 'কামাল'-রাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। কারণ, তাঁরা দৈবশক্তির অধিকারী। বৈদ্য হিসাবেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা আছে। অপদেবতাকে তুষ্ট করতে অপরিহার্যরূপে কিছু উৎসর্গ করতে হয়; ডিম, মুরগীর বাচ্চা, কুকুর, বেড়াল, এমনকি ষাঁড়ও চলে। তাঁদের উল্লেখযোগ্য উৎসব শুরু হয় ফসল কাটার শেষে। তখন বহু গবাদি পশু আর শুয়োর নিষ্ঠুরভাবে মারা হয়। যে কোন উৎসবে তাঁরা ঘরে তৈরি মদ অবিরাম পান করেন। জন্ম থেকে মৃত্যু, অতিথি অভ্যর্থনা অথবা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মিলেমিশে মদ খাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সে পানোৎসবে প্রথম পর্বে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। মা পাখি যেভাবে শাবককে খাওয়ায় সেভাবেই মা দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে নিজের মুখের মদ খাইয়ে দেন। ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির লাউ-খোলা পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার হয়। উৎসব সমাবেশের শুরুতে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী চারপাশে ঘুরে ঘুরে হাঁ করে মুখে মদ ঢালেন। পরে পানপাত্র হাতে হাতে ঘোরে আর প্রত্যেকেই পালাক্রমে যোগ দেন। সর্বস্তরে পানাসক্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা হয়, উৎসবের শেষে গারোদেরও তাই হয়। গারোদের মধ্যে তামাক খাওয়ার রীতি কবে প্রচলিত হয়েছে তা জানা যায় না। তাঁরা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, নিজেদের উদ্ভাবিত বিশেষ একরকম পাইপ বা হুঁকো দিয়ে ধূমপানের আরাম উপভোগ করেন। তাছাড়া তাঁরা তামাক পাতায় চুন মিশিয়ে খাওয়া খুব পছন্দ করেন।

তাঁদের একবারের খাওয়া খুবই অল্প, সারা দিনে এবং রাতে তাঁরা তিন-বারের বেশী খান না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন পরিবারের লোক গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে আর একবার কিছু খেয়ে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যোদয়ের আগেই তাঁরা রান্না করা খাবার খেয়ে কাজে বের হয়ে যান, এবং প্রয়োজনে পথে রান্না করে খাবার সামান্য উপকরণ সঙ্গে বহন করেন। কোন কারণে সূর্যাস্তের আগে বাড়িতে পৌঁছতে না পারলে পথে রেঁধে খান। রান্নার কাজটা হাঁড়িতে কিংবা তাঁদের নিজস্ব পন্থায় সম্পন্ন হয়। সেটা হচ্ছে একটুকরো বাঁশের ফোকরে জল ঢেলে তার মধ্যে একটু চাল আর টাটকা বা শুকনো মাছ ফেলে সেটা আগুনে রেখে দেওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁশের উপর অংশটা আধপোড়া হয়ে যায়। তখন ভেতরের সেদ্ধ খাবার পাতায় ঢেলে, নুন লঙ্কা মিশিয়ে খেতে হয়। রোদে শুকনো অথবা হাঁড়িতে পচানো মাছ অর্থাৎ 'নাখাম'

গারোদের খুব প্রিয় খাদ্য। নাখামের সঙ্গে কিছু সুগন্ধি পাতা, শুকনো 'চুকাই' পাতা, নুন আর প্রচুর লংকা মিশিয়ে খেতে হয়। কল্পনাসাধ্য প্রায় সব প্রাণীর মাংসই তাঁরা রেঁধে খান; ব্যতিক্রম শুধু হাতি, বাঘ আর বিড়ালের মাংস। গারোদের মধ্যে 'মাচ্চি' নামে এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁরা বিড়াল মেরে খান। তাই গারো সমাজে তাঁরা অস্পৃশ্য। গারোরা কুকুরের মাংস খান। তার এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটা কুকুরকে তাঁরা পেট ভরে খাওয়ান এবং পরে তাকে জ্যান্ত পোড়ান। অবশেষে কুকুরের পেটের ভাত আর তার ঝলসানো মাংস তাঁরা খুব উপভোগ করে খান। তাঁরা গরুর দুধ কখনও খান না; তাঁদের ধারণা গরুর দুধ আসলে পুঁজ।

দিনের শেষে সূর্যাস্তের আগেই কাজ থেকে অবসর নিয়ে তাঁরা সাধারণত শুয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে দু'একবার উঠে আগুনের একটা কুণ্ডকে ঘিরে বসে একটু গল্পগুজব করেন এবং শেষে আবার ঘুমুতে যান।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গারো পরিবারের পুরুষরা 'মোংরেং' নিয়ে বনে চলে যান। 'মোংরেং' হচ্ছে বিশেষ একধরনের কুড়ুল। তা দিয়ে আক্রমণ বা আত্ম-রক্ষার কাজ তো হয়ই, তাছাড়া গাছ কাটা, কাঠ খুদে 'কোঁদা' নৌকো তৈরি করাও চলে। সুসঙ্গের গারোরা 'ডিগ্রিয়া' নামে এক রকম তলোয়ার ব্যবহার করতেন। বহু পূর্বে ডিগ্রিয়া দিয়ে যুদ্ধ হতো। পরবর্তীকালে কোন কোন নাচের উৎসবে অথবা উৎসর্গের পশুহত্যার কাজে তার ব্যবহার দেখেছি। ডিগ্রিয়াগুলোকে গারোরা ষাঁড়ের লেজের গুচ্ছ দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজান। আমি শুনেছি যে, এ ব্যাপারে চমরী গরুর লেজের লোম তাঁদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। গারোরা বর্শার ব্যবহারেও বেশ দক্ষ।

দিনেরবেলায় কাজে বের হওয়ার সময় প্রাপ্তবয়স্ক গারোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কিছু মেয়েকেও দেখা যায়। তখন তাঁদের কাঁধে ঝোলে কয়েকটা 'খক্' (একরকম ঝাঁপি)। তার মধ্যে থাকে দুপুরবেলার খাবার আর জলভরা লাউ-খোলা। সূর্যাস্তের আগেই তাঁরা ফিরে আসেন। কিছু লোক মাছ ধরতেও যান।

পাহাড়তলী অঞ্চলে আগে মঙ্গলবারে সাপ্তাহিক হাট বসত। তাই সোমবারে সকালের আগেই হাটে যাওয়া এবং মঙ্গলবার সকালে হাট থেকে ফেরার জন্যে তৈরি হয়েই তাঁরা নানারকম বনজ উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। তাঁরা গারো পাহাড়ের দূর দূর অঞ্চল থেকেও তিন-চার দিনের হাঁটাপথে বাঘমারা বাজারে এসেছেন। তাছাড়া পাহাড়ী ছোটবড় নদী, নালার প্রবাহপথে তাঁরা কোঁদা নৌকো, বাঁশ, বেত, গাছের কাণ্ড, আর কাঠের স্তূপ ভেলার মতো জলে ভাসিয়ে বাজারে এনেছেন। উপরন্তু তাঁদের বাগানে এবং ক্ষেতে উৎপন্ন তুলো, লংকা, তেজপাতা, কাঠআলু, লাউ, আদা, হলুদ, রসুন, কাঁঠাল, চিঙড়া (খরমুজা বিশেষ), আনারস, কচু প্রচুর পরিমাণে আসে। খাসিয়া সীমান্তের কোন কোন গ্রাম থেকে লেবু আর কমলা আমদানী হয়। বিক্রির উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণীর চামড়া

এবং শিং-ও আসে। গারোদের কাছে মধু ও মোম পাওয়া যায়। লাক্ষা চাষের পদ্ধতিও তাঁরা জানেন।

পুরুষেরা হাটে কেনাবেচা অথবা বনজ উপকরণ সংগ্রহের জন্যে বাইরে যান আর মেয়েরা সাধারণত ধানভানার কাজ করেন। সেটা খুব পরিশ্রমের কাজ। কারণ, কাঠের উদূখলে একটা লম্বা গোল দণ্ড বা মুষল দিয়ে আঘাত করে করে ধানের খোসা ছাড়াতে হয়। সমতল অঞ্চলে প্রচলিত ঢেঁকির মতো উন্নতমানের কলাকৌশল প্রয়োগের রীতি তাঁরা জানেন না। কেউ কেউ জল আনতে যান আবার কেউ কেউ আপন আপন তাঁতে বসে কাপড় বোনার কাজে ব্যস্ত থাকেন। আনাজক্ষেতের পরিচর্যা, গরু মোষ শূকর হাঁস মুরগী প্রতিপালন তাঁদের প্রতি-দিনের গৃহস্থালী কাজের অঙ্গ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা তো আছেই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের মতোই গারো মেয়েরাই বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। আমার মনে হয় কোন বড় অনুষ্ঠানে রান্নার কাজে বেশী চাপ পড়লে পুরুষরাও অনেক সহযোগিতা করেন। জুম চাষের কাজেও তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য।[৬]

গারোরা শিকারে সাধারণত বর্শা ব্যবহার করেন। তাঁদের মাছধরার কিছু বিশেষ রীতি আছে। তার মধ্যে উল্লেখ করার মতো হচ্ছে :

(১) গভীর জলে ডুব দিয়ে পাথরের ফোকরে মাছের আস্তানা থেকে মাছ গেঁথে তোলা।

(২) লিকলিকে লম্বা এক বাঁশের ডগায় বেত-বাঁধা একটা সরু লোহার ফলা নিয়ে কোঁদা নৌকা থেকে বড়বড় মাছ গেঁথে তোলা।

গৃহস্থালী এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে শ্রমের তারতম্য অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ কাজ ভাগাভাগি করে করেন।

চাষের সময় খুব বেশী কাজের চাপ পড়ে। প্রথমে জঙ্গল কেটে পরে সেই জঙ্গল আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। তারপর পোড়া জঙ্গল পরিষ্কার করে ছুঁচলো মুখ খোঁটা দিয়ে ধানবীজ বোনার জন্যে মাটিতে গর্ত করা হয়। পৃথক পৃথক গর্তে ধান, দেওধান, জোয়ার, ভুট্টা, লঙ্কা, খরমুজ, লাউ, প্যাঁচাকচু, রসুন, মিঠা আলু, আদা, তুলো, ইত্যাদি প্রায় সব ফসলের বীজ বোনা হয়। চাষের এই প্রথা 'হাদাং' বা 'জুম চাষ' নামে পরিচিত। একবার ধানের ফসল হয়ে গেলে সেই জমিতে আবার স্বাভাবিক বন সৃষ্টির জন্যে কয়েক বছর অপেক্ষা করে আগের পদ্ধতিতে আবার চাষ করা হয়। গারো পাহাড়ের একেবারে ভেতরের মানুষ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে জানেন না।

চাষের মরসুমে গ্রামের সব মানুষ কয়েক মাস হাদাংয়ে থাকেন। ক্রমে ধান, কাঙ্গনিদানা ইত্যাদি পাকতে শুরু হয়। তখন মেয়েরা ফসলের শিষ গোড়া থেকে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ভরেন। ডাঁটার অবশেষ ক্ষেতেই থাকে। ফসল তোলা হলে উৎসব শুরু হয় আর তা চলে দিনের পর দিন প্রায় সারা শরৎকাল জুড়ে। তখন তাঁরা পুরোপুরি ছুটির আনন্দ উপভোগ করেন। বছরের অবশিষ্ট সময়টা

গারো পুরুষদের গাছ কেটে, শিকার করে অথবা নৌকা তৈরি করে কাটে। মেয়েরা গৃহস্থালী কাজের ফাঁকে ফসল সঞ্চয় করেন।

সুসঙ্গ সমতটে স্থায়ী গারো বাসিন্দারা 'লামদানী' গারো নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁদের আচার ব্যবহার অনেক বদলে গিয়েছে। তাঁরা সাধারণত গোমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত। কিন্তু সুসঙ্গ গ্রামে গোহত্যার কথা শোনা যায়নি। তাঁরা লাঙ্গলের চাষে অভ্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের ভাষা এবং বেশভূষাতেও পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন অথবা গারো এবং বাংলা ভাষা মিশিয়ে ভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে সহজেই কথা আদানপ্রদান করেন।

গারো পাহাড়ের ভেতরে গরু, বাছুর, ধান ইত্যাদি চুরির ঘটনা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল যদিও বহুকাল থেকে পাহাড়বাসী গারোরা সমতল অঞ্চলে হানা দিয়েছেন। সেকাজে সহায়ক হিসাবে সমতলের গারোরা কুখ্যাত ছিলেন। তখন পাহাড়ী গারো আর সমতল অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন, ফলে কিছু লোক মারা যেতেন কিংবা গুরুতরভাবে আহত হতেন। শত্রুর বাড়িতে অথবা ধানের গোলায় আগুন লাগানোর ঘটনাও ঘটেছে। যাহোক, আদিবাসী সমাজে নীতিজ্ঞানের নিজস্ব মান আছে। তাই আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বাইরের মানুষ আর গারোদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে।

উনিশ শতক পর্যন্ত গারোদের মধ্যে মোষ প্রতিপালনের রীতি ছিল না।

১৮৮৫ সালের কাছাকাছি গারোদের প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকায় মহারাজা কুমুদ চন্দ্রের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গারোদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যে কত গভীর ছিল এই প্রবন্ধখানি তারই নিদর্শন। সেই প্রবন্ধের অংশত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো—

"গারোদের মধ্যে লবণ ব্যবহার করার রীতি নেই। পরিবর্তে তারা নিজেদের তৈরি একরকম ক্ষার ব্যবহার করে।

মলত্যাগের পরে তারা শুকনো পাতা দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে এবং সাধারণত বালি বা মাটি দিয়ে মল ঢাকে; সমতলের প্রতিবেশীদের মতো জল ব্যবহার করে না।

উৎসবের সময় ঢাক আর ঝাঁজের সঙ্গে গরু বা মোষের শিঙের একরকম শিঙা বাজায়···নাচের সময় পুরুষরা 'ডিগ্রিয়া' আর বেতের ঢাল নিয়ে নাচে। নাচে এবং গানে একঘেয়েমি থাকলেও তার মধ্যে শৌর্যের প্রকাশ আছে।

শরৎকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত তারা ঈশ্বর আর বিদেহী পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে 'নবান্ন' উৎসব করে। বসন্তকালের সব উৎসব যথেষ্ট আনন্দোচ্ছলতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

গল্পবলার সময় গারোরা মাঝে মাঝে রামায়ণের কাহিনী বলে। তখন নায়ক নায়িকাদের নাম অবশ্য বদলে যায়। এটা খুবই বিস্ময়কর!

বীজ বপনের কাজ মেয়েরা করে। পণ্য বিনিময়ের প্রথাও ছিল।

মাতৃকুলে কোন পুরুষের বিয়ে হয় না। ভগ্নির কন্যা বা পিতার ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গেও বিবাহ অসিদ্ধ। কিন্তু শাশুড়ী বা মাতুলদুহিতাকে বিয়ে করা যায়। মাতুলের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা সর্বোত্তম। তারপরেই মাতুলদুহিতার স্থান।”

গারোদের বিবাহপ্রথার নিয়ম সম্বন্ধেও তিনি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন :

“যে বরকে পছন্দ করা হয় সে কোন ঝোপের আড়ালে বা গাছের উপর লুকিয়ে থাকে। এদিকে পাত্রীপক্ষের কয়েকজন যুবক তাকে খুঁজে বের করে এবং তার হাত-পা বেঁধে তাকে কাঁধে করে বিয়ের আসরে নিয়ে আসে। তখন সেখানে এক কোপে এক জোড়া মোরগ মারা হয়। যদি দুটো মোরগ মরে, তবে বিয়ের ফল শুভ হয়। মৃত মোরগ দুটোর পেট চিরে ভিতরের বস্তুও পরীক্ষা করা হয়। পরে পছন্দ করা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে বিয়ে তার মনঃপুত কিনা! নেতিবাচক উত্তর হলে পরিবর্তে তার ছোটভাইকে ঠিক সেভাবে আনা হয়। তার অপছন্দ হলে প্রথম পছন্দ করা পাত্রের বোনপোকে ধরে আনা হয়। সব চেষ্টা বিফল হলে অন্য গ্রাম থেকে আবার বর পছন্দ করে আনা হয়।

একাধিক বিবাহের রীতি আছে। বর কন্যার বয়স সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিধবাবিবাহের চল আছে।

মাতৃকুলের বংশধর উত্তরাধিকার পায়। মেয়ের অভাবে স্ত্রীর ভগিনীরা সম্পত্তি পায়।

কাপড় বোনা না জানলে মেয়ের বিয়ে হয় না।

ব্যবহার্য মাটির পাত্র তারা হাতে তৈরি করে আগুনে পুড়িয়ে নেয়।

অপরাধী সনাক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন :

(ক) জল পড়া ; (খ) বাঘের সামনে একটা গরু বা ছাগল টোপ দেওয়া ; (গ) উত্তপ্ত লাল লোহা দিয়ে পরীক্ষা করা ; (ঘ) বাঘের নখ, একটুকরো হাড় অথবা মাটি হাতে নিয়ে শপথ করানো ; (ঙ) তারা বাঘকে পবিত্র জ্ঞান করে ; (চ) তারা মৃত বাঘ কখনও স্পর্শ করে না।

ছেলের জন্মের পাঁচদিন পরে এবং মেয়ের জন্মের সাতদিন পরে তাদের মাচাং থেকে বাইরে এনে চুল কেটে দেওয়া হয়। শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী।

কাজে বের হতে হলে মা একখণ্ড কাপড় কাঁধের চারদিকে বেড় দিয়ে বেঁধে সেই ঝোলার মধ্যে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও নিয়ে যায়। ছেলেমেয়ে অসুস্থ হলে তারা তাদের কোন ঔষধ খাওয়ায় না, বিশেষ এক দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পুজা দেয়। সেই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা প্রাণী কেউ খায় না।”

গারোদের জলে ডুবে মাছ ধরা সম্বন্ধেও তাঁর বিশদ বর্ণনা আছে।

উক্ত প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো সীমিত আকারে হলেও এটা জ্ঞাতব্য তথ্যের আকর। বাঙলাভাষায় এটা পথিকৃতের প্রয়াস বলা যায়। সে যুগে এই অনুসন্ধিৎসার নির্দেশ বিরল।

টীকা

১। সেরপুর পরগণার ইতিহাস (১৮৭৩) দ্রষ্টব্য।

২। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন আমি যখন গারোদের প্রসঙ্গ লিখছিলাম, তখন একদিন সুসঙ্গ থেকে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে শিবা মাঝি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। তখন সে তার আগের সবল দেহের প্রেতমূর্তি মাত্র। শিবা ধীবর সম্প্রদায়ের লোক। দীর্ঘকাল আমাদের কাজ করেছে। ডাকুমারার জনশ্রুতি সম্বন্ধে তার বক্তব্য হচ্ছে যে, গারোরা একশ চল্লিশজন মাঝিকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কারণ, এক রাত্রে মাঝির দল রংরেঙপালে মাছ ধরতে গিয়ে এক গারোকে অপমান করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে মাঝিরা যখন পালাচ্ছিলেন, তখন গারোরা দল বেঁধে অনেক দূর অবধি তাঁদের তাড়া করেন। অবশেষে গারোদের আর না দেখে মাঝিরা ভাবলেন যে, তাঁরা পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত হয়েছেন। তাই তাঁরা অনেক রাত পর্যন্ত মাছ ধরেন। পরে খাওয়াদাওয়া সেরে গভীর রাত্রে ডাকুমারার কাছে যথারীতি উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁরা বালুচরে ঘুমিয়ে পড়েন। গারোরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁদের কিন্তু অনুসরণ করছিলেন। মাঝিরা তা টের পাননি। সে সুযোগে একশ চল্লিশজন গারো একশ চল্লিশজন ঘুমন্ত মাঝিকে হত্যা করে তাঁদের কাটা মুণ্ড নিয়ে পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে যান। শিবার বৃত্তান্ত অনুসারে নিহত মাঝির সংখ্যা পরিমিত আকারে পাওয়া যায়।

৩। Psyche of the Garos দ্রষ্টব্য।

৪। প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। বাঘমারা অঞ্চলে এক সংরক্ষিত অরণ্য ছিল। একবার বন্য গবয়ের ছবি তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের এক ছোট দল সেখানে গিয়েছিলেন। এক পার্বত্য ঝর্ণার পাশে আমাদের আহারের জন্যে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে রান্নার আগুন জ্বালাবার প্রধান উপকরণ 'দেশলাই' আনা হয়নি। আমাদের দলে কোন ধূমপায়ীও ছিলেন না। সে বিপদে আমার অরণ্য বন্ধু জুঙ্গা রক্ষা করেছিল। কোন বিপদে একটা উপায় খুঁজে বের করার ব্যাপারে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। গারোদের প্রচলিত পন্থায় ছোট দু খণ্ড কাঠ ঘষে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এটা ১৯৩৮ সালের ঘটনা।

৫। গারো অবিবাহিত যুবকদের বাসস্থানকে 'নকপান্থে' বলা হয়। সাধারণত প্রতি গ্রামে একটি নকপান্থে ছিল।

৬। কোন কোন পরিবারে পাহাড়ী ময়না, ভীমরাজ, শেরগজ (Green Magpie) পাখি পুষতে দেখেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গ পরগণার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবার

কালের অমোঘ নিয়মে বহু শতাব্দী পূর্বে নদীমাতৃক অরণ্যময় পার্বত্য সমতটে একসময় যে সুসঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছিল, আর্য ভারতের সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় সংস্কৃতি ছিল তার সক্রিয় ধারক ও বাহকশক্তি। তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষীর মনুষ্যসমাজ আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কিভাবে সুসঙ্গরাজ্যের অখণ্ড সত্তার মধ্যে মিলেমিশে এক হয়েছিল তার আভাস ইতিপূর্বেই কিছুটা বিস্তৃত আকারে বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুসঙ্গবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারের স্মরণীয় অবদান উল্লেখযোগ্য।

ক. শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচি, ডি. লিট্ মহোদয়ের স্থান সংস্কৃত সাহিত্যে ও সমাজে অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বিদ্বান সবর্ত্র পূজ্যতে' প্রবচনের সার্থকতা এই ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায়। এঁর জন্মস্থান হিসাবে সুসঙ্গের গৌরব সর্বভারতে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক-কালেও এই পরিবারের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। মেয়েদের মধ্যেও অনেকেই বর্তমান কালের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবারের গৌরব অব্যাহত রেখেছেন।

বাকলজোরা গ্রামের রাজগুরু বংশধরগণের প্রভাবে স্থানীয় সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চা ও প্রসার এতকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় হিসাবে শ্রীভূতেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকেই যোগ্যপদে কর্মে লিপ্ত। কেউ কেউ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ এবং কলকাতায় আপন আপন ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করে সুপরিচিত হয়েছেন।

ভাটিনিচকা গ্রামনিবাসী ৺হরচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহোদয় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ৺নীরদচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তাঁর পিতৃদেব রচিত 'দশকুসুমম্', 'শুকদূত', 'শিবাষ্টক স্তোত্র' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সুধীজনের কাছে সেগুলি বিশেষ সমাদরলাভ করেছে।

বালিচান্দা গ্রামের ৺রুক্মিনী ঠাকুরমহাশয় সুকবি ও সুসাহিত্যিক হিসাবে আঞ্চলিক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসঙ্গত 'ক্ষেমঙ্করী' প্রভৃতি জনপ্রিয় বাংলা নাটক রচয়িতা ৺ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহোদয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি সুসঙ্গের প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তখন ৺কুমুদচন্দ্র ছিলেন তাঁর ছাত্র।

গোপালপুর গ্রামনিবাসী শ্রী মনোরঞ্জন রায় (হাজং) অল্প বয়সেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর কিছু কবিতার বই পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। পরে তিনি 'নেফা' প্রান্তে সরকারী কর্মে রত হন।

প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্তীমহাশয় রায়পুরের মানুষ। তিনি ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে আচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রচারপ্রয়াসহীন চরিত্র স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর।

বিরিসিরি গ্রামের সাংমা পরিবার খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী কিন্তু গারো সমাজে তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। সাংমা পরিবারের রেভাঃ শ্রী বিনয়কুমার সাংমামহাশয় সম্ভবত স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিরিসিরি মিশনে সর্বোচ্চ ধর্মযাজক ও পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

বাঘবেড় গ্রামে ভাদুড়ীবংশীয় ৺রামশঙ্কর ভাদুড়ীমহাশয় এবং তাঁহার উত্তরপুরুষগণ অনেকেই উদ্যোগী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালক ৺অমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ীমহাশয় এদেশে সুপরিচিত।

নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী ডঃ অক্ষয়কুমার সাহা মহাশয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে সর্বভারতে সুনাম অর্জন করেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য রাশিয়া গিয়ে তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে তিনি বেসরকারী পরিকল্পনা কমিশনে সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং সেই কমিশনের রিপোর্টে ডঃ মেঘনাদ সাহা মহোদয়ের সহ-স্বাক্ষরকারীরূপে সুপরিচিত।

ঘাগড়া গ্রামের সুবিখ্যাত সিংহ ভাদুড়ী জমিদার পরিবারের ডাঃ ৺সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মেডিকেল কলেজে শল্য চিকিৎসার অধ্যাপক এবং শল্যচিকিৎসক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুর নিবাসী ৺শরৎচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সন্তানগণ উচ্চশিক্ষিত এবং কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে একজন লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত। কেউ কেউ ক্ষুদ্র বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নূতনত্ব দেখান এঁরা রাজপরিবারের দৌহিত্রবংশীয়।

আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী মণি সিংহমহাশয় আজ বিভিন্ন দেশে পরিচিত। রাজনীতি ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি এমন একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অদম্য

সাধনার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি পূর্বধলা সিংহ ভাদুড়ী পরিবারের মানুষ ; কিন্তু সুসঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এবং রাজপরিবারের দৌহিত্রবংশীয়। সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত। একদা তিনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা সমিতির সভ্য ছিলেন।

রায়পুর গ্রামবাসী ৺জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একনিষ্ঠ দেশসেবক, কংগ্রেস কর্মী এবং সুভাষপন্থী বিপ্লবী নেতা হিসাবে সুপরিচিত।

পূর্বধলা সিংহ ভাদুড়ী জমিদার পরিবারে রানীবাড়ি শাখার ৺মণীন্দ্রনাথ সিংহমহোদয় গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং একনিষ্ঠ কাজের মাধ্যমে সম্মানিত জীবনযাপন করেন। এই পরিবারে উচ্চশিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে লেঃ কর্নেল ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তার সহধর্মিনী ৺কমলাদেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। একমাত্র পুত্রের জন্মের পরেই অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ভগবৎকৃপায় সেই পুত্র উচ্চ শিক্ষান্তে সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগ্যপদে আসীন। সিংহমহাশয়ের মা মহারাজা রাজকৃষ্ণের কনিষ্ঠা দুহিতা।

স্বর্গীয় বিধু মাস্টার (হাজং) মহাশয় মেনকী গ্রামের লোক। শোনা যায়, প্রথম হাজং বিদ্রোহের সময় তিনি আড়ালে থেকে মুখ্য প্ররোচকের কাজ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁকে এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থরূপে দেখেছি। স্থানীয় বিদ্যালয়ে তিনি আমার পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

'আচিক সঙ্ঘ' গারোদের একটি সক্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা। যতদূর জানি বিরিসিরি গ্রামের লেঃ প্রাণকুমার সাংমামহাশয় স্থানীয় আচিক সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা।

৺সুধেন্দুকুমার বাগচীমহাশয় সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের অধিবাসী। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষতায় কেটেছে। তাঁর পুত্রকন্যাগণ সকলেই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

ঘাগড়ার সিংহ ভাদুড়ী জমিদার পরিবারের ৺সুধেন্দুমোহন সিংহ মহাশয় এবং তাঁর সুযোগ্য পত্নী দেশবিভাগের চরম বিপর্যয়ে পুত্রকন্যাদের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দিয়ে যথাযোগ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন। সিংহ মহাশয়ের স্ত্রী সুসঙ্গ রাজবংশের কন্যা। তাঁর ভ্রাতা শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহ মহাশয় পল্লীগীতি লেখক, সংগ্রাহক এবং সুরকার হিসাবে গুণী সমাজে সুপরিচিত।

ঘাগড়া গ্রামের ৺কালীপ্রসন্ন বাগচী মহাশয় বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ৺অন্নদা বাগচী মহোদয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁর বাস্তবধর্মী তৈলচিত্র একসময় শিল্পরসজ্ঞদের কাছে সমাদৃত হয়।

ইলাসপুর নিবাসী ৺কাশীচরণ সরকার মহাশয় অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আর্থিক সঙ্গতি লাভ করেন। সেকালে তাঁর স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ জনকল্যাণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

গালাগাঁওবাসী পরলোকগত খানবাহাদুর সরফউদ্দিন আহমেদ সাহেব ইংরেজ রাজত্বে জেলার 'পাবলিক প্রসিকিউটর' এবং জেলাবোর্ডের সভাপতি হন। স্থানীয় মুসলমান সমাজে এটা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

লেঃ আবু হোসেন সাহেব গাঁওকান্দিয়া গ্রামে এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আপন অধ্যবসায়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে অবিভক্ত বাংলায় 'সাব ইনসপেক্টর অব স্কুলস' এবং 'ডেপুটি কালেক্টর' হন। পরবর্তীকালে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে তিনি 'ই, পি, সি, এস' পদ লাভ করেন। শুনেছি অতঃপর তিনি 'পি, এ, এস' হয়েছিলেন।

নেত্রকোণায় বাংলা গ্রামের কায়স্থ সিংহ পরিবার বিত্তশালী। সেকালে তাঁরা গ্রামে এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

কর্মসূত্রে অস্থায়ী সুসঙ্গবাসী হয়েও যাঁরা আঞ্চলিক কল্যাণকর্মে ব্রতী হন, তাঁদের নামও স্মরণযোগ্য।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় সুসঙ্গের 'মহারাজা কুমুদচন্দ্র মেমোরিয়াল' হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বামী কাশীশ্বরানন্দ পুরী নামে সুপরিচিত হন। ছিয়ানব্বই বছর বয়সে তিনি ৺হৃষিকেশে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সদানন্দময় মূর্তি, সত্যনিষ্ঠা বিনয়, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আদর্শ জীবন তৎকালীন ছাত্রসমাজ এবং সুসঙ্গবাসীর মনে কালজয়ী প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রী শচীন্দ্রলাল রায়মহাশয় 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর ম্যানেজার রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি সুসাহিত্যিক এবং তাঁর উদ্যোগে সুসঙ্গে সর্বসাধারণের জন্য 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি মন্দির' নামে একটি গ্রন্থাগার ও মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় কৃষ্টিধারা সঞ্জীবিত হয়।

খ. কৃষি ও পশুপালন, কুটিরশিল্প, পল্লীগীতি, সহজিয়া সম্প্রদায়

জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব জন্মভূমি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ যাত্রার পথে একবার সোমেশ্বরী নদীর তীরে বিশ্রাম করেন। সে-স্থান 'চৈতন্যদেবের আখড়া' নামে পরিচিত হয়।

শঙ্করপুরের কাছে লেটিরকান্দা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে 'পাগোল সম্প্রদায়' নামে এক দলভুক্ত কিছু হিন্দু এবং মুসলমান, কোন এক মুসলমান গুরুর অধীনে ছিলেন। উল্লেখ করা যায় যে, ভক্তরা গুরুকে দর্শনী হিসাবে একটা হাতি কিনে দেন। পাগোল সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, অতীতের সন্ন্যাসী বিদ্রোহে তাঁদের যোগ ছিল।

স্থানীয় কীর্তনিয়াদের মধ্যে স্বর্গীয় অমরদেব রজনীদেব এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কীর্তনগান জনপ্রিয় ছিল। 'মানব গীতা' থেকে গারো ভাষায় পদ্যে রূপান্তরিত

করে অমরদেব মহাশয় সুললিত কণ্ঠে কীর্তনগান করে শোনাতেন। তাঁর 'দুখ মান্ দে মানফাগিফা রিপেংনী রিপেং' আজও স্মৃতিতে অনুরণিত হয়! পরবর্তীকালে মনা ও বুড়া দে এবং তাঁদের দল সঙ্গীতাভিনয়ের মাধ্যমে 'ময়মনসিংহ গীতিকাব্য' পরিবেশন করে সারা জেলায় খ্যাতি অর্জন করেন।

দেওটুকুন গ্রামের কাছে জনৈক ব্যক্তি একক সম্পূর্ণ রামায়ণ সঙ্গীত ও অভিনয় করেন। দক্ষ শিল্পী হিসাবে তিনি সুসঙ্গের বাইরেও সুখ্যাতি পান।

স্থানীয় বাউল, ভাটিয়ালী এবং কলমাকান্দার ভাটগান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

আমার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন। সুসঙ্গে থাকাকালে তিনি স্থানীয় এক অর্কেস্ট্রা পার্টি গঠন করেন এবং তাঁর উদ্যমে স্থানীয় লোকেরা মহড়া দিয়ে প্রথম 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেই নাটকে ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ও অভিনয় করেন। বিল্বমঙ্গল নাটক বেশ কিছুকাল অভিনীত হয়। একবার অভিনয়ের পূর্বমুহূর্তে কিভাবে দর্শকদের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, দক্ষিণা বাবুর আকস্মিক অসুস্থতায় অভিনয় বন্ধ থাকবে। বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী তাহাতে অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন। এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণাবাবু মঞ্চে আবির্ভূত হন এবং বেহালা সহযোগে স্বরচিত সঙ্গীত শুরু করেন, 'দাইড়া বেডার জ্বর হৈছে, আইজ নাডাই হইত না।' সেই গান শুনে দর্শকরা মুগ্ধ হন। পরবর্তী কালে সুসঙ্গের শিক্ষিতসমাজে বহু নাটকের চর্চা এবং অভিনয় হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের কুশলীশিল্পী স্বর্গীয় চন্দ্রা ওস্তাদজীর নামও স্মরণীয়।

স্থানীয় আদিবাসী এবং মণিপুরীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্যগীতের কথা ইতি-পূর্বেই বলা হয়েছে।

সুসঙ্গ নিবাসী স্বর্গীয় দ্বারিকা দে মহাশয় বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বই বাঁধাই, থিয়েটারের দৃশ্যপট চিত্রণ এবং সজ্জাশিল্প সকলের নিকট সমাদৃত হয়। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের কামড় এবং সর্পবিষের চিকিৎসা ব্যাপারে তিনি পারদর্শী ছিলেন। একজন সৎ সভাসদ্ হিসাবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন।

শ্রীরামদয়াল সর্দার মহাশয় আতসবাজি শিল্পের বৈচিত্র্যে দক্ষ কারিগর ছিলেন। স্থানীয় উৎসবাদিতে তাঁর উদ্ভাবিত অভিনব আতসবাজি শিল্প সকলকে বিস্মিত করতো।

কুমুদগঞ্জের রামসুন্দর কর্মকারমহাশয়ের বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রের মেরামতি কাজ এবং ছোটখাটো লোহার যন্ত্রাদি প্রস্তুতের ব্যাপারে নৈপুণ্যের জন্য প্রভূত সুনাম হয়।

স্বর্গীয় জগমোহন দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীহরিমোহন দে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প অনুশীলন করে স্বকীয় পারদর্শিতায় সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি পরে সপরিবারে [illegible]রো পাহাড়ে বাঘমারা গ্রামে বাস করেন।

স্বর্গীয় অক্ষয় মিস্ত্রী মহাশয় কাঠ, শিং এবং হাতির দাঁতের সুদক্ষ শিল্পী

ছিলেন। রঙ্গমহলের প্রধান কারিগর এবং আংশিক ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে তাঁর নাম পরগণার বাইরেও ব্যাপ্ত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, গোবিন্দ এবং রজনী মিস্ত্রী মহাশয়দের অপূর্ব শিল্পও যথাযোগ্য সমাদর পায়।

সুসঙ্গে গৃহনির্মাণ কর্মে সাধারণত বাঁশ, বেত এবং ছনের বহুল প্রচলন ছিল। স্থানীয় 'ছাকর বন্দ' বা 'ঘরামী মিস্ত্রী' নবীন ও অর্জুন আপন আপন দক্ষতায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। নির্মাণকৌশলে এবং বাঁশ-বেতের নকশা শিল্পে বাসগৃহকে তাঁরা অপূর্ব নৈপুণ্যে শ্রীমণ্ডিত করতে পারতেন।

সুসঙ্গবাসী মণিপুরীদের কুটিরশিল্প পরগণার বাইরেও সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে শ্রীগোকুল সিং ও তাঁর পরিবারের তৈরি বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীর মধ্যে ফুলের সাজি এবং বাজারের ঝুড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব রামদয়াল গারো হাতি ধরার হেড সর্দার ছিলেন। তিনিও মণিপুরীদের মতো তালপাতার পাখা তৈরি করে সুনাম অর্জন করেন।

হাজং এবং বানাইদের মধ্যে কিছু লোক উৎকৃষ্ট বেতবাঁশের কাজ করতে পারতেন। তাঁদের তৈরি বিশেষ এক ধরনের মোড়া বিদেশীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে এবং সেই মোড়ার খুব চাহিদাও হয়।

বিরিসিরি এবং রানীখং মিশনের উদ্যোগে এবং নিয়ন্ত্রণে প্রধানত গারোদের মধ্যে বিভিন্ন কুটিরশিল্প প্রশিক্ষণ এবং শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হয়। ফলে স্থানীয় কুটিরশিল্পের প্রভূত কল্যাণ হয় এবং শিল্পের প্রসার ঘটে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিরিসিরি স্কুলের এক ছাত্র তাঁর তৈরি এক সেট 'বুক এন্ডস' আমাকে উপহার দেন। সেগুলি আজও আমার সুখস্মৃতির নিদর্শন হয়ে আছে।

কুল্লাগড়া, বড়াই, পোড়াকান্দুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের ব্যবসায়িগণ পুরুষ পরম্পরায় বিত্তশালী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। উৎপাদনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তাঁরা শিল্পক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কিন্তু যেহেতু সেকালে কোনও সক্রিয় বিকল্প প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল তাই তখন ব্যবসায় পরিচালন স্বার্থে তাঁদের অর্থ-ঋণদানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কুল্লাগড়া গ্রামের সাহা ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় কার্য।

দুর্গাপুর গ্রামের স্বর্গীয় গোপাল দেব মহাশয় বিনয়ী, সদাচারী, সুগৃহস্থ এবং সৎ চাষী ছিলেন। কৃষির মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রমে সামান্য অবস্থা থেকে তিনি পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

শশারপাড় গ্রামবাসী কিছু মুসলমান চাষী বিভিন্ন শ্রেণীর সবজি চাষ প্রবর্তন করেন; ফলে সেকালে দুর্গাপুরের মতো প্রায় সংযোগবিহীন এবং দর্গম এক গ্রামের হাটে অকালে সবজি আমদানি করে তাঁরা গৃহস্থের চাহিদা মেটাতেন। এই প্রয়াস বিস্ময়কর। খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী মিশনের কিছু গারো চাষীও বিদেশী সবজি এবং অত্যুৎকৃষ্ট আনারস উৎপাদন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পান এবং পটলের চাষে কিছু হিন্দু চাষীর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

পাঁচকাঠা গ্রামে সুসঙ্গের বিখ্যাত বাউসাম বাথানে 'গোপ' বা 'ঘোষ'গণ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁদের আদি নিবাস পাবনা থেকে তাঁরা সিরাজগঞ্জে আসেন এবং সেখান থেকে পরে ক্রমে সুসঙ্গবাসী হন। মহিষ প্রতিপালনে তাঁহাদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। বাউসাম বাথামে প্রতিপালিত 'কার্কনি' অর্থাৎ স্ত্রী মহিষের সঙ্গে বন্য 'বয়ারের' সংমিশ্রণে সেখানে 'কাঁচর' মহিষের উৎপত্তি হয়। কাঁচর মহিষের স্বভাব কিছুটা অনিশ্চিত; সুতরাং এই মহিষ পরিচর্যা বেশ দুঃসাহসের কাজ। প্রচুর দুগ্ধ এবং স্নেহজাতীয় গুণের আধিক্যহেতু কাঁচর মহিষের খুব নামডাক হয়। বর্ষার প্রাক্কাল পর্যন্ত স্থানীয় গো-পালকগণ তাঁদের প্রায় সমুদয় গরু এই বাথানে এনে রাখতেন। সুসঙ্গের রাজারাও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ষাঁড় আমদানী করে এই বাথানে দিতেন। তাতে স্থানীয় গো-সম্পদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। শীতকালে নেপালীরা তাদের 'বাঙর' বা দেশী মহিষগুলিকে পাহাড়ী সানুদেশ থেকে সমতলে নিয়ে আসতেন এবং বর্ষা সমাগমে সেগুলিকে আবার উপরে নিয়ে যেতেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, বিংশ শতকের প্রারম্ভে স্থানায় প্রাচীন কৃষ্টিপ্রবাহ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং রাজপরিবারে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাব হ্রাস পেলেও আধুনিক শিক্ষার স্তরে পরগণাবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়।

সুসঙ্গ রাজবংশে শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত কুমার নীরদচন্দ্র সিংহ সমকালীন দুইজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক এবং বিংশ শতকের দুই দশক কাল পরগণার যাবতীয় কার্যে তাঁদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই দুই পুরুষের মতামত তীব্রভাবে বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। ফলে, তা কখনো কখনো সুসঙ্গের সুপ্রাচীন সম্মানিত মর্যাদা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়েছে।

পারিবারিক রীতির ব্যতিক্রমে রাজবংশের রায়বাহাদুর ৺সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ফলে তাঁর পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের উপার্জনের পথ সুগম হয়। কিন্তু দুই দশকের মধ্যে রাজপরিবারের অন্যান্য যুবকদের মধ্যে এই আদর্শের কোন প্রভাব দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে একান্তই প্রতিকূল ঘটনা প্রবাহের আবর্তে তাঁরাও ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়াসী হতে বাধ্য হন।

যে মহাশক্তির সৃজনীলীলায় সৃষ্টিবৈচিত্র্য অব্যাহত আছে অনাগত কালের লীলায় একদা উদ্বুদ্ধ সুসঙ্গ বিন্দু যেন সেই শিবচৈতন্যে পুনরায় নব রূপায়ণে সার্থকতা লাভ করে, মহামায়ার নিকটে এই আমার প্রার্থনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম

বঙ্গদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রসারের ইতিহাস সুবিদিত। ভারতবিজেতা ব্রিটিশ শক্তির নিরাপদ পক্ষপুটে প্রবর্তিত নব্য ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথেই প্রধানত তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ-সংস্কারক ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতো ধর্মপ্রবক্তার আবির্ভাবে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে ধর্মান্তরের ধারা যখন বহুলাংশে রুদ্ধ হয়, তখন সুশিক্ষিত ও নিয়মনিষ্ঠ খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ গ্রাম্যসমাজে অগণ্য অস্পৃশ্য হিন্দু আর অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলবাসী উপ-জাতিদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পান। বিশেষ কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট পন্থায় কাজের উদ্দেশে বিদেশী কর্তৃপক্ষ মিশনারীদের উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠিয়েছেন। এমন কি কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আঞ্চলিক ভাষা ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁরা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এসেছেন।

হিন্দু সমাজে বহুনিন্দিত বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে আমি দুর্বলতার বিষয় বলে মনে করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতারূপ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী ধর্মান্তরকারী শক্তি অনুপ্রবেশের পথ সুগম করেছে। তাছাড়া তাঁদের অধীন দেশজ ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত ধর্মযাজকগণ হিন্দু সমাজের বর্ণবিদ্বেষকে পুরোমাত্রায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে যখন খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ এ অঞ্চলে আসেন, তখন হিন্দু সমাজের নায়ক হিসাবে সুসঙ্গরাজ্যেই মহারাজার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। রাজপরিবারের ঐক্যবন্ধন অতিদ্রুত শিথিল হয়ে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সুতরাং পরিবারের প্রতিভূরূপে স্থানীয় হিন্দু সমাজে মহারাজা এতকাল যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন সে পথও জটিল হয়ে আসে। এদিকে সরকারের আশ্রয়পুষ্ট মিশনারীরা নিশ্চিন্তে এবং দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করে যান; কারণ, তেমন কোন বিরোধের ভয় ছিল না।

হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার অসন্তোষ উসকে দিয়ে মিশনারীরা আপন

স্বার্থে তার পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন এবং গ্রাম্য বর্ণাশ্রম হিন্দু সমাজে অকারণ হস্তক্ষেপ করে প্রায়ই বিক্ষুব্ধ পক্ষের সমর্থন করেছেন ; কারণ, ভিন্ন মতের মানুষ সহজেই প্ররোচিত হন এবং তাঁদের সাহায্যে সহজেই বিক্ষোভ সৃষ্টি করা যায়। বহুক্ষেত্রে কৃত্রিম অভিযোগ এভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁরা ধর্মান্তর করার লক্ষ্য হিসাবে অস্পৃশ্য হিন্দু আর পরগণাবাসী বহু উপজাতি সম্প্রদায়কে বেছে নেন। হিন্দু সমাজে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব ছিল। তবু আশ্চর্য যে, হিন্দু পর্যায়ভুক্ত হাজং, বানাই, নমশূদ্র, মুচি, মালি কিংবা অন্যান্য নিম্নবর্ণের উপ-সম্প্রদায়ের মানুষ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নেই।

১৮৬৯ সালে 'গারো হিলস্ এ্যাক্ট' প্রবর্তনের ফলে সুসঙ্গ পরগণাভুক্ত গারো পাহাড় অঞ্চলবাসী গারোদের মধ্যে মিশনারীদের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ও ফলপ্রসূ হয়। গারো পাহাড়ে সুসঙ্গ রাজার কতৃত্ব অবসান হওয়ায় নতুন প্রজাস্বত্ব প্রথা অনুসারে তিনি হাজংদের কাছে প্রাপ্য খাজনা টাকায় রূপান্তরিত করেন : ফলে যথেষ্ট বিক্ষোভ হয়। এ ধরনের পরিবেশে যেমন হয়ে থাকে আইনজীবীরা সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেননি। হাজংদের প্রভাবিত করে তাঁদের খ্রীস্টধর্মের গণ্ডির মধ্যে আনার সেটাই যে সুবর্ণ সুযোগ মিশনারীদেরও তা বুঝতে দেরী হয়নি। তাই সূচনাতেই তাঁরা এবং আইনজীবিগণ একজোটে রাজার বিপক্ষে যান। কিন্তু গোটা হাজং সম্প্রদায় এই প্রতিক্রিয়ায় যে তাঁদের হাতের বাইরে চলে যাবে এবং মিশনারীদের খপ্পরে পড়বে আইনজীবীদের সেটা বুঝতে দেরী হয়নি। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক সে পথ থেকে সরে এলেন। তবুও যে হাজং সম্প্রদায় এতকাল রাজার অনুগত ছিলেন তাঁরাই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে দীর্ঘকালের আঞ্চলিক শান্তি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেয়। মিশনারীরা যা আশা করেছিলেন সেভাবে কোনও হাজংকে তাঁরা ধর্মান্তরিত করতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশুভ প্রভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং প্রতিকারের ফলপ্রসূ উপায় না দেখিয়ে তারা আঞ্চলিক শান্তি ও সংহতি নষ্ট করেছেন। হাজং বিদ্রোহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এটা ঊনবিংশ শতকের শেষদিকের ঘটনা। এই সূত্রে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের আবির্ভাব এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁদের সেখানে যাওয়া এবং সুসঙ্গ পরগণায় আসার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ইংরেজ শাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে মিশনারীদের এনেছিলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের 'বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত' গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি সেকথা স্পষ্ট করবে।

কোন আদিবাসী অঞ্চলের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা করায়ত্ত করার পদ্ধতি উদ্ধৃতির প্রথম বিষয়বস্তু। দেশীয় রাজন্যবর্গের কুশাসনে সংস্কৃতি বিকৃত হচ্ছে এবং অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে এই অজুহাতেই ইংরেজ রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ঘটেছে। মুখ্যত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আভ্যন্তরীণ অন্ধ গোঁড়ামির (সম্ভবত পারস্পরিক

বিরোধ) ফলে ভিন্ন মতের মোয়ামারি সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের জন্য ইংরেজরা আসাম সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন।

'বদনামের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে সাজা দাও' বহু প্রচলিত এই প্রবাদ অনুসরণ করেই রাজনীতিবিদরা অনিচ্ছুক ব্যক্তির উপর শাসন চাপান।

"হিন্দুদের ভুতুড়ে আধ্যাত্মিক প্রভাব দূর করে দিব্য খ্রীস্টানদের প্রবেশপথ সুগম করার উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে ১০ নং রেগুলেশন তৈরি হয়। 'গভর্নর-ইন-কৌন্সিল' পার্বত্য গারো জাতি এবং রংপুরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রচলিত আইনের পরিবর্তে ১৮২২ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর এই আইন পাশ করেন। অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।"

১৮২৫ সালে ২৭শে এপ্রিল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী 'ডব্লু. বি'-কে লেখা এক পত্র থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমন সম্বন্ধে অন্তর্নিহিত নীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"গারোদের ধর্মান্তরিত করার কাজে একাধিক উপযুক্ত মিশনের জন্যে লন্ডনে আমার প্রতিনিধির কাছে আমি যে কমিশন পাঠিয়েছি তার জবাবে কোন এক ব্যক্তি, সম্ভবত তাঁর এক বন্ধু---যাঁর সঙ্গে আমার ভাই পরামর্শ করেন.........কলকাতার বিশপদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন.....বেচারা গারোদের অনুকূলে আমরা হস্তক্ষেপ না করলে তারা অচিরেই 'হিন্দু' অথবা 'প্রায় হিন্দু' হয়ে যাবে।"[১]

"ধর্মের সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যাও শেখাতে পারেন এমন দু একজন বা তা চেয়েও বেশী মোরাভিয়াবাসী রক্ষণশীল ধর্মযাজকের উপর আমি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি......বিশেষ সুবিধা দিলে হিন্দু ছেলেদের খ্রীস্টান করার ব্যাপারে যে সুফল পাওয়া যাবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় যে, আদিবাসীরা আজও অসংস্কৃত এবং স্বাদেশিকতার শৈশব দশায় আছে। মিশনারীরা তাদের বাদ দিয়ে সভ্যভব্য দেশীয়দের দিকে নজর দিয়ে মস্ত ভুল করেছেন। অতএব বিদেশী ধর্মযাজকগণ স্কুলশিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে খুশিমত তাদের শেখাতে পারবেন।"

মোটের উপর সেক্রেটারীমহাশয় আধা-সরকারী অনুমোদন দিয়ে প্রত্যুত্তরে বলেছেন, "মিশনারী হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সরকার বেতন দিতে পারেন না ; কিন্তু স্কুল-শিক্ষকরূপে পরিচিত হলে তাঁদের সাহায্য করা যাবে।"[২]

গারো পাহাড় অঞ্চলকে সরাসরি চীফ কমিশনারের শাসনে আনার উদ্দেশ্যে একের পর এক আইনানুগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। বিদেশী শাসকের পছন্দ মতো গারোদের নতুন করে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করার জন্যে খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের দায়িত্বে তাঁদের পৃথক করার ব্যবস্থা হয়। অথচ গারোরা দেশের মানুষের সঙ্গে মোটামুটি মিলেমিশেই বাস করেছেন। কিন্তু বিজাতীয় বিচিত্র এক সংস্কৃতি আমদানি করে তাঁরা গারোদের মধ্যে যেভাবে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেন তার

সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসীদের থেকে গারোরা পৃথক হয়ে যান। সুসঙ্গ রাজা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিভূ হলেও আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে কখনও কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু এবং গারোদের মধ্যে কোন মিল নেই; তবু গারোরা হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন। এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। মনে আছে, একবার দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির অবস্থা চলছিল। তখন গারোরা নাচগান করে হিন্দু পৌরাণিক দেবতা পবনের পুত্র হনুমানের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। সে দৃশ্য দেখে আমি খুবই বিস্ময় বোধ করেছি। গারো পাহাড়ের দুর্গম অন্তর্বর্তী অঞ্চলবাসী গারোদেরও বাসন্তী ও দুর্গাপূজা উৎসবে যোগ দিতে দেখেছি। গারোরা যে বহু পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী এবং তাঁদের কাহিনী স্বীকার করেন তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

ইংরেজ রাজশক্তির অনুষঙ্গী বিদেশী খ্রীস্টীয় সভ্যতা ধর্মান্তরিত গারোদের সমাজজীবনে অবাঞ্ছিত আবর্তন সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে এক কৃত্রিম মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে এবং গারোদের সমাজ ও অনুষ্ঠানগুলো থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অথচ তাঁরা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাছে নিজেদের সব সময় ছোট মনে করে এসেছেন। তাঁরা নিরপেক্ষ হিন্দু সমাজের সঙ্গে বসবাস করলেও খ্রীস্টীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁদের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথ বিঘ্নিত হয়েছে। কলকাতার এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মতোই সুসঙ্গ পরগণার ধর্মান্তরিত গারো সমাজে কোন বলিষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি। কৃত্রিম মর্যাদাবোধের মোহে তাঁরা দেশের জনজীবনের সঙ্গেও তেমন খাপ খাওয়াতে পারেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থানীয় মুসলমানদের কথা বলা যায়; তাঁরা বহুদিক থেকেই হিন্দুদের চেয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী; কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবিত সুসঙ্গ পরগণায় তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করার গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলেন।

গারো পাহাড় সুসঙ্গরাজের অধিকারচ্যুত হবার কিছুকাল পরে আংশিক শাসনতন্ত্র বহির্ভূত পৃথক এক জেলা হিসাবে পরিণত হয়। এই জেলার যে অঞ্চল একদা সুসঙ্গ পরগণার অঙ্গ ছিল, সেখানে লোকবসতির দিক দিয়ে গারোদের সংখ্যাই বেশী। তাই বিদেশী রাজশক্তির পরিকল্পনা অনুসারে নতুন ধরনের এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সেখানে ধর্মান্তরিত গারোদের মিথ্যে পদমর্যাদা বোধ তাঁদের দেশীয় স্বজাতিদের থেকে পৃথক করেছে। ফলে আপন বাসভূমে তাঁরা তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেননি।

দক্ষিণাঞ্চলে যে গারোদের বাস ছিল ব্যবহারিক জীবনে আদানপ্রদান ব্যাপারে তাঁরা বাঙালীদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করেছেন। অথচ মিশনারীরা সেখানে যত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তার মাধ্যমে রোমান বর্ণমালা প্রচলন করে অত্যন্ত কৌশলে শাসকদের অনুকূলে গারো এবং বাঙালী সমাজে ভেদ সৃষ্টি করে যান।

কিন্তু গারোদের মধ্যে স্বার্থ-সচেতন বিশেষ এক শ্রেণী গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন।

প্রসঙ্গত একবার আলাকফাং গ্রামের কোন স্কুলে কিছু পাঠ্যবই দেখার সুযোগ হয়। স্বাভাবিক কারণে একটা বইয়ের ছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, রাজা এক সুসজ্জিত বড় দাঁতালো হাতি চড়ে এক গারো গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ সেই হাতির শুঁড়ের সঙ্গে এক ছোট শিশুর ধাক্কা লাগে। কোন খ্রীষ্টান মঠবাসিনী তখন সে পথেই যাচ্ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন অথচ সেই উদ্ধত রাজা শিশুর অবস্থার দিতে দৃকপাত না করেই হাতির পিঠে বসে চলে গেলেন। মিশনারীদের সঙ্গে সুসঙ্গ রাজাদের যে কত পার্থক্য সেই প্রসঙ্গেই এ-ধরনের ছবির অবতারণা এবং পরিণত জীবনের পথে পা বাড়াবার সময় থেকেই এভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শাসনবিধিবহির্ভূত গারো পাহাড় অঞ্চলে এমনধারা প্রচার ধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় ঈপ্সিতফল অবশ্যই পাওয়া গিয়েছে। এভাবে যে বীজ ছড়ানো হয়েছে সেগুলো শুধু অঙ্কুরিতই হয়নি, রক্ষাকবচের সযত্ন নিয়ন্ত্রণে তারা আকৃতিতেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুসঙ্গ পরগণার সমতলে গারোদের সংখ্যাধিক্য ছিল। ঊনিশ শতকের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়ার কোন মিশন সুসঙ্গের পশ্চিমে বিরিসিরি নামে এক অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। সরকারের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ সম্বন্ধে পরগণার সাধারণ মানুষ প্রথমদিকে কিন্তু কিছু আঁচ করতে পারেননি। যাঁরা মিশনের সাহায্য চেয়েছেন তাঁরাই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। ক্রমে দেখা গেল যে, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের প্রভাবিত করার ক্ষমতাও তাঁদের আছে। সরকারী কর্মচারীদের কাছে বৈষয়িক সুযোগসুবিধা পেতে হলে এঁদের তোষামোদ করে যে লাভ হয় সাধারণ মানুষের তা বুঝতে দেরি হয়নি। নিচু মহলের কর্মচারিগণ তো বটেই এমনকি স্থানীয় পুলিশও এঁদের কথার অন্যথা করার সাহস পাননি। সুসঙ্গের জমিদাররাও বুঝেছিলেন যে, জনসাধারণের উপর প্রভাব বজায় রাখার ব্যাপারে স্থানীয় ব্যাপ্টিস্ট মিশন তাঁদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এটা একদিকের চিত্র ; এর আর একদিকও আছে। মিশনারীরা স্কুল, হাসপাতাল এবং কুটিরশিল্প প্রবর্তন করে সাধারণ মানুষের প্রিয়ভাজন হন এবং তাঁদের প্রশংসনীয় ও আকর্ষণীয় সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁদের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে যায়। সুসঙ্গরাজ এবং বিরিসিরি মিশনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সরকারী সাহায্যপুষ্ট মিশনের তুলনায় রাজার সুযোগ তেমন ছিল না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক সাংগঠনিক কাজে রক্ষণশীল রাজাদের চেয়ে তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী সুযোগসুবিধা পেয়েছেন।

ধর্মযাজকরা গারোদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যান। সেকালে পাহাড়বাসী গারো আর সমতটের মানুষদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের

ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। ফলে গারো পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলবাসী কিছু গারো বিরিসিরি মিশনের প্রভাবে আসেন। কিন্তু গারো সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ খ্রীস্টধর্মের প্রভাবমুক্ত থেকে যান। তাছাড়া অন্যান্য আদিবাসীদের কথা আগেই বলেছি এবং স্থানীয় অন্য কোন আদিবাসী ধর্মান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত জানা নেই। তাহলেও বর্ণাশ্রম সমাজবিরোধী কিছু হিন্দু এবং কিছু অসন্তুষ্ট প্রজা পরামর্শের জন্যে মিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এতে স্থানীয় শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এবং পরিণামও সুখের হয়নি।

স্থানীয় কোন কোন কর্মচারী মিশনারীদের তুষ্ট করতে আইনের মর্যাদা রক্ষা করেননি। এমন ঘটনাও আমার অজ্ঞাত নয়। এমনকি, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত উচ্চ আদালতও ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন।

গারোহিলে কাজ করার সময় মিশনারীরা ডেপুটি কমিশনার সাহেবের প্রভাবে সবরকম সাহায্যই পেয়েছেন। সুতরাং নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি। গারোরা সমতলের মুসলমানদের বড় রকমের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখেছেন। কারণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার তাঁদের তোষামোদ করে চলেছেন। তাই তাঁরা মুসলমানদের সাধারণত এড়িয়ে চলতেন। ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুরাও বেঁকে বসেছেন; তখন মিশনারীরাও সহজে তাঁদের বাগে আনতে পারেননি। এ অঞ্চলে এই তিন শ্রেণীর সংস্কৃতিতে যে বিরোধ ছিল ইংরেজ সরকারের পক্ষে নির্দিষ্ট আশানুযায়ী আদিবাসীদের গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

কিছুকাল পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সোমেশ্বরীর পশ্চিমে রানীখং নামে এক টিলার উপরে মনোরম পরিবেশে এক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত আমেরিকার ক্যাথলিক মিশনের ব্যবস্থাপনায় এই প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয়। উল্লেখযোগ্য আর-এক ঘটনা হচ্ছে যে, ব্যাপ্টিস্ট এবং ক্যাথলিক মিশনের শ্বেতকায় দুই ধর্মযাজকের মধ্যে কলহ। এই মর্যাদাহানিকর বিবাদে স্থানীয় জনসাধারণ বিস্মিত হলেও আনন্দ উপভোগ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপ্টিস্ট মিশন সরকারী সাহায্য পেয়েছেন আর ক্যাথলিক মিশন শুধু পরোক্ষ সমর্থন লাভ করেছেন। মাঝে মাঝে সমর্থন ছাড়াও তাঁদের কাজ চালাতে হয়েছে। অতএব সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এই মিশনকে অনেক বেশী জনহিতকর কাজে ব্রতী হতে হয়েছে। তাঁদের পরিকল্পিত হাতের তাঁত যন্ত্র গারোদের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করে এবং গারোদের তৈরি কাপড়ের মান যথেষ্ট উন্নত হয়। অভীষ্ট লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষিত বিদেশী মিশনারী পর পর কর্মে ব্রতী হন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ প্রয়াসে এই মিশন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত আমি এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। সেদিন গারো-হিলের ডেপুটি কমিশনার বেঞ্জামিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বাঘমারা থেকে ফিরে আসছি। সূর্য তখন অস্তাচলগামী। আমার হাতি চলেছে রানীখং

মিশনের দিকে। পথে দেখলাম এক বিদেশী ধর্মযাজক এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছেন, একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, আবার এগুচ্ছেন। তিনি চলেছেন বাঘমারার দিকে। সন্ধ্যার মুখে তাঁকে এভাবে যেতে দেখে আমার বিস্ময় বোধ হলো। আমরা যখন প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছি তখনই তাঁর শরীরের দুরবস্থা টের পেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন সাহায্য তাঁকে করতে পারি কিনা! ধর্মযাজক অত্যন্ত সৌজন্যে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তার হেতু বুঝতে পারলাম না। তাঁর দেহ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মহারাজার মতো গুরুত্বপূর্ণ এক বিধর্মীর সাহায্য নিতে তাঁর মন সায় দেয়নি। এত অসময়ে অসুস্থ শরীরে এভাবে তাঁর হেঁটে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, মিশনে এখন তিনি একাই রয়েছেন: তাই ডাকের চিঠিপত্র আনতে তাঁকেই বাঘমারায় যেতে হয়। সুদূর আমেরিকা থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আর-একজন ধর্মযাজকের আগমন তিনি প্রত্যাশা করছেন। সে সুসংবাদ নিয়ে হয়তো চিঠি এসেছে। তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে বললেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন মৃত্যুর পূর্বে কোন উত্তরাধিকারীকে আমার কর্মভার দিয়ে যেতে পারি।" তাঁর নিষ্ঠা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তাঁর কাছেই শুনলাম যে, মিশনের সেবায় তাঁর আগে আরও দুজন ধর্মযাজক দেহরক্ষা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শেষ হলেও এই মিশন স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিছুকাল পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মিশনের সেই নিষ্ঠাবান, উৎসাহী ধর্মযাজকের দেহান্ত হয়েছে। সে সংবাদ অপ্রত্যাশিত ছিল না কিন্তু এই স্মৃতি আজও মনকে ভারাক্রান্ত করে।

আমার বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত যে কারণে সুসঙ্গের মিশনগুলো সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে এবার তার আর একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে মিশনারীরা জনসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হন; তখন বিরিসিরি মিশনের কর্তৃপক্ষ রাজপরিবারের প্রভাবশালী শরিকদের সঙ্গে ব্যবহারিক উদারতা দেখাতে থাকেন। একবার মিশনের প্রধান কর্মকর্তা তাঁদের স্কুল পরিদর্শনের জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে মিশনের শিক্ষাব্যবস্থা দেখার সুযোগ পেয়ে আমার বড় আনন্দ হয়। সেদিন আমি যখন স্কুলের বালিকাবিভাগ দেখছি, তখন এক তত্ত্বাবধায়িকা পরিষ্কার পোষাকপরা বছর তিনেকের এক গারো শিশুকে আমার সামনে নিয়ে এলেন। নিটোল স্বাস্থ্য এবং হাসিখুশিতে ভরপুর সেই ছোট শিশুর হাতে একটা চক পেন্সিল দিয়ে তিনি তাকে কিছু লিখে দেখাতে বললেন। একটু মুচকি হাসি হেসে কাঠের মেঝের উপর বসে নিপুণ হাতে সে ইংরেজি বর্ণমালার কয়েকটা অক্ষর লিখে দেখাল। সে বয়সের যে কোন শিশুর পক্ষেই সেটা বেশ বাহাদুরির কাজ। তার ইতিহাস হচ্ছে যে, একবার কোন গারো বস্তিতে ভয়াবহ কলেরা দেখা দিলে বস্তিবাসীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। এই শিশুটি তার প্রাণহীনা মায়ের বুক আঁকড়ে পড়েছিল। দৈবক্রমে এক মেট্রন তাকে উদ্ধার করেন। আর

কিছু দেরী হলে হয়ত কোন বন্যপ্রাণী তাকে মেরে খেত। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিশনের কোন কর্মী কি এভাবে পরহিতব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন? জনকল্যাণব্রতী সৎ কর্মীদের জন্যেই খ্রীস্টধর্মের প্রসার সম্ভব হয়েছে আর তেমন নারী ও পুরুষকর্মীর সংখ্যাও নগণ্য নয়।

খ্রীস্টধর্ম সুসঙ্গবাসীর মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি কিন্তু খ্রীস্টসভ্যতা শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন তা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। তথাপি এই সভ্যতার কল্যাণ-ধর্মী কর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংমিশ্রণ একান্ত ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে।

টীকা

১। ভয়টা আসলে হচ্ছে যে, আদিবাসীরা হিন্দুধর্মের আওতায় চলে যাবে।

২। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, মিশনারীরা স্কুলশিক্ষকের ছদ্মবেশে এসেছেন ; ফলে সরকারী কর্মী হিসাবে গণ্য হতে তাঁদের কোন অসুবিধে হয়নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গে হাতি খেদা

ভারতীয় হাতি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে গিয়ে হাতি ধরার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি কিছুটা বিস্তৃত আকারেই কোন এক বাংলা সাময়িক পত্রিকায় লিখেছিলাম। এবার সুসঙ্গ পরগণায় হাতি ধরার প্রসঙ্গে কিছু বলব।

ভারতে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত হাতি ধরার নিম্নলিখিত রীতি প্রচলিত ছিল— (১) চোরা গর্তের ফাঁদ (২) পরতালা (৩) ফাঁদ এবং (৪) খেদা।

আইনের সাহায্যে চোরা গর্তের ফাঁদে হাতি ধরা নিষিদ্ধ হয়েছে। এই রীতিতে বুনো হাতির 'গড়মলম' অর্থাৎ চলাফেরার প্রধান পথ বেছে নিয়ে সেখানে গর্ত করা হয় এবং সেগুলো এমন করে ঢেকে দেওয়া হয় যে, হাতি কোন সন্দেহ না করে সে পথে ছুটে আসতে গিয়ে খাদে পড়ে বন্দী হয়। পরে শিক্ষিত হাতির সাহায্যে খাদ থেকে তাদের বের করে আনা হয়। এতে এত বেশী হাতি মারা যেত অথবা পঙ্গু হতো যে, সামরিক সরবরাহ বিভাগে এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মক্ষেত্রের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নিশ্চিত, উন্নত ও লাভজনক 'খেদা' প্রথা সরকারের স্বীকৃতি পায়; ফলে চোরা খাদে হাতি ধরা বন্ধ হয়ে যায়।

পরতালা রীতিতে হাতি ধরা সম্বন্ধে বলছি। সুসঙ্গের 'দাইদার'-রা এ-ব্যাপারে দক্ষ ছিল। তারা গারো পাহাড়ের পাদদেশে বৃহদাকার মর্দা হাতি ধরেছে। আমি তাদের হাতি ধরা দেখেছি।

ভারতীয় বন্যহাতি সম্বন্ধে যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন যে, পুরুষ-হাতি কোন এক সময় যৌন আবেগে উত্তেজিত হয়। তারা তখন মানুষকে এড়িয়ে চলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বিস্মৃত হয় এবং অদ্ভুত আচরণ করে। দৈহিক দিক থেকে সক্ষম যে স্ত্রী-হাতি সেই উত্তেজিত পুরুষ-হাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'মস্তি'র সমর্থনে তার সঙ্গেই মিলিত হয়।

অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো হস্তিনীর দেহে বাইরে থেকে তেমন উত্তেজনার [illegible] লক্ষণ কদাচিৎ নজরে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখেছেন কদাচিৎ দেখা [illegible] 'মস্তি'র বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও কোন হস্তিনী পুরুষ-হাতির চোখে ধরে [illegible]র সঙ্গে মিলিত হয়। তবে সাধারণত এমন হয় না। বসন্তকালে

বন্যহাতির দলে একাধিক মর্দা হাতির মস্তি হলে তাদের সকলের পক্ষে দলে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ দল ছেড়ে চলে যায়। তখন স্বাভাবিক কারণেই তারা পোষা স্ত্রী-হাতির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এভাবে তারা কোন পিলখানায় চলে এলে চারটে বা তার বেশী শিক্ষিত স্ত্রী কুনকি হাতির সাহায্যে তাদের ধরার চেষ্টা করা হয়। যে কুনকির দিকে মর্দা হাতির আকর্ষণ বেশী তাকেই তার সামনে রাখার চেষ্টা করা হয়। কুনকিটা সেই বুনো হাতির সামনে সামনে চলে; মাহুত কিন্তু কুনকির ঘাড়েই বসে থাকে, অথচ ঘাড়ে বসে থাকা মানুষটির সম্বন্ধে তখন মর্দা হাতিটির কোন হুঁশ থাকে না। মাহুতের হাতে তখন আত্মরক্ষার জন্য থাকে মাত্র একটা 'জাঠা' অর্থাৎ লোহার সূচীমুখ বাঁশের ছড়ি! কুনকির প্রতি আসক্ত সেই মত্ত হাতিটাকে কোন বিরাম না দিয়ে দিনরাত চলতে বাধ্য করা হয়। অবশেষে তার ক্লান্তি আসে এবং মাঝে মাঝে কুনকির পিঠে শুঁড় রেখে একটু বিশ্রাম করে, আর চারপাশের পরিবেশ ভুলে, তার প্রেমপাত্রীর স্পর্শসুখের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। ১৯১৫ সালে সুসঙ্গ বাজারের মাঝখানে দশ ফিট আড়াই ইঞ্চি উঁচু প্রকাণ্ড এক দাঁতাল হাতি এভাবে ধরা পড়ে। সেদিন ছিল হাটবার। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকশ মানুষ সে দৃশ্য দেখেছে। হাতিটা তার চেয়ে দু-ফিট ছ-ইঞ্চি খাটো এক কুনকির পিছনদিকে শুঁড় লম্বা করে রেখে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়েছিল। মৈমনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৩ সালে দুর্গাপুর পুলিশ থানা থেকে একশ গজ দূরে অনেক লোকের সামনে আর একবার প্রায় সাড়ে আট ফিট উঁচু সুশ্রী এক দাঁতাল হাতি ধরা হয়। অল্প বয়সের সেই হাতিটা প্রণয়িনীর প্রলোভনে পড়ে সম্ভবত প্রথম প্রেম করতে গিয়ে স্বাধীনতা হারায়।

মর্দা হাতিটা তার প্রেমিকার সঙ্গে যখন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন চারটে থেকে ছটা কুনকি হাতি তাকে দুপাশ থেকে ঘিরে তাদের পিছনদিক দিয়ে চাপতে থাকে। পরতালার জন্যে দড়ির সরঞ্জাম নিয়ে কুনকিগুলো প্রস্তুত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটা কুনকির বিশেষ গুরুত্ব থাকে। কারণ, সে এমন ভাবেই শিক্ষিত যে, সামান্য স্পর্শেই দাইদারের নির্দেশ বুঝতে পারে এবং সে অনুসারে কাজ করে। একে সিঁড়ির কুনকি বলা হয়। তার শরীরে অতিরিক্ত দড়ি বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে বাঁধা থাকে। আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলেই দাইদার সহজে সেগুলো সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে চটপট হাতির পিঠে উঠে পড়ে। হাতির পিঠে পরতালার দড়িও প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনে মাহুত সেগুলো পরতালা বাঁধার দাইদারকে দিয়ে দেয়। এই দড়িগুলোর ব্যাস দু ইঞ্চি আর এগুলো লম্বায় বার থেকে চোদ্দ ফিট।

বুনো হাতির কাছাকাছি গিয়ে দাইদার একটা দড়ি (পরতালা) নিয়ে নিঃশব্দে কুনকির পিঠ থেকে নেমে পড়ে। এদিকে সেই অতিকায় প্রাণীটার দোদুল্যমান ল্যাজের স্পর্শ এড়িয়ে দাইদার তার পিছনদিকে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাতিটা

কিছু আঁচ করার আগেই তার পিছনের এক পায়ে তখন প্রথম দড়ির দুপ্যাঁচ বাঁধা হয়ে যায়। সেই দড়ির অপরপ্রান্ত হাতে রেখে দাইদার দ্বিতীয় পরতালার ফাঁস লাগাতে আরম্ভ করে। সহকারী দাইদার দুটো দড়ি হাতে নিয়ে তার পাশে অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে থাকে । হাতির আর এক পা বাঁধা হলেই দাইদার কোন ভুল না করে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তার দুটো পা একসাথে দড়ির প্যাঁচে বেঁধে ফেলে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ করার সময় দাইদার তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে একাগ্রচিত্তে মগ্ন হয়ে থাকে। মাঝারি আকারের হাতিকে অন্ততপক্ষে চার গাছা দড়ি এবং বড় হাতিকে আটগাছা দড়ি দিয়ে পিছনের দুপা বাঁধা হলে দাইদার একটু বিশ্রাম নেয়। বাকি কাজটুকু তার সহযোগীর দায়িত্বে সম্পন্ন হয়। সে ইতিমধ্যে আরও দুটো থেকে ছটা পরতালা বেঁধে ফেলে। এভাবে একত্রে জুড়ে বাঁধা দুপায়ের ঠিক মাঝামাঝি আরও এক বা দুগাছা দড়ি বাঁধা হলে পরতালা বাঁধা শেষ হয়।

তারপর শুরু হয় আরও কঠিন কাজ—'গাছলওয়ানো' অর্থাৎ হাতিকে গাছের সঙ্গে বাঁধা। কোন বিঘ্ন না হলে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সে কাজ হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠে। পরতালা বাঁধতে বাঁধতে সেই অতিকায় প্রাণীটা হয়তো একটু এগিয়ে যায়, নয়তো তার মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে বিপদের সামান্য আভাস পেলেই দাইদারের নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে সেই সিঁড়ির কুনকি। কুনকির মাহুতও দাইদারকে যে কোন রকম সাহায্য করার জন্যে সতর্ক হয়ে তৈরি থাকে। তেমন বিপদের মুখে একমাত্র মাহুতের সতর্কতা আর পুরোপুরি শিক্ষিত কুনকির উপরই দাইদারের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

গাছলওয়ানো কাজ শেষ করার আগে ক্ষেত্রবিশেষে সবকিছুই আগাগোড়া আবার নতুন করে করতে হয়। এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি যে, দাইদারের পরিচালনা বিভ্রান্তিতে কোন কোন হাতি আর ধরা পড়েনি। একবার সুসঙ্গের পিলখানায় দশ ফিট দু ইঞ্চি উঁচু এক মর্দা হাতি এসে সাতদিন ছিল। সেখানে অনেক পোষা আর সদ্য ধরা স্ত্রী-হাতির সঙ্গে সে মিলিতও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাইদারের ত্রুটিতে সেই হাতিকে ধরার সব চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। আর একবার আর একটা হাতি ধরতে গিয়ে মাহুত ভুল করে কুনকিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; ফলে সেই দাঁতাল পুরুষ-হাতিটা তাকে দাঁতের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর মাহুতও সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যায়। অতএব পরতালা প্রথায় হাতি ধরার ব্যাপার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছুকাল চলে এবং দর্শকরাও এক অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা নিয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করেন।

কুনকিগুলো যতক্ষণ মর্দা হাতিটাকে চেপে দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ সে বেশ শান্তই থাকে। সুতরাং পরতালা বাঁধতে সাধারণত কোন বাধা হয় না। হাতির পিছনের দুপা জুড়ে পরতালা বাঁধা হলে সেই পরতালার উপর আবার দুটো মোটা এবং লম্বা দড়ি দু পায়েই বাঁধা হয়। তারপর সেই হাতিকে প্রতিরোধ

সক্ষম কোন গাছের সঙ্গে বাঁধা হলে কুনকিগুলো তার দুপাশ থেকে সরে যায় ; অতিকায় প্রাণীটা তখন বুঝতে পারে যে, তার অনভিপ্রেত কিছু ব্যাপার ঘটেছে। কারণ, তার প্রণয়ী ছেড়ে সরে গিয়েছে। সেই কঠিন ধাক্কায় তার ঘোর কেটে যায়। তখন সে ছুটে সঙ্গ নিতে গিয়ে টের পায় যে, সে বন্দী। ভয়ঙ্কর আক্রোশে সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রণয়ীর এহেন অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় তার সেই প্রচণ্ড ক্রোধের রূপ একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানেন। হাতিটা তার গুরুভার দেহের বিপুল শক্তিতে সামনে এগুতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে মনে হয় তার শক্ত বাঁধন বুঝি ছিঁড়ে যাবে, নয়ত গাছটাই সে উপড়ে ফেলবে। সে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু গাছের গোড়াটা নাগাল না পেয়ে একপাশে কাত হয়ে রাগের বশে দাঁত দুটো মাটির গভীরে বসিয়ে দেয়। আবার দাঁড়ায় এবং আর একপাশে আড় হয়ে প্রচণ্ড শব্দে শুঁড় দিয়ে মাটিতে প্রবল আঘাত করতে থাকে। প্রচণ্ড ক্রোধে থেকে থেকে সে চীৎকার করে আর সামনের দু পা দিয়ে মাটি, কাঁকর ছিটিয়ে দেয় কিংবা তার নাগালের মধ্যে গাছের ডালপালা যা পায় তা ভেঙে তছনছ করে। তার বিশাল দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রবল আক্ষেপ কিছুক্ষণ বাদে বাদেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে। কিন্তু তার বাঁধন ছেঁড়ার সব চেষ্টাই বিফল হয়। অবশেষে সে শান্ত হয়। এমন শক্তিশালী প্রাণীর বন্ধন দশা এবং তার মুক্তির বিফল চেষ্টার ছবি বড় মর্মস্পর্শী। তেমন অবস্থায় তার পক্ষে দুটো পথ খোলা থাকে : হয় মৃত্যুবরণ করা নয়তো ভাগ্যের উপর নিজেকে সঁপে দিয়ে অন্য এক জীবন স্বীকার করে নেওয়া। হয়ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৈশিষ্ট্য প্রভাবে সে দ্বিতীয় আদর্শ অর্থাৎ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেয়।

পরতালার উত্তেজনাময় শেষ পর্ব এখনও বাকি। দাইদার এবার দুটো দড়ির ফাঁস নিয়ে হাতির ঘাড়ে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এক একটা ফাঁসের ওজন প্রায় আধমণ থেকে একমণ। কাজটা বেশ কঠিন। মাহুতরা হাতি নিয়ে যখন একাজ করে, তখন দর্শকদের আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা চরমে পেঁছয়! মানুষ আর পোষা প্রাণীর সমবেত সাহস, কৌশল এবং দক্ষতা না দেখলে তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। হাতির গলায় ফাঁস গলানো হলে তার সামনের পা দুটোও আলাদা করে ফাঁসে বাঁধা হয়। সামনের দুপা কিন্তু একসাথে জুড়ে বাঁধা হয় না। হাতির পিছনের পায়ের চেয়ে সামনের পা বাঁধা অপেক্ষাকৃত সহজ। কাছাকাছি তেমন গাছ না থাকলে সদ্য ধরা হাতিকে বাঁধার জন্যে মাটিতে মস্ত মস্ত খুঁটি পুঁততে হয়। এবার পোষা হাতি দিয়ে দড়িগুলো টেনে সেই খুঁটি-গুলোতে বাঁধা হলে বন্দী হাতির সামনে কিছু কলাগাছ ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের দেওয়া এই প্রথম উপহার পেয়ে সে শুঁড় দিয়ে অথবা লাথি মেরে আস্ত এক-একটা কলাগাছ ছুঁড়ে দেয়। এটাও তার বন্দীদশার আর এক প্রতিক্রিয়া। সেই উড়ন্ত কলাগাছের আঘাতে যে কেউ মারাত্মক জখম হতে পারে অথবা প্রাণ হারাতে পারে। কিন্তু আচরণে এত আপত্তি প্রকাশ পেলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই

সেই রসালো খাদ্য খেতে শুরু করে। এটাই আশ্চর্য! দুদিন বন্দী অবস্থায় সে বাঁধা থাকে। পরে পোষা কুনকির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে জল খায় এবং স্নান করে। প্রথম তাকে যখন কোন পাহাড়ী স্রোতস্বিনী বা নদীতে নেওয়া হয়, তখন সে টের পায় যে, তার পিছনের পায়ে সেই জোড় বাঁধন আর নেই। অতএব সেটাই পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। তার বন্ধন মুক্তির সেই উদগ্র চেষ্টা রুখতে গিয়ে মাহুত আর কুনকি হাতিরা প্রাণান্ত পরিশ্রান্ত হয়। বুনো হাতিটা মাঝে মাঝে কুনকি হাতি-গুলোকে এমন করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় যে, তখন নেহাৎ দৈবক্রমেই তারা কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। কয়েকবার এভাবে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারে যে, তার বন্দীদশা আর ঘুচবার নয়। এক সপ্তাহ পরে তার শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং তিন মাসের মধ্যে মানুষের হুকুম মেনে কাজ করে।

পরতালা প্রথায় হাতি ধরার কথা মোটামুটি বিস্তৃত আকারে বলা হলো। কারণ, পূর্ববঙ্গে খেদার বাইরেও এভাবে হাতি ধরা হয়েছে। এমন ঘটনাও জানি যে, মা-হাতি খেদায় আটকা পড়েনি, বাইরে রয়ে গিয়েছে, অথচ তার বাচ্চা অন্য হাতিদের সঙ্গে খেদায় ঢুকে পড়েছে। মা-হাতি তখন পরতালা রীতিতে খেদা-বেড়াজালের বাইরেই ধরা পড়েছে। অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত বিরল। পুরো মস্তি হয়নি অথচ সবে কাঠমস্তি হয়েছে এমন দলছাড়া মর্দা হাতিও পরতালায় ধরা যায়। কিন্তু কুনকি হাতির ঘাড়ে বসে থাকা মাহুতের গন্ধ সে যাতে না পায় সেই সতর্কতা নিতে হয়; তা না হলে সে ভয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু মর্দা হাতিটা যদি কুনকির প্রলোভনে পড়ে তবে সে ধরা পড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ববঙ্গের (শ্রীহট্ট সহ) মাহুত আর দাইদাররা এ কাজে বিশেষ দক্ষ। শুনেছি নেপালীদের মধ্যেও পরতালা রীতির প্রচলন আছে।

এবার 'ফাঁদ' প্রথা প্রসঙ্গে আসা যাক। এই পদ্ধতিতে সাধারণত কুনকির চেয়ে ছোট আকারের এক একটা হাতি ধরা হয়। আসামে এই প্রথা 'মেলা-শিকার' এবং অন্যত্র 'ফান্দি শিকার' নামেও পরিচিত। ফান্দি হিসাবে অসমীয়ারা অত্যন্ত সুপটু আর তাদের কুনকিগুলোও খুব সুশিক্ষিত।

ফাঁদ দেওয়ার কাজ মর্দা হাতি দিয়েও করা যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর হাতি দিয়ে বুনো হাতি ধরা হয়। পোষা হাতিরা কুনকি নামে পরিচিত। ফাঁসগুলো পাটের দড়িতে বিশেষভাবে তৈরি হয়। বারো থেকে পনেরো সের ওজনের এক-একটা দড়ি কুনকির কোমরে বৃত্তাকারে জড়িয়ে বাঁধা থাকে।

ফান্দির এক-একটা দলে সাধারণত দুটো করে হাতি থাকে। প্রত্যেক হাতির ঘাড়ে একজন ফান্দি মাহুত আর তার পিছনে হাতির পিঠে একজন সহযোগী বসে থাকে। যে হাতিটাকে ধরা হবে ফান্দি তার কুনকিকে সেদিকে চালিয়ে নিয়ে যায় আর মাহুতের সহযোগী ছোট একটা জাঠার গুঁতো দিয়ে দিয়ে কুনকিকে তার নাগাল ধরাবার চেষ্টা করে। কুনকি দুটো বুনো হাতির

দলে ঢুকে সেই নির্দিষ্ট হাতিটার কাছাকাছি গেলেই ফান্দি সুযোগ বুঝে ফাঁসটা তার মাথার উপর ছুঁড়ে দেয়। ঠিক তখনই বুনো হাতিটা তার শুঁড় গুটিয়ে নেয় আর ফাঁসটাও সহজেই তার গলায় আটকে যায়। দ্বিতীয় ফান্দিও তেমনি করে আর-একটা ফাঁস ছুঁড়ে তার গলায় আটকিয়ে ফেলে। হাতির গলায় ফাঁস পড়লেই ফান্দিরা চটপট ফাঁসের গোড়া সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়; না হলে টানাটানিতে গলায় ফাঁস আটকে হাতিটা মারা পড়বে। বিপদের আভাস পেয়েই হাতিটা ছুটে পালাতে যায়। প্রতিকূল অবস্থায় সে এক জীবন-মৃত্যুর লড়াই। মাঝে মাঝে এর পরিণাম মারাত্মক হলেও প্রকৃতপক্ষে কুড়িটি ক্ষেত্রে মাত্র একটাই দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। ফান্দি শিকারের রোমাঞ্চ ফান্দিদের মতো কুনকিগুলোও উপভোগ করে। এ রীতিতে হাতি ধরা যতদিন সরকারীভাবে নিষিদ্ধ না হয়, ততদিন আসামে দক্ষ ফান্দির অভাব হবে না। ফান্দি আর কুনকিদের কর্মকৌশল দেখে জীবনের রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো উপভোগ করা যায়।

সবচেয়ে প্রাণবন্ত শিকার অর্থাৎ খেদার বেড়াজালে ফেলে বুনো হাতির একটা দলকে ধরার যে পরিকল্পনা মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কার্যকরী করেছে এবার সে কথা বলছি। সমস্ত খেদায় যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা হচ্ছে—

১। মানুষের সাহায্যে বুনো হাতির একটা দলকে ঘিরে ফেলা হয়।

২। আড়াআড়ি এবং খাড়াখাড়িভাবে খুঁটি পুঁতে তাতে বাইরে থেকে ঠেকান দিয়ে বৃত্তাকার বা বহুভুজ এক অবরোধ বেষ্টনী তৈরি করা হয় এবং যে হাতির দল ঘেরা হবে তার প্রধান পথ বা গড়মলমেই সেই বেষ্টনীর প্রবেশদ্বার থাকে।

৩। খেদায় আটকে পড়া হাতিগুলোকে কুনকির সাহায্যে বেঁধে একে একে বাইরে আনা হয়।

খেদা বেষ্টনীর আয়তন এবং আকৃতিতে পার্থক্য আছে। খেদাবৃত্তের ব্যাস কুড়ি থেকে একশ ফিট পর্যন্ত হতে পারে। কোন কোন খেদার প্রবেশপথ বাদ দিয়ে বেষ্টনী বরাবর ভিতর দিকে ছ'ফিট চওড়া আর চার-পাঁচ ফিট গভীর পরিখা কাটা হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে খেদার মধ্যে কিংবা বাইরে 'রুমঘর' নামে আর একটা বেষ্টনী তৈরি করতে দেখা যায়। আসামে এবং পূর্ববঙ্গে খেদার প্রবেশপথে দুপাশে 'ফানেল' বা ইংরেজি 'ভি' বর্ণের সম্প্রসারিত বেড়া তৈরি হয়।

বুনো হাতির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র, পরিবেশ এবং তার স্বভাব বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে হাতি ধরবার পন্থা ক্রমে উন্নত পর্যায়ে 'খেদা' পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। হাতির মতো বৃহত্তম এবং শক্তিশালী এক স্থলচর বন্য প্রাণীকে ধরার জন্য উদ্ভাবিত কৌশল শুধু যে সাহস ও রোমাঞ্চ জাগায় তাই নয়, এর মাধ্যমে বনবিভাগের এক নির্ভরযোগ্য আয়ের পথও তৈরি হয়েছে এবং এতে ভারতীয়দের অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

ভারতের যে যে অরণ্যভূমি হাতির বিচরণক্ষেত্র, বিভিন্ন ঋতুতে সেখানে তার

উপযোগী খাদ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বিশেষ কোন ঋতুতে হাতির দল পছন্দমতো খাদ্যের সন্ধানে কোথায় যায় অভিজ্ঞ মানুষ তা জানে। তাই বনাঞ্চলে কোথায় হাতি আছে এবং খেদার আশেপাশে তারা কখন 'নোনা মাটি' খেতে আসে সে খবর খেদায় হাতি ধরায় দক্ষ অসমীয়ারা প্রায় নির্ভুলভাবে বলতে পারে। গারো এবং খাসিয়া পাহাড়ে বিশেষ অরণ্যাঞ্চল থেকে কোন হাতির দল যে স্থানান্তরে যাবে না সেটা আমার জানা সুসঙ্গের কিছু অভিজ্ঞ লোকও বলতে পারতেন।

আগে সুসঙ্গ থেকে গারো পাহাড়ে খেদা পরিচালনা করতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় সাড়ে তিনশ থেকে সাড়ে পাঁচশ লোক এবং বারো থেকে চব্বিশটা শিক্ষিত হাতি লাগত। মানুষ এবং হাতির প্রকাণ্ড দল, রসদ আর আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ছোট-খাটো এক যুদ্ধ পরিচালনার মতোই খেদার কাজ প্রায় বিরামহীনভাবে ছ-মাস ধরে চলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার এবং প্রাক্তন দেশীয় রাজন্যবর্গের সব খেদাই সামরিক বিভাগের পরিচালনায় হয়েছে। খেদা কার্তিক মাস থেকে শুরু করে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত হতো।

প্রাথমিক পর্যায়ে খেদার সমস্ত ব্যবস্থা নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায়। তখন 'পাঞ্জালি' বা 'খুঁজি'রা দু দলে ভাগ হয়ে হাতির চলাফেরা সম্বন্ধে সঠিক খবর আনতে যায়। কুনকির সংখ্যা বারোটা বা তিরিশটা হলে যথাক্রমে তিরিশ বা পঞ্চাশটা বুনো হাতির এক একটা দলের সন্ধান করতে হয়। খেদার অনুকূলে কোন স্থানে হাতির দল চলে এলেই পাঞ্জালিরা অবিলম্বে জমাদারকে সে সংবাদ জানায়। জমাদার তার লোকবল নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় কোন এক জায়গায় তৈরি হয়ে থাকে।

ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ফসল কাটা হয়ে যায়। হাতির প্রধান দল তখন সাধারণত ছোট ছোট জোটে ভাগ হয়ে পড়ে। সেটাই খেদার উপযুক্ত সময়। দলে হাতির সংখ্যা বেশী হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু দল ছোট হলে আর্থিক লাভ নাও হতে পারে। হাতির বড় দল ধরা পড়লে যেগুলোর বাজারে চাহিদার সম্ভাবনা নেই সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। খেদার আনুপূর্বিক ব্যয় বেশী হলে আর্থিক দিক বিবেচনা করে প্রথমবারের মতো অন্তত ষাটটা বিক্রয়যোগ্য হাতি ধরার চেষ্টা করা উচিত। তাতে অবশ্যই লাভ হবে। প্রধান পরিচালকের সাংগঠনিক যোগ্যতার উপর খেদার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। স্থানীয় অনুকূল পরিবেশের সুযোগে উপযুক্ত সময়ে খেদা করলে আনুষঙ্গিক ব্যয় সীমিত রাখা যায়। খেদায় ধরা হাতি বিক্রির ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ, তার উপর চূড়ান্ত আর্থিক লাভ নির্ভর করে।

পাঞ্জালিদের খবর অনুসারে প্রধান সর্দার তার দলবল নিয়ে হাতির সম্ভাব্য চারণভূমির মাইলখানেকের মধ্যে চলে যায়। তারা দিন দশেকের খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যায়। খেদা শুরু হয় সেদিন সন্ধ্যায় নয়তো পরদিন ভোরে।

হাতির দলকে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার আগে পাঞ্জালিদের সংবাদ সম্বন্ধে খেদা-পরিচালককে কিছু তথ্য জানতে হয়।

(১) দলে কত হাতি আছে? তাদের শ্রেণীবিন্যাস যথাযথভাবে হয়েছে কিনা? বড় দাঁতাল কিংবা মক্‌না আছে কি?

(২) কুনকি হাতিগুলো সেই বনে সহজে যেতে পারবে কিনা?

(৩) সেখানে বুনো হাতিগুলো তিন সপ্তাহ যথেষ্ট খাবার আর জল পাবে কিনা?

(৪) সেটা খেদা তৈরির উপযুক্ত জায়গা কিনা? কারণ, পাথুরে জায়গা হলে খেদা তৈরির পক্ষে সে স্থান অনুপযুক্ত।

(৫) খেদা তৈরির জন্যে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে গাছ পাওয়া যাবে কিনা?

(৬) খেদায় ধরা হাতিগুলোকে আশেপাশে কোন নদী অথবা পার্বত্য স্রোতস্বিনীতে সহজে নিয়ে যাওয়া এবং পিলখানায় ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা?

পাঞ্জালিদের তথ্য ভুল হলে ফল খারাপ হতে পারে।

পরদিন সকালে ব্যবস্থামতো জমাদার তার লোকবল নিয়ে খেদার জায়গায় চলে যায় এবং তার সহকর্মীর অধীনে যথাক্রমে তাদের দুদলে ভাগ করে নেয়। প্রত্যেক দলেই একজন পাঞ্জালি থাকে। অভিজ্ঞ পাঞ্জালিদের পরামর্শ অনুসারে তারা ক্রমে হাতির দলকে ঘিরতে আরম্ভ করে। দুজন করে 'পুঁজি' বা প্রহরী পঞ্চাশ থেকে একশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সেই প্রহরা-বেষ্টনী সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং দুজন সর্দারের মধ্যে আবার দেখা হয়। অতঃপর এক পুঁজি থেকে আর এক পুঁজির মধ্যবর্তী জায়গা ক্রমে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। তাতে এই অবরোধ সীমা বরাবর প্রায় বারো থেকে পনেরো ফিট চওড়া এক রাস্তা তৈরি হয়ে যায় এবং তার সীমানা জুড়ে পুরোটাই বাঁশের খুঁটি পুঁতে এক বেড়াও তৈরি হয়। ফলে অবরোধ থেকে কোন হাতি পালিয়ে গেলে সহজেই টের পাওয়া যায়।

এদিকে সূর্যাস্তের আগে পুঁজিরা প্রত্যেকে এক-একটা ছাউনি বানিয়ে দিনরাত আগুন জেবলে রাখার উদ্দেশ্যে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে। তাছাড়া ধারে কাছে ঘাতসহ কোন বড় গাছে একটা মইও বেঁধে রাখা হয়। কারণ, কোন ক্ষিপ্ত হাতির আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে তারা সেই মই বেয়ে চটপট গাছে উঠে পড়ে।

সূর্যাস্তের সময় পুঁজিরা যার যার আস্তানার সামনে প্রস্তুত করে রাখা শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়; অবরোধ বেষ্টনী ঘিরে সেই আগুনের কুণ্ডগুলো দূরে থেকে আলোর মালা বলে মনে হয়। এদিকে কোন হাতির তীব্র শঙ্খনাদ, শাবকের বিহ্বল ধ্বনি, উত্তেজিত মায়ের 'গুড়' 'গুড়' ডাক, খেয়ালী হস্তি যুবকের গাছ ভাঙার শব্দ, শম্বর কিংবা বাঁকিং (হগ্‌রা) হরিণের সচকিত আওয়াজে

সেখানকার নিস্তব্ধতা থেকে থেকে ভেঙে যায়। সে যেন দেয়ালী উৎসবের রাত! অবরোধের চারপাশে পাঁজিদের মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেউ কেউ বাঁশ, বেতের জিনিস তৈরি করে, বাঁশের বাঁশি বানিয়ে বাজায়। তাদের সতর্ক পাহারার মধ্যেও তারা মাঝে মাঝে খোশমেজাজী গল্পে বা হাসিঠাট্টায় মেতে উঠে, অবশ্য সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তারা খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে। জমাদারের কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁজিকে সারারাত জেগে সতর্কভাবে পাহারা দিতে হয়।

অরণ্যে হাতির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রে বাইরের মানুষ যখন অবাঞ্ছিতভাবে প্রবেশ করে, তখন স্ত্রী বা পুরুষ দলপতির নেতৃত্বে হাতির দল সাধারণত জোট বেঁধে একসঙ্গে জড়ো হয়। কিন্তু অবরোধের মধ্যে আটকা পড়া হাতিগুলো সন্ধ্যার সময় আর শেষ রাতে চঞ্চল হয়ে উঠে। কারণ, তখন সাধারণত তারা চড়ে খাবার খায়। তাই তারা সচল হয়ে সেই বেষ্টনীর ভঙ্গুর স্থানগুলো খোঁজে এবং সুযোগমতো বেষ্টনী ভেঙে বারবার বাইরে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ, অবরোধ সীমার মধ্যে তাদের আটকে রাখার পক্ষে হয়ত কিছুটা জোরালো আওয়াজ, নয়তো বাঁশের খটখটির শব্দ অথবা একটু উসকে দেওয়া অগ্নিকুণ্ডই যথেষ্ট। ব্যতিক্রম হিসাবে দলভ্রষ্ট মর্দা হাতি অবাঞ্ছিতভাবে গুরুতর উৎকণ্ঠা বা অমূলক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সামলে রাখা প্রায়ই বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য সেখানে যতদিন যথেষ্ট খাবার আর জল থাকে, ততদিন হস্তিযূথ পরিবেষ্টিত অবস্থাতেও স্বাভাবিকভাবেই থাকে। তারা অকারণে উত্তেজিত হয় না। পাঁজিরা যে বিপদের হেতু সেটা হাতিরা বুঝতে পারে ; তাই তারা নিরাপদ দূরত্বেই থাকে।

সর্দার আর সহকর্মীরা প্রত্যেকে পালা করে সারারাত জাগে আর পাঁজিদের পাহারা ঠিকভাবে চলছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। কারণ, কোন ত্রুটির জন্যে তারাই দায়ী হয়। রাত্রে পাহারার কাজ ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা জানার উদ্দেশ্যে জমাদার এক পদ্ধতি আশ্রয় করে থাকে। ব্যাপারটা এই রকম—প্রধান সর্দারের কাছ থেকে দুটো ছড়ি যথাসময়ে নিয়মমতো সেই বেষ্টনীর চারপাশ ঘুরে আবার তার হাতে ফিরে আসে। এতে কোন ত্রুটি হলে দোষীকে সহজে ধরা যায় এবং তার শাস্তিও হয়।

শীতকালে বিকেলবেলা থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি এবং শেষ রাত থেকে সকালে প্রায় নটা-দশটা পর্যন্ত হাতিরা খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। বাকি সময়টা তারা বিশ্রামের জন্যে ঘন অরণ্যের ছায়ায় চলে যায়। কিন্তু সে অরণ্য তখন এতই নিস্তব্ধ হয়ে থাকে যে, দেখে মনেও হয় না সেখানে একদল হাতি আছে। অবশ্য হাতির বাচ্চারা দিনে বা রাতে মানুষের ছোট শিশুর মতোই যখন তখন ডাকাডাকি করে। তাতেই সে অরণ্যে হাতির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

পরদিন সর্দাররা সকালেই খাওয়া-দাওয়া সেরে পাঁজি থেকে বাছাই করা কিছু

লোক নিয়ে জমাদারের ছাউনির সামনে এসে জড়ো হয়। তাদের সঙ্গে খেদা তৈরির কাজে আবশ্যক সবরকম হাতিয়ার থাকে। ইতিমধ্যে জমাদার সমস্ত অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখে নেয় এবং হাতি চলাচলের প্রধান পথ বা গড়ুমলমের মধ্যে খেদার আশেপাশের কিছুটা জায়গা এমন সুকৌশলে নির্বাচন করে যে, বুনো হাতির গোটা দলটাই সেদিক দিয়ে সহজেই পালাবার নিশ্চিত চেষ্টা করে। উপযুক্ত স্থানে যথাযথভাবে ফটক তৈরির উপর খেদার সাফল্য নির্ভর করে।

নির্বাচিত স্থানে খেদাবৃত্তের মধ্যে বন এবং গাছপালা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে তার কিছু কিছু কেটে পরিষ্কার করা হয় এবং প্রত্যেক সর্দার খেদা-বেষ্টনী তৈরির কাজ ভাগ করে নেয়। প্রবেশপথের প্রধান দরজাটা একজন সুদক্ষ সর্দার আর তার লোকজন জমাদারের তত্ত্বাবধানে তৈরি করে। খেদার কাজ এভাবেই শুরু হয়। কেউ গর্ত খোঁড়ে, কেউ গাছ কাটে, কেউ কাটা গাছ পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে ক্রমে খেদার জায়গায় নিয়ে আসে। নিয়ম অনুসারে কোন সোরগোল না করেই কাজ করা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এই বৃহৎ ও জটিল কর্মকাণ্ডে সোরগোল হয়। তবু হাতিগুলো এর মধ্যেই নির্জন বনের ছায়ায় থাকে। খেদার দরজাটা অত্যন্ত ভারী। সেটা ঝোলাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো খুঁটি লাগে। সেগুলোকে বলে 'রাজ খাম্বা'। মস্ত আর ভারী সেই দুটো খুঁটি বড় বড় গর্তের মধ্যে ঠিক করে বসাতে পঞ্চাশ ষাটজন লোকের প্রায় দেড়দিন লাগে। তারপর প্রবেশমুখ থেকে ইংরেজি 'ভি' বর্ণের আকৃতিতে দুপাশে দুটো 'আন্নী' বা বাহু খুঁটি পুঁতে তৈরি হয়। সম্প্রসারিত আন্নীসমেত খেদাবেষ্টনী সম্পূর্ণ হতে ছ-সাত দিন লাগে। হাতির মতো শক্তিশালী প্রাণীর প্রাণপণ আঘাত থেকে সেই বেষ্টনীকে বাঁচাতে হলে বাইরে থেকে আরও মজবুত খুঁটির ঠেকান দিতে হয়। এই ঠেকান লাগানো এবং সেগুলো লম্বা লম্বা কাঠে সমান্তরালে আটকানোর পরিকল্পনা অত্যন্ত কৌশলে করা হয়। মোটের উপর এই সর্ববৃহৎ স্থলচর প্রাণীদের আটকে রাখার জন্যে এ ধরনের বন্দীশালা যে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তৈরি করতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। প্রবেশমুখের দরজা থেকে দু পাশে কুড়ি ফিট পর্যন্ত বাহু দুটোর মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি আবশ্যক হলে তার মধ্যে শক্ত খুঁটি বসিয়ে তাকে এক প্রকোষ্ঠে পরিণত করা হয়। দরজা তৈরি হলে দেখে মনে হয় যেন সেটা শুধু দড়ি দিয়ে বানানো। এবার সেটা মোটা বেত বা ম্যানিলা দড়ির সাহায্যে কপিকলে ঝুলিয়ে সহজে তোলা বা ফেলার প্রক্রিয়া ঠিক করে পরীক্ষা করা হয়। খেদা তৈরির শেষ কাজ হচ্ছে কিছু বনজঙ্গল পরিষ্কার করে প্রবেশপথের দুই বাহুর মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটা এবং কিছু দূরে আর একটা পথ তৈরি করা। সেই পথের জায়গায় জায়গায় কাঠের স্তূপ প্রস্তুত রাখা হয়। হাতির দল তাড়া খেয়ে এই পথে যখন খেদাবেষ্টনীর মুখে ছুটে যায়, তখন দুপাশে আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোক সেই স্তূপগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ভয় পেয়ে হাতিরা একেবারে খেদার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

পরদিন ভোরে পুঁজির এক একজনকে ঠিক জায়গায় রেখে প্রত্যেক সর্দার তার অধীন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে খেদার কাছে জড়ো হয়। সকলের মধ্যেই তখন দেখা যায় প্রবল উদ্দীপনা ; তাছাড়া বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যারা একাজে নতুন ভর্তি হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তারা এলে জমাদার খেদার মধ্যে 'বাগিচা' বা বনটাকে ডালপালা দিয়ে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিকভাবে সাজিয়ে ফেলে। তখন আশেপাশের বন থেকে খেদায় ঘেরা জায়গাটা আলাদা করে প্রায় বোঝা যায় না। স্থানে স্থানে কিছু তুবড়িও লুকিয়ে রাখা হয়। হাতিরা যখন ছুটে আসে তখন পিছন থেকে সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হাতিগুলো আরও বিভ্রান্ত হয়ে ঠিক খেদার মুখেই ছুটে যায়।

প্রস্তুতি ব্যবস্থার শেষ পর্যায় সমাপ্ত হলেই গুলানেওয়ালারা বা খেদাড়ুরা নির্দেশক্রমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাতির ছোট ছোট দলগুলোকে তাড়া দিয়ে একত্র করে এবং গড়মলম বরাবর তাদের খেদাবৃত্তের দিকে যেতে বাধ্য করে। তখন খেদাড়ুদের শরীরে একমাত্র কপনি ছাড়া আর কোন পরিচ্ছদ থাকে না। তাছাড়া সবার হাতেই থাকে একটা 'দা' অথবা 'মোংরেং' (গারোদের কুড়ুল), কারো কোমরে ঝোলে বাঁশের খট্‌খটি। প্রত্যেক দলে একজন লোক বন্দুক নিয়ে যায়। যথেষ্ট পরিমাণে ছিটে গুলি বা ফাঁকা আওয়াজ করার জন্যে কার্তুজ তার সঙ্গে থাকে। অবশ্য গুরুতর কোন বিপদ না ঘটলে সে গুলি ছুঁড়তে পারে না।

হাতির দল পরিকল্পনামতো গড়মলমের দিকে যেতে আরম্ভ করে। গুলানেওয়ালারাও একত্র হয় এবং বন্দুকের ফাঁকা শব্দে অবশিষ্ট লোকদের সংকেত দিয়ে তাদের তৈরি হতে বলে। জমাদার এর মধ্যেই তার পছন্দমতো সাহসী লোকদের পূর্ববর্ণিত আন্নী দুটির সামনে পরিষ্কার করা জায়গায় যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। এক এক সারিতে কুড়িজন থেকে ত্রিশজন 'তুড়ি রক্ষক' দাঁড়িয়ে যায়। দু সারির সামনে যে সর্দাররা থাকে, বলা বাহুল্য, তাদের নিঃসংশয় মনোবল, সাহস ও খেদার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আর মাঝামাঝি স্থানের সর্দারদেরও প্রায় তাদের মতোই অভিজ্ঞ ও সাহসী হতে হয়। তাছাড়া শেষপ্রান্তে যে দুজন সর্দার দাঁড়ায় তাদেরও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এদের হাতে বন্দুক এবং ফাঁকা আওয়াজ করার মতো গুলিও থাকে। উপরন্তু আকস্মিক বিপদ এড়াবার জন্যে কিছু ছিটে গুলিও তারা সঙ্গে রাখে। এবার ঝোপের আড়ালে আড়ালে তৈরি করে রাখা কাঠের স্তূপগুলো কেরোসিন তেল ঢেলে ভিজিয়ে রাখা হয়।

হাতির দল ক্রমে পরিবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়তেই তুড়ির মুখের সর্দাররা লোকজন নিয়ে দুদিক থেকেই তাদের ঘিরতে থাকে। হাতিগুলো তখন হতবুদ্ধি হয়ে তীব্র শঙ্খনাদ করতে করতে সামনের সব বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায়। এদিকে তুবড়ির চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক, বন্দুকের ফাঁকা শব্দ আর কাঠের স্তূপে ধরানো আগুনের হলকায় হাতিগুলো হকচকিয়ে একেবারে খেদার মধ্যে ঢুকে

পড়ে আর তখনই ঝোলানো সেই ভারী দরজাটা ফেলে তাদের বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যেই সর্দার তার সহকর্মীদের নিয়ে আত্মগোপন করে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এবার তারা ছুটে এসে দড়ি দিয়ে সেটা আরও মজবুত করে বেঁধে ফেলে। অন্যান্য লোকজন ততক্ষণে খেদাবেষ্টনীর বাইরে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের হাতে থাকে সরু আর লম্বা বাঁশের প্রান্তে লোহার সুতীক্ষ্ম ফলাযুক্ত এক একটা 'জাঠা'। বন্দী হাতির দল ক্ষিপ্ত হয়ে যখন সেই অবরোধ ভাঙতে চেষ্টা করে, তখন তারা সেই জাঠা দিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়।

খেদার প্রবেশপথে আন্নীর দুপাশ থেকে গুলানেওয়ালা অর্থাৎ খেদাড়ু দল যখন বুনো হাতির দলটাকে ঘিরে ফেলে তখন প্রয়োজনে তাদের কিছু কুনকি দিয়ে সাহায্য করা হয়। সে উদ্দেশ্যে কুনকিদের আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়। এগুলো বাছাই করা কুনকি। যে কোন বিপর্যয়ে বা প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও তারা অবিচল থেকে মাহুতের নির্দেশে কাজ করে। অন্যান্য কুনকিগুলো নিরাপদ দূরত্বে থাকে। বুনো হাতি খেদায় আটকা পড়লে তাদের কাজ শুরু হয়।

আটকা পড়া হাতিরা প্রথমদিকে খেদা ভেঙে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। ক্রমে তাদের সে প্রয়াসে ভাঁটা পড়ে। তখন তারা সাধারণত একত্রে জড়ো হয়ে খেদার মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চাদের নিয়ে মা হাতিরা একেবারে দলের মাঝখানে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যেই যুবাবয়সের দুঃসাহসী এক একটা হাতি হয়ত পায়ের আঘাতে নুড়ি পাথর আর মাটি ছিটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কান মেলে, শুঁড় গুটিয়ে বেষ্টনীর দিকে এগিয়ে যায়; কিন্তু রক্ষীদের জাঠার খোঁচা খেয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এক ফাঁকে সে হয়ত শুঁড় দিয়ে রক্ষীর হাতের জাঠাটাও ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দুমড়ে ভেঙে ফেলে। এভাবে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির সংখ্যা গোণা বেশ শক্ত কাজ। ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মোটামুটি শান্ত অবস্থাতেই থাকে। কোন কোন হাতি তার দেহের মধ্যে সঞ্চিত জল শুঁড় দিয়ে বের করে ছিটায় কিংবা শরীরে মাটিও ছিটিয়ে দেয়।

খেদায় বন্দী হাতির দলে মাঝে মাঝে এমন হাতিও থাকে যাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সারারাত ধরে তাদের মারমুখী আক্রমণ ঠেকিয়ে খেদাকে যদি বাঁচানো সম্ভব না হয় তবে রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি তাদের বেঁধে ফেলতে হয়। তেমন তেমন অবস্থায় যুথপতির সঙ্গে সেই অবাধ্য ক্ষিপ্ত হাতিদের রাত্রেই পরতালায় গাছের সঙ্গে বাঁধতে হয়। এখানে হাতি খেদার অতি সুন্দর এক লিপিবদ্ধ বিবরণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"প্রাণীর তীক্ষ্ম বোধশক্তি এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রাণবন্ত সহযোগিতা এবং মৈত্রীবন্ধন খেদাদৃশ্যের মাধ্যমে যেভাবে আমাদের চোখে পড়ে প্রকৃতির রাজ্যে তার তুলনা নেই। এমনকি শিকারের উদ্দেশে বিশাল দেহ তিমির পিছে মারমুখী হয়ে

ধাওয়া করার দৃশ্যেও পশুশক্তির উপর মানুষের সার্বিক প্রভুত্বের সেই ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না।" এবার সে দৃশ্যই আমরা দেখব।

পরতালায় হাতি ধরার রীতিতে দশটা কুনকি এবার খেদার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বড় দাঁতাল এবং পুরুষ হাতি আয়ত্বে আনার পরীক্ষায় যে কুনকিরা উত্তীর্ণ হয়েছে সেরকম দুটো কুনকির ঘাড়ে বসে দাইদার আর তার সহযোগীও যায়। কুনকিগুলো প্রথমে দুটো, পরে তিনটে, তারপরে চারটে এইভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে সেই দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সবশেষে দুজন মাহুত সিঁড়ির কুনকিটা নিয়ে যায়। পরতালা বাঁধার কাজ শুরু হলে সেই দুই মাহুত দাইদারদের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে। হাতিগুলো জায়গামতো ঠিক হয়ে দাঁড়ালে একটা প্রতিরূপক তৈরি হয়ে আন্নীর অন্তর্বর্তী অংশও মূল খেদার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তখন দরজাটা তোলা হয়। এর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বন্দী হাতিরা বিহ্বল হয়ে কান মেলে, শুঁড় গুটিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। কোন কোন দলপতি আক্রমণ করতেও ছুটে আসে। সেই বিপর্যয়ের মুখে তখন অবাধে জাঠার ব্যবহার করে তাকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়। অবশ্য দলপতির এমন আচরণ খুবই বিরল। কুনকিরা পিছিয়ে দরজার কাছে গেলে দলপতির সঙ্গে কিছু হাতি শুঁড় মেলে তাদের জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে ঘ্রাণ নেয়। এ ব্যাপারে দলপতির সাহস থাকলেও তার সঙ্গীদের মধ্যে কিন্তু কিছু দ্বিধার ভাব দেখা যায়। একাজ অর্থাৎ মাহুতের ভাষায় 'কুনকি ভিড়ানো' নির্বিঘ্নে হয়ে গেলে তাদের পরতালায় বাঁধা সহজ হয়। দরজা ফেলে প্রবেশমুখ আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। দাইদাররা এবার চটপট সিঁড়ির কুনকিতে উঠে পড়ে। আর মাহুতরাও তাদের জায়গামতো বসে কুনকিদের সামলায় এবং নির্দিষ্ট কাজে লাগায়। পোষা হাতির দল ততক্ষণে দলপতিকে পৃথক করে ঘিরে ফেলে এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পরতালায় সে বন্দী হয়। এভাবেই অবাধ্য হাতিগুলো একের পর এক বাঁধা পড়ে। ফলে খেদার মধ্যে অবস্থা বেশ নিরাপদ হয় আর তাকে আয়ত্বে রাখা সহজ হয়। তাই বাকী হাতি-গুলো পরদিন সকাল পর্যন্ত মুক্ত অবস্থাতেই থাকে।

বুনো হাতির দলে মাঝে মাঝে কিছু দুষ্ট স্বভাবের হাতিও দেখা যায়। তারা হঠাৎ এসে কোন কোন বন্দী হাতির ল্যাজের ডগা কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। হাতিগুলো বাঁধার সময় সাধারণত অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। ফলে সেই হাতিগুলো শ্রীহীন হয়ে যায়। দুর্বৃত্ত হাতির এই ধর্ষকামমূলক আনন্দ বিস্ময়কর! মাঝে মাঝে বিশেষ কোন স্ত্রী বা পুরুষ হাতি দলের পক্ষে অবাঞ্ছিত হয়ে যায়। তাই দলের সব হাতি অথবা বিশেষ কোন হাতি তার প্রতি বৈরী মনোভাব দেখায়। মনে পড়ছে কোথাও পড়েছি যে, দলভ্রষ্ট কোন হাতি অন্য কোন দলের কাছে অপরিচিত এবং অনধিকার প্রবেশকারী আগন্তুক হিসাবে গণ্য হয়। খেদায় অবরুদ্ধ হাতির দলে এমন হাতিও থাকতে পারে।

অবাধ্য হাতিরা বাঁধা পড়লে কুনকিগুলো খেদার বাইরে চলে আসে। সেরাত্রে

তারা খেদার কাছাকাছি কোথাও বিশ্রাম করে। তাদের খাবার সেখানে আগেই প্রস্তুত থাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাদের কোন পাহাড়ী ঝর্ণা বা জলের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা তৃপ্তি করে জল খায়; অনেকে ক্লান্তি দূর করতে শরীরে জল ছিটিয়ে দেয়। তারা আবার ফিরে আসে, উপভোগ করে খাবার খায় আর বিশ্রাম করে।

খেদার চারদিকেই কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। কারণ, একগুঁয়ে কোন কোন যুবক হাতি পালাবার চেষ্টা করতে পারে। এ আশঙ্কা থাকে; তাই পাঁজিরা খেদারক্ষার জন্যে তৎপর হয়ে পাহারা দেয়। খেদা ঘিরে সেই অগ্নিকুণ্ডের ভয়ে প্রাপ্তবয়েসের কোন পুরুষ হাতি হঠাৎ এসে কুনকিগুলোর কোনও অনিষ্ট করতে পারে না। সে রাতের পরিবেশটা যেন এক কাল্পনিক বিস্ময়ের রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

খেদা-বন্দী হাতিদের বিচিত্র আওয়াজ চারদিকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীরা, যারা খেদার বাইরে রয়েছে, তারাও শঙ্খনাদ অথবা গুড় গুড় ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর দেয়। মাঝে মাঝে পোষা কুনকিগুলোও সেই বিচিত্র ঐকতানে যোগ দেয়। মাচায় নিরাপদে বসে যে দর্শকরা সারারাত এই দৃশ্য উপভোগ করেন তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান!

সেরাত্রি এভাবেই কাটে। পরদিন ভোরে মাহুতরা আবার তৈরি হয়ে খেদার মধ্যে গিয়ে বড় বড় হাতিগুলোকে ধরে গাছের সঙ্গে বাঁধে। দুগ্ধপোষ্য শাবকরা মায়ের সঙ্গেই থাকে। তাই তাদের আর বাঁধার প্রয়োজন হয় না। মায়ের বন্দীদশাতে বাচ্চাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা শুধু কৌতুকের ব্যাপার না হয়ে মাঝ মাঝে বড় মর্মস্পর্শীও হয়। বন্দীদশার অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে মা হাতি স্তন্যপানেচ্ছু শাবকদের ঠেলা দিয়ে দূরে সরাতে চেষ্টা করে। নাছোড়-বান্দা বাচ্চাদের শুঁড় দিয়ে আঘাত করে ধাক্কা দেয় কিংবা সামনের পায়ের নরম পাতা দিয়ে লাথিও মারে। কোন কোন মায়ের অসাধারণ সন্তানবাৎসল্য দেখা যায়। তারা আপন শাবকদের মতো অন্য মায়ের শাবককেও আদর করে।

তার পরদিন মাহুতরা খেদায় গিয়ে আবার 'ফান্দি' রীতিতে যুবাবয়সের হাতিগুলোকে ধরে। সে কাজ অনেক সহজে হয়। কারণ, বড় বড় দুটো কুনকি নিয়ে দুপাশ থেকে ফাঁস দিয়ে সেগুলো ধরা হয়। এবার এক-একটা কুনকির সঙ্গে দুটো করে ছোট আকারের হাতি বেঁধে আগে তাদের খেদার বাইরে আনা হয়। ধারেকাছে কোথাও জল দেখলে তারা তখন তৃষ্ণা মেটাতে অথবা গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যায়। এতে তাদের কোন বাধা দেওয়া হয় না। পরে তাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে কিছু কলাগাছ খেতে দেওয়া হয়। এভাবে সন্ধ্যার আগেই যতগুলো হাতিকে সম্ভব বাইরে এনে গাছে বাঁধা হয়। বড় আকারের হাতিগুলো কিন্তু সেরাত্রে খেদার মধ্যেই থাকে। তৃতীয় দিন সকালে তাদের বাইরে আনার কাজ শুরু হয়।

সকালে দলপতিকে বাইরে আনার দৃশ্য অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। একাজ পরতালায় বৃহদাকার মর্দা হাতি ধরার সঙ্গে তুলনীয়। তার সঙ্গে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, এখানে অন্য পরিবেশে হাতি ধরা হয়। গাছপালা এখানে অনেক আছে, জমিও বন্ধুর এবং অসমতল। অতিকায় এই প্রাণীটার গলায়, চার পায়ে অস্বাভাবিক মোটা মোটা রশি বাঁধা তো আছেই উপরন্তু ছটা শক্তিশালী কুনকির সঙ্গে তাকে আবার শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। তাছাড়াও নিরাপত্তার জন্যে রয়েছে আরও দু-তিনটে কুনকি। দলপতি আন্নীর শেষ সীমা পর্যন্ত নিরুপদ্রবেই দলে আসে। কিন্তু এবার তার মনে হয় যে, এটাই পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। সে তার সব শক্তি দিয়ে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু বাধা পায়। সে যে কুনকিদের সঙ্গে রশির শক্ত বাঁধনে বাঁধা। সেই মারাত্মক হ্যাঁচকা টানে নিজেদের সামলে রাখা কুনকিদের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কুনকিরা সেই বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে আশেপাশের গাছপালাগুলো শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে। মাহুতরাও সাধ্যমতো কুনকিদের সামলাতে চেষ্টা করে। এ পরিবেশে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার ফল মাহুতের কিংবা কুনকিদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। আমি এই পরিস্থিতিতে নানারকম দুর্ঘটনা দেখেছি। যা হোক, অতিকায় সেই দলপতিকে অবশেষে খেদার বাইরে অস্থায়ী এক পিলখানায় এনে বাঁধা হয়। এভাবে সন্ধ্যার আগেই একে একে সব হাতি খেদার বাইরে এনে বাঁধা হয়ে যায়। এবার প্রধান সর্দারের নির্দেশে হাতিগুলোকে খাবার দেওয়া হয়। সম্ভাব্য উপায়ে কিছু জল দেবার চেষ্টাও করা হয়। তাছাড়া অকারণ উৎপীড়নে কোন বন্দী হাতির যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়।

হাতি বাঁধা হলে কুনকিরা নিজেদের আস্তানায় চলে যায়। সব মাহুত আর হাতি সেরাত্রে ছুটির মেজাজে আনন্দে মাতে। হাতের কাছে বাজাবার ঢোল না থাকায় খেদাকর্মীরা কেনেস্তার টিন বাজিয়ে দীর্ঘ শ্রমের অবসরটুকু নাচগান করে কাটিয়ে দেয়।

পরদিন প্রধান সর্দারের পরিচালনায় লোকজন খেদাবেষ্টনী ভেঙে দড়ি, কপিকল ইত্যাদি গুটিয়ে অস্থায়ী মূল শিবিরে ফিরে যায়। সেখানে তাদের এক ভোজ দেওয়া হয় এবং পরবর্তী নির্দিষ্ট কাজের জন্যে সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করে।

এবার খেদায় ধরা হাতিগুলো ক্রমে সরকারী বনবিভাগের নির্দিষ্ট পিলখানায় বা ডিপোতে পিলখানা বিভাগের দায়িত্বে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই হাতিদের শিক্ষিত করা, তাদের বিলিব্যবস্থা করা এবং সরকারের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়। দাইদারদের তত্ত্বাবধানের পর থেকে এবার সবকিছু দায়িত্ব পিলখানা বিভাগের।

দলভ্রষ্ট কোন কোন পুরুষ হাতি মাঝে মাঝে খেদায় ধরা হাতিদের অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। তারা কিন্তু সহজেই পরতালায় ধরা পড়ে। অবশ্য এ ধরনের হাতি বেশ ক্ষতিও করে থাকে। হাতি ধরা থেকে তাদের শিক্ষিত করে তোলার

মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আসে। এখানে এক সাফল্যময় খেদার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে খেদা শেষ করতে গিয়ে সম্ভাব্য ঘটনাবলী এবং অপ্রত্যাশিত বিপদ যা ঘটে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা হয়নি। খেদাব দৃশ্য দর্শকদের কাছে এক বিচিত্র আনন্দের উৎস। আর বিনিয়োগকারী তাঁর হিসেবনিকেশ ভাল করে দেখে তাঁর খেদার সাফল্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

শিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে হাতি ধরার মধ্যে নিন্দনীয় প্রায় কিছুই নেই। যাঁরা অবণ্যরাজ্যের বিচিত্র আলোকচিত্র তুলতে চান, তাঁদের কাছে খেদা সেই সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। বনাঞ্চলে অভিযানে যাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, তাঁদের পক্ষে কোন সুযোগে খেদায় উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে অর্থলাভও হবে। যথাযথভাবে পরিচালিত হলে বর্তমানকালেও খেদায় লোকসান হওয়া উচিত নয়।

১৮৭৯ সালে 'গাবোহিল' অঞ্চল ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং সুসঙ্গের মহারাজা সেখানে বন্য হাতি ধরার পুরুষানুক্রমিক অধিকার হারান। আমার পিতামহ কিন্তু ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত খেদা করেছিলেন, সরকার কোন বাধা দেননি। সুসঙ্গের প্রচলিত রীতিতেই স্থানীয় হাজং এবং হুদি দাইদার আর মাহুতদের সাহায্যে তখন খেদা হয়েছে। যেহেতু সুসঙ্গ স্টেটের অনেক হাতি ছিল এবং দাইদার ও খেদাকর্মীদের সাহায্যে প্রায় প্রতি বছরই হাতি ধরা হতো, তাই সেসব খেদা খুব সুশৃঙ্খলভাবে আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই হয়েছে।

আমার পিতামহ লোকান্তরিত হলে, আমার বাবার আমলে অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজ সরকাবেব বিশেষ অনুমতি ছাড়া তখন গারো পাহাড়ে আর খেদা করা যেত না। ফলে আমাদের সাংবাৎসরিক খেদা বন্ধ হয়ে যায় এবং খেদা পরিচালকদের ও হাজংদের ঐতিহ্যগত খেদা অনুশীলন রীতিতে ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়ে। গাবো পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার সাহেব ১৯০৫ সালে বাবাকে এক ইজারা দেন। সেবার খেদাকর্মীদের এক মিশ্র সমাবেশে প্রায় চল্লিশটা হাতি ধরা পড়েছিল। সেই খেদায় পুরনো হাজং সর্দারদের মধ্যে শুধু কয়েকজনকেই পাওয়া গিয়েছিল; বাদ বাকী সকলেই ছিল গারো। তারা ইংরেজ সরকারের অধীনে শিক্ষিত হলেও খেদার জটিল কৌশল সম্বন্ধে তাদের তখনও তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। গারোরা বহু শতাব্দী হলো বুনো হাতির পাশাপাশি বাস করে আসছে; কিন্তু হাতি ধরার ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন পন্থা তারা উদ্ভাবন করেনি। এটা খুবই আশ্চর্য। সুতরাং সেবার সেই নতুন খেদাকর্মী গারোদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে বাবাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি স্যান্ডারসন সাহেবের পন্থায় খেদা করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে আমাদের আগের মাহুত আর শিক্ষিত হাতি তখনও যথেষ্ট ছিল। তাই সেবার খেদা ব্যর্থ হয়নি। ১৯১৫ সালে আসাম সরকারের অধীনে হাতি ধরার ইজারাদার কিংসলী সাহেবেব

কাছ থেকে সুসঙ্গের যৌথ স্টেট আর একবার হাতি ধরার ইজারা পান। তখন শিক্ষিত খেদাকর্মীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিল গারো। আমাদের স্টেটের সুদক্ষ মাহুত এবং শিক্ষিত হাতি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই সেবার খেদা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, মাত্র চোদ্দটা হাতি ধরা পড়েছিল। অবশ্য সেবার মস্ত এক দাঁতাল হাতি পরতালায় ধরা পড়ে। সেটাই ছিল বড় লাভ।

শিলংয়ের এক সরকারী ইজারাদারের অধীনে ১৯২৩-২৪ এবং ১৯২৪-২৫ সালে আমি আবার হাতি খেদার সুযোগ পাই। সেবার খেদার লোক সংগ্রহ করতে আমার যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। কারণ, আমাদের স্থানীয় খেদাকর্মীরা এর মধ্যে অনুশীলনের অভাবে সেকাজে অনভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমাদের পোষা হাতির সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল। তাহলেও সেবার আমি নিজেই খেদা পরিচালনা করেছি এবং সুসঙ্গের আদিবাসী আর মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছ থেকে আশানুযায়ী সহায়তাও পেয়েছি। সে খেদায় প্রথমবারেই ছত্রিশটা হাতি ধরা পড়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান কর্মীদের মধ্যে বেশকিছু লোকের খেদার কঠিন শ্রম সহ্য হয়নি! খেদার সময় এবং পরে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে মারা যায়। পরের বছর অসমীয়া প্রথায় হাতি ধরার উদ্দেশ্যে কিছু অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আমি আর একবার পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তখন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি না হওয়ায় মোট পাঁচটা হাতি ধরা পড়েছিল। সুতরাং ১৯২৪-২৫ সালেই শেষবারের মতো সুসঙ্গে হাতি খেদা হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনের ঠাকুরদা যখন ভাইসরয়, তখন আমার ঠাকুরদা মহারাজা রাজকৃষ্ণের আমলে গারো পাহাড় সুসঙ্গরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। গারো পাহাড় থেকে বুনো হাতি মাঝে মাঝে সুসঙ্গ অঞ্চলে চলে আসে। তাই প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড লিটনের নাতি যখন বাংলার গভর্নর ছিলেন, তখন দু-পুরুষের ব্যবধানে বহুকাল পরে সেই বুনো-হাতি ধরার জন্যে আমি বহু চেষ্টায় আবার অনুমতি লাভ করেছিলাম। সেসূত্রে তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ হিউবার্ট গ্রেহাম আমাকে বলেন, "আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, স্বয়ংচালিত দ্রুতগামী যান্ত্রিক যানের যুগে আজও আপনি কেন হাতি ধরার জন্যে ব্যগ্র?" আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম, "আমাদের ভাগ্য আগে থেকেই হাতির সঙ্গে বাঁধা। সুসঙ্গকে হাতি থেকে আলাদা করা যায় না। মরতে হলে আমরা একসাথেই মরব।"

সংযোজন

Changing Times বা সোমেন্দ্রনাথ ভাদ্দুড়ী অনূদিত 'কাল প্রবাহ' বইটিতে পিতৃদেব ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার বর্ণনা করেছেন, তার অনেক অংশই আমি ছোটবেলায় তাঁর মুখে শুনেছি। ভূপেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়ে তাঁর পিতা কুমুদচন্দ্র এবং সুসঙ্গের অন্যান্য বর্ষীয়ান মানুষদের কাছ থেকে জেনেছেন। তিনি সুসঙ্গ পরগনা এবং গারো পাহাড়ে সোমেশ্বরী নদীপথে ও পার্শ্ববর্তী বনভূমিতে বহুবার ভ্রমণ, শিকার ও হাতি ধরার উদ্দেশ্যে বিচরণ করেছেন। ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পশুপাখী এবং আদিবাসী, বিশেষত গারো উপজাতির মানুষদের প্রতি তাঁর কি নিবিড় আকর্ষণ ছিল, কত গভীরভাবে সে অনুভূতি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তার কিছুটা পরিচয় 'কাল প্রবাহ'র স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়। আর যাঁরা তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা ও কথা শোনার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাও সে অনুভূতি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর অতিপ্রিয় ভাগিনেয় সোমেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী তাঁর তেমন একজন সঙ্গী।

১৯৪৪ সালে আই. এস. সি পরীক্ষা দেবার পর আমি বাবার সঙ্গে সোমেশ্বরী নদীর উজান বেয়ে বাগমারা, রঙরেঙপাল, সিজু এবং জাংখেু পর্যন্ত গিয়েছিলাম। দেখেছি সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নামে সোমেশ্বরী নদী, সোমেশ্বরের পুত্র গুণাকরের নামে গুণেশ্বর পাহাড়, দেওশিলা—সোমেশ্বর পাঠক যেখানে ধ্যান করতেন, ইত্যাদি বহুস্থান তিনি কত পবিত্র মনে করতেন। আরো লক্ষ্য করেছি নদীর ধারে বহু গ্রামে ঝুম-চাষীরা তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁরা সকলেই জানতেন যে, পিতৃদেব ব্রাহ্মণ্য আচার মেনে চলতেন, কিন্তু এটাও বুঝতেন যে, তিনি গারো উপজাতির নিজস্ব সংস্কৃতিকে কখনও অশ্রদ্ধা করতেন না।

পরবর্তী কালে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল পিতৃদেব সুসঙ্গ পরগনার বিস্তীর্ণ সমতলভূমির তুলনায় পাহাড় এবং অরণ্য অঞ্চলে বিচরণ করতে এঁত বেশী ভালবাসতেন কেন? 'কাল প্রবাহ'র বিভিন্ন অংশ পড়ে এই প্রশ্নের উত্তর কিছুটা পেয়েছি মনে হয়।

ভূপেন্দ্রচন্দ্রের জন্মের আগের বছর ১৮৯৭ সালের বিখ্যাত আসাম ভূমিকম্পে প্রাচীন সুসঙ্গের রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তার কয়েক দশক আগেই রাজবংশের শাসনের অন্তর্গত গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকার রাজাদের কাছ থেকে ব্রিটিশ শাসকরা হরণ করেছিলেন Garo Hills Act of 1869 জারির ফলে। গারো পাহাড়ে সুসঙ্গ রাজাদের হাতি খেদার স্থায়ী বন্দোবস্তও অতি দ্রুত লুপ্ত হলো। সুসঙ্গ রাজ্যে বহুকাল ব্যাপী প্রচলিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির প্রথাও ইংরেজ প্রবর্তিত আদালতে বর্জিত হলো। ভূপেন্দ্রচন্দ্রর পিতামহ রাজকৃষ্ণ সিংহকে ইংরেজ সরকার উত্তরাধিকার পরম্পরায় মহারাজা উপাধির অধিকার দিলেও ভূমিরাজস্বের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে মোগল আমল থেকে সুসঙ্গ রাজবংশ তাঁদের অঞ্চলের সামন্তরাজার অধিকার পেয়েছিলেন তার মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হলো।[১]

রাজকৃষ্ণের পৌত্র ভূপেন্দ্রচন্দ্র তাঁর পিতা কুমুদচন্দ্রর মৃত্যুর পর ১৯১৬ সালে যখন মাত্র আঠারো বছর বয়সে সুসঙ্গের মহারাজা হলেন তখন তিনি প্রাক্তন সুসঙ্গ পরগণার মাত্র ১/৬ অংশের মালিক। ততদিনে পরিবারে হাতির সংখ্যাও মাত্র ১৯/২০টিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ভূপেন্দ্রচন্দ্র বুঝতে পারলেন সম্পত্তির এই সামান্য অংশের মালিক হয়ে এবং অবিরাম শরিকী মামলায় বিধ্বস্ত এই জমিদারীর ভিত্তিতে সুসঙ্গ পরগণার সকল জাতির মানুষের সামাজিক নেতৃত্ব দেবার প্রথাগত পারিবারিক কর্তব্য পালন কবা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তিনি বুঝেছিলেন তাঁকে এক প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার ধ্বংসলীলার সাক্ষী হয়ে জীবন কাটাতে হবে।

১৯১৯ সালে ভূপেন্দ্রচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার কয়েক বছর পরই কলকাতার সারকুলার রোডে তাঁদের বাসস্থান উঠিয়ে দিয়ে সুসঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন, কারণ কলকাতা ও সুসঙ্গ দু জায়গায় বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তার আগে ২২ বছর বয়সে শিতলাইয়ের জমিদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আমার মা প্রতিভা দেবীর তখন বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। বাবার কথায় যা আভাস পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে সুসঙ্গ পরিবারের যে যৌথ অংশের (বড় তহবিল) সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কুলীন জামাইদের সঙ্গে বহু অর্থ ব্যয় করে পরিবারের মেয়েদের বিবাহ ব্যবস্থা হয়ত তার প্রধান কারণ ছিল।

১৯২৬ সালে কলকাতার হালদার পাড়া রোডে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। শুনেছি যে, পরবর্তীকালে অন্নপ্রাশনের দিন আমাকে সুসঙ্গ গ্রামের নানা অংশে হাতির পিঠে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল এবং প্রজারা সেই উপলক্ষে অনেক টাকা নজর দিয়েছিলেন। সেই টাকায় 'চাইরা মাসকান্দা' নামে একটি গ্রামের তালুকদারী স্বত্ব কেনা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চার বছর আমি

বেশীর ভাগ সময় সুসঙ্গে থেকেছি। মাঝে মাঝে পাবনা শহরে আমার মাতামহের বাড়িতেও থেকেছি। সুসঙ্গে আমার শৈশবের স্মৃতি এই রকম : সুসঙ্গের চার রাজবাড়ির বাইরের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের প্রায় কোনও যোগাযোগ ছিল না। বাড়ির অন্দরমহলের সঙ্গে বহির্জগতেরও প্রায় কোন যোগাযোগ ছিল না। বাড়ির মধ্যে অতিরিক্ত সংখ্যায় ঝিয়েরা বিচরণ করত। বহির্বাটিতে রঙমহল প্রাসাদ আমাদের কাছে একটা আকর্ষণীয় বিস্ময়ের এবং কিছুটা ভয়ের বস্তু ছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়তলীতে 'বড় বাগানে' বেড়াতে যেতাম, সেটা খুবই মজার ছিল। পথে পিলখানায় অনেক হাতি দেখতাম। অবশ্য আমার বাবা ছোটবেলায় হাতিদের সঙ্গে যত সহজভাবে মিশতে অভ্যস্ত ছিলেন, আমি ঠিক সেরকম ছিলাম না। আমার জন্মের আগের বছর আমার বাবার পরিচালনায় গারো পাহাড়ের প্রান্তন সুসঙ্গ অঞ্চলে শেষ হাতি খেদা হয়। বাবার কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাতি ধরার বিবরণ শুনতে খুবই ভাল লাগত।

অন্দরমহলের মতো বহির্বাটিতেও অনেক চাকর, দারোয়ান, কর্মচারী থাকতেন বা যাতায়াত করতেন। এখন বুঝি যে, এই বিপুল কর্মচারী, দারোয়ান ও ভৃত্য-বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করা বড় তহবিল এস্টেটের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল, অবশ্য ভৃত্যদের অনেকের জন্যই চাষের জমি দেওয়া ছিল।

সব মিলিয়ে আমার শিশুমনে সুসঙ্গের রাজবাড়ির পরিবেশ সম্বন্ধে একটা অস্বস্তির ভাব ছিল। ওই অল্প বয়সেই আমি অনুভব করতাম যে, পরিবার এক আসন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৩৪ সালে আমার আট বছর বয়সে শুনলাম যে, আমাদের সম্পত্তি ইংরেজ প্রশাসনের পরিচালনার অধীনে Court of Wardsএ যাচ্ছে। আমার এক পিসতুতো দাদা আমাকে বোঝালেন যে, তখন থেকে আমার বাবার এবং বড় তহবিলের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কারোরই সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার থাকবে না। বিষয়টা ওই বয়সে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, কিন্তু চারিদিকে একটা থমথমে বিষণ্ণ আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করেছি। সেই সময়েও আমাদের প্রধান আনন্দের ক্ষেত্র ছিল মাঝে মাঝে হাতিতে চড়ে পাহাড়তলীতে শিকার ও বনভোজনে যাওয়া, বা কখনও আরো দূরে গারো পাহাড়ে বেড়ানো।

১৯৩৫ সালে প্রায় এক বছর আমি পাবনায় মাতামহের বাড়িতে ছিলাম। পাবনা শহরের এক প্রান্তে পদ্মার ধারে প্রায় একশ বিঘা জমির মধ্যে 'শিতলাই হাউস' এক বিশাল প্রাসাদ ; সুসঙ্গের চেয়ে ছোট জমিদারী কিন্তু শরিকের চাপ নেই, আর ইংরেজ প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে মহারাজা উপাধির গুরুভারও ছিল না। সুসঙ্গের মতোই আমার মামার বাড়িতেও ব্রাহ্মণ্য আচার খুব নিষ্ঠাভরে পালন করা হতো। মাতামহ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র অবশ্য আমাদের কাছে সকল ধর্মের বিষয়েই শ্রদ্ধাভাবে বলতেন। যোগেন্দ্রনাথ পাবনা শহরে সকল প্রকার সৃজনশীল উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহুকাল পাবনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি

ছিলেন। দাদু খুব ভাল গান গাইতেন, পাখোয়াজ বাজাতেন এবং ছবি আঁকতেন। আমার মা এবং তাঁর দুই ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও রথীন মৈত্রর সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যচর্চার রুচিবোধের ভিত্তি এই পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। আমার মার প্রতিভা মামাদের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। কিন্তু মা প্রতিভাদেবীর সাহিত্যিক প্রকাশ ক্ষমতা, সঙ্গীতে পারদর্শিতা এবং শিল্প-সঙ্গীত বোধশক্তি যে কত গভীর ছিল তা বহির্জগতে অজ্ঞাত রয়ে গেল। সুসঙ্গের চার-দেয়ালের রক্ষণশীল গণ্ডীতে সেই সৃজনশীলতার প্রকাশের পরিবেশ ছিল না। মা যদি ন'বছর বয়স থেকে পরবর্তী জীবনে সুসঙ্গ বাসের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ লিখে রেখে যেতেন তবে সুসঙ্গের অন্দরমহল ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আর এক দিকের আরও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানী বিবরণ পাওয়া যেত—যে দিকটা বাবার পক্ষে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব ছিল না।

১৯৩৫ সালের শেষভাগে বাবা মা, আমার দুই ভাই এবং এক বোনসহ সুসঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। আমিও সেই সময় পাবনা থেকে কলকাতায় আমাদের মহানির্বাণ রোডের ভাড়া বাড়িতে চলে আসি। বাবার তখন প্রধান প্রচেষ্টা ছিল নতুন পরিস্থিতিতে লেখাপড়া শিখিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করা। যদিও তিনি আমাকে মহারাজকুমার হিসাবে উপযুক্ত ব্যবহারের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন কিন্তু তিনি মনে মনে জানতেন যে, ভবিষ্যতে সুসঙ্গ জমিদারীর ৫৴৲ অংশের মালিক হয়ে আমার পক্ষে মহারাজা উপাধির গুরুভার বহন করা অসম্ভব হবে। উনি তাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রধানত আধুনিক শিক্ষা অর্জন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য রক্ষা করার উপর। তিনি যে কত আত্মত্যাগ করে, কত দূরদৃষ্টি দিয়ে অতি জটিল অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করে আধুনিক জীবনযাত্রায় চলার পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা মনে করলে খুবই অভিভূত বোধ করি।

বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অতি সংযত সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা কঠোর নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। মনে পড়ে তিনি প্রতি বছর কিছু দিনের জন্য গারো পাহাড়ের পাদদেশে গোপালপুর টিলার তলায় পাহাড়ী ছরা (ছোট নদী)-র ধারে ছোট তাঁবু খাটিয়ে সম্পূর্ণ একাকী বাস করতেন। তিনি নিজেই কাঠ কেটে উনুন ধরাতেন, ছরা থেকে জল তুলে আনতেন ও অত্যন্ত সাধারণভাবে নিজে রান্না করে খেতেন। ঐ জঙ্গলভরা পাহাড়তলীতে সঙ্গে একটা বন্দুকও রাখতেন না। আমাকে বলেছিলেন বছরে অল্প কিছুদিন এই ধরনের অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে তিনি আত্মবিশ্বাস লাভ করতেন এবং ওই সময়টা তাঁর ভালই কাটত। তিনি আরও বলতেন সারা বছর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে থেকে অতিরিক্ত সম্মান ও বাহুল্যের মধ্যে বাস করার অস্বস্তি থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি পাওয়া তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এইরকম নানাভাবে তিনি তাঁর আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ ও জীবনে উৎসাহ বজায় রাখতেন। ওঁর

ধারণা ছিল যে, একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় যে ধরনের জনহিতকর কর্মে রত থাকতে পারলে তিনি মনে শান্তি পেতেন তা ইংরেজ প্রশাসনিক চাপ বহন করার ঝঞ্ঝাটে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

পিতৃদেবের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রধান কীর্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক পর্যায়ের পক্ষে উপযুক্ত ভাবে এক দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিভিন্ন উপজাতি ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতায় এক আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হওয়া। কিন্তু এই কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর ইংরেজ শাসনের চাপে এবং ইংরেজের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া মহারাজা উপাধি এই পরিবারের পক্ষে পরবর্তী যুগের উপযোগী কর্মপ্রচেষ্টা নানাভাবে ব্যাহত করেছিল। আমার পিতামহ কুমুদচন্দ্র গভীরভাবে জ্ঞানচর্চায় মগ্ন হয়ে এই অসমাধেয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। তিনি পশুপক্ষী পালন ও হাতি ধরার বিষয়েও খুব উৎসাহী ছিলেন। ভূপেন্দ্রচন্দ্র আজীবন কুমুদচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আদর্শ ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করেছেন এবং অরণ্য-বাসী মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। শেষ জীবনে কলকাতায় বসে তাই নিয়ে সর্বদা মনন করতেন, যার ফলে তিনি এই বিষয়ে হাজার হাজার ছবি এঁকেছিলেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় তাঁর ছবির দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল—প্রথমে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ এবং পরে চিড়িয়াখানার প্রদর্শনীকক্ষে। অসংখ্য দর্শক যাঁরা সেই প্রদর্শনী দেখেছিলেন তাঁদের কাছে সুসঙ্গের প্রকৃতি, আদিবাসী, জীবজন্তু জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। সেখানে তিনি মহারাজার গন্ডী থেকে মুক্তি পেয়ে মনের ভেতরের ছবি প্রকাশ করেছেন।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ সুসঙ্গ পরগণার গারো পাহাড় সীমান্তে বাঘমারা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুসঙ্গ অঞ্চলের আমাদের পূর্বতন বহু হিন্দু প্রজা সেখানে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছিলেন। তাঁরা স্ত্রীপুরুষ বৃদ্ধবৃদ্ধা নির্বিশেষে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাঁদের ব্রাহ্মণ জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন এবং আধুনিক যুগধর্মে অভ্যস্ত আমার স্ত্রী ও কিশোরী কন্যাদ্বয়কেও প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। আমরা সকলেই এই আচরণে অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে হলো এই ছিন্নমূল অবস্থাতেও এঁরা জাতিপ্রথা ও সামন্ততন্ত্রের বোঝা হৃদয়ে বহন করে আধুনিক যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে পারেননি। এঁদের প্রতি গভীর মমত্ব অনুভব করলেও মনে অনুভব করলাম এঁদের সমাজদেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এঁরা নিজেদের পুরোনো বিশ্বাস অবলম্বন করে তখনও একটা সীমাবদ্ধ গন্ডীতে বিচরণ করছেন এবং নিজেদের প্রথাগত কিছু কিছু কাজকর্ম করে বহু কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন।

পাশেই বং বাজারে বাবার বন্ধু জুংগা গারোর ভাগ্নের সংগে দেখা হলো; তাঁর বয়স তখন ৫৫ হবে। ও'র কাছেই শুনলাম বহুদিন হলো জুংগা মারা গেছেন। জুংগার ভাগ্নে প্রথমেই আমার হাতে হাত মিলিয়ে বাবার কথা জিজ্ঞেস করে বললেন, "মহারাজ কেমন আছেন? আমার মামার খুবই বন্ধু ছিলেন। এখন গারো পাহাড় হাতিতে ভরে গিয়েছে। আজকাল কেউ হাতি ধরতে জানে না—আপনার বাবা ও আমার মামা থাকলে অনেক হাতি ধরা যেত।......আমি রোজ মহারাজটার কথা মনে মনে ভাবি। কোনও খবর পাই না। ভাবি, তিনি কলকাতায় সুখে আছেন ত? আশেপাশে পাহাড় জংগল ত নাই। রোজ প্রার্থনা করি ভগবান তাঁরে সুখে রাখুন।" জুংগার ভাগ্নের কথা বলা ও মেলামেশার ভংগী ছিল অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুর পুত্রের সংগে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিনিময়ের, যা আধুনিক কালের আচার ব্যবহারের সংগে সংগতিপূর্ণ।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫-র মধ্যরাত্রে ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের জীবনাবসান হয়। সুসংগের শেষ মহারাজার মৃত্যুর সংগে সংগে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এক সংস্কৃতি ও সমাজের শেষ বিশিষ্ট যোগসূত্র ছিন্ন হলো। 'কাল প্রবাহ' বইটিতে একজন দরদী সমাজপতি-জমিদারের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সমাজচিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এই চিত্রের প্রধান গুণ লেখকের বহুদিনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মূল্যবোধ স্বতঃস্ফূর্ত সততায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বই পড়ে সুসংগের অন্যান্য স্তরের মানুষের মুখপাত্রগণ যদি তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলের একটি পরিপূরক সামাজিক চিত্র পরিবেশন করতে উৎসাহিত বোধ করেন তবে সুসংগের সিংহ বংশের একজন নৃতাত্ত্বিক বংশধর হিসাবে আমি তৃপ্তিলাভ করব।

টীকা

১. স্টেট্সম্যান পত্রিকার 'Hundred Years Ago' শিরোনামায় ১৩ই মার্চ, ১৮৮৫ এবং ২২ নভেম্বর, ১৮৮৭তে প্রকাশিত দুটি সংবাদ পুনঃপ্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩ই মার্চ, ১৯৩৫ এবং ২২ নভেম্বর, ১৯৩৫তে। এই দুটি সংবাদেই সুসংগের তৎকালীন মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায় বলে তা উদ্ধৃত করলাম—

"March 13, 1885
(Editorial Note)

During the cold weather that is just passing away, the Calcutta public may have become familiar with a somewhat quaint-looking little old man, marked out by his attendants as a native prince, and known to the Foreign Office and our

tradesmen, as the Raja of Sooshung. It is superfluous to say that he has a grievance. The truth is, he has been infamously used and plundered by us, and appears occasionally in Calcutta to play his respects to the Viceroy, and mildly talking about his wrongs and poverty, to any who are willing to listen to him. The facts are these :

In the East of Bengal, near Mymensingh there is a Raja possessing a considerable estate called Sooshung. a great portion of which is in the Garo Hills. Some years ago the Government deputed its own surveyors, who marked out the boundaries of what Government chose to consider their own possession, as distinguished from those of the Raja, by which they dispossessed him—at all events possessed themselves—of a large portion of the hilly tract.

The Raja, who it must be stated, is not a feudatory, but a British subject, sued the Government in the local civil court : the suit was carried through three separate tribunals, and the decisions of all (the last being a full Bench of the High Court at Calcutta) were in his favour ; the Government line of survey was set aside, and the whole territory declared to belong to the Sooshung Raja. From this last decision, the Government appealed to the Privy Council, but before the case could be brought before the appellate tribunal, they actually pass and promulgate a legislative enactment, nullifying the judgement of their own court, and declaring the lands which had been judicially awarded to the Raja, to belong to the Government !

Now if we were a member of the foreign Office, we would never rest until we had redressed this old man's wrong. We should have the insight to discern that the very existence of this prince poor and unfriended as he is, is a menace to our own. Whenever he goes, there is the 'handwriting against us on the wall'—'Though art weighed in the balances, and found wanting,' to be followed by-and-by with the sentence, "God hath numbered thy kingdom and finished it." The unjust thing cannot live and endure in this world. Our empire is

not yet a hundred years old, and we are deligently heaping up the wood, hay and stubble which will go into conflagration sooner or later, because we make injustice the basis of our power, instead of digging broad and deep foundations resting upon the rock of right······"

November 22, 1837
(News item)
বইয়ের শুরুতে art paper-এ ব্লক দ্রষ্টব্য।